নিরীক্ষা

২৩৩তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

বাঙালির অস্তিত্বজুড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই আমরা লাভ করেছি স্বাধীন দেশ, নিজস্ব পতাকা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলার ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিক–সর্বস্তরের জনগণ বর্বর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কোটি প্রাণ জেগেছিল একসাথে। এরই ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। বিশ্বের মানচিত্রে খোদিত হয় একটি নাম–বাংলাদেশ।

৪৯ বছর আগে গৌরবের, আনন্দের, অহংকারের, আত্মমর্যাদার ও আত্মোপলব্ধির দিনটি ছিল ১৬ ডিসেম্বর। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অত্যাধুনিক সব যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে। শুরু করেছিল নির্বিচারে গণহত্যা। রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে। হাতে তুলে নিয়েছিল প্রতিরোধের অস্ত্র। গড়ে তুলেছিল দুর্গ। জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছিল। অবশেষে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের সহযোগীরা পর্যুদস্ত হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। রেসকোর্স ময়দানে বিজয়ের দিন বিকেলে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনী। হানাদারমুক্ত হয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভারত। ১৯৭১ সালে ভারত আমাদের এক কোটির বেশি শরণার্থীকে নয় মাস ভরণপোষণ করেছে। শুধু রাজনৈতিক সমর্থনই নয়, সামরিকভাবেও আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয় সেনারা যুদ্ধ করেছে। এসব অভিব্যক্তি উঠে এসেছে সাংবাদিক মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধদিনের স্মৃতিকথায়। যুদ্ধ একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। এর পরতে পরতে কত যে দুঃখ-বেদনা ও সুখস্মৃতি, ইতিহাস কি তার সবটাই ধারণ করে? আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাই ইতিহাসের একেকটি উপাদান। এই সংখ্যার প্রতিটি লেখা সেরকম অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন।

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নিরীক্ষা'র এবারের বিশেষ আয়োজন 'আমার যুদ্ধদিন'। এই সংখ্যাটি সাংবাদিক মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধদিনের স্মৃতি নিয়ে দ্বিতীয় আয়োজন। গত বছর বিজয় দিবসে প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, যারা মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিক হিসেবে গিয়েছেন অথবা মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছেন–তাঁদের লেখা-স্মৃতিচারণ তুলে ধরা হয়েছে এ সংখ্যায়। থাকছে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখা ভারতীয় সাংবাদিক-গণমাধ্যমকর্মীদের স্মৃতিচারণ। এই বিশেষ সংখ্যাটি থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে। নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে তাদের পূর্বসূরিদের ইতিহাসগাথা।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
ফায়জুল হক

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ফিরে দেখা একাত্তর ৩
মোস্তাফা জব্বার

উপেন তরফদার বলতেন তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক ১৯
আবেদ খান

স্মৃতিতে একাত্তর ২৩
সৈয়দ দীদার বখ্‌ত

বারবার ফিরে যাই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোয় ২৮
আব্দুল কাইয়ুম

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে অভিন্ন সত্তা হিসেবেই মনে করি ৩২
কামরুল ইসলাম খান

স্বপ্ন ও সাহসের সেই দিনগুলো ৩৫
অজয় দাশগুপ্ত

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিজয়োল্লাস ৩৯
আবু মুসা হাসান

মুক্তিযুদ্ধ এবং আমি ৪৪
শাহজাহান সরদার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আকাশবাণী কলকাতা এবং রেডিয়ো কার্টুন ৪৭
মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের বছর ১৯৭১ ৫২
নিজামউদ্দিন আহমদ

৫৫ **টিকতে না পেরে হানাদাররা আশ্রয় নিয়েছিল ঘাঘুটিয়ার মসজিদে**
— সুধীর কৈবর্ত

৫৯ **এই সাংবাদিক সেই মুক্তিযোদ্ধা**
শংকর কুমার দে

৬৫ **বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ দেখতে চাই**
পংকজ কুমার দস্তিদার

৬৯ **একাত্তর আসিবে না ফিরে আর হেথায়**
মো. মফিজুল ইসলাম

৭২ **একাত্তর ও আমার কৈশোর**
কালী রঞ্জন বর্মণ

৮২ **মুক্তিযুদ্ধে সজীব গ্রুপের দুঃসাহসী সেই বিচ্ছুবাহিনী**
এ জেড এম রাহাগীর

৮৭ **রণাঙ্গনের স্মৃতি**
আবদুল হাকিম চৌধুরী

৮৯ **মুক্তির সংগ্রাম ও যুদ্ধে**
নুরুল ইসলাম

৯১ **ভারতে গেরিলা প্রশিক্ষণ ও রণাঙ্গনের স্মৃতি**
গেরিলা লিডার ড. এস এম শফিকুল ইসলাম কানু

৬৭ **একতার রিপোর্টার হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ কাভার করতে গিয়েছিলাম**
— খন্দকার মুনীরুজ্জামান

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ফিরে দেখা একাত্তর

মোস্তাফা জব্বার

দেখতে দেখতে মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে গেলাম। দিনের হিসাবে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ৫০ বছর পার হবে। তবে আমাদের জন্য স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সময় আরও অনেক আগের। ২৬ মার্চ জাতির পিতা কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। তিনিই ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামে ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার হিসাবেই পালন করছি সুবর্ণজয়ন্তী। পার করছি মুজিব শতবর্ষ। মুজিব শতবর্ষ বা সেই একাত্তরের পঞ্চাশ বছরের পূর্তিটা দেখে যেতে পারব কি না, সেটি নিয়ে আমার প্রজন্মের প্রায় সবারই দুশ্চিন্তা ছিল। কেউ কেউ আমরা এমন আশা নিয়ে বেঁচে ছিলাম যে হয়তো সেই সুবর্ণ সময়টা আমরা দেখতে পাব অথবা ছেলেমেয়ে, নাতিপুতিরা দেখবে। এখন তো আমি ৩০, ৪১, ৭১ বা ২১০০ সালের বাংলাদেশও দেখতে পাই। তবে পেছনের সময়টা বারবার স্মৃতিতে ভাসে। মাঝেমধ্যে দু-একজন প্রশ্ন করে, 'গোলমালের সময়' আপনি কোথায় ছিলেন। তাদের ধারণা, আমার মতো মানুষ আর যাই করুক মুক্তিযুদ্ধ করতে পারে না। এখন যখন আইটির লোক বলে পরিচিত হয়ে গেছি, তখন তারা একেবারেই নিশ্চিত হয়ে যায়, এমন মানুষ এসব যুদ্ধ-টুদ্ধ নিয়ে কেন ব্যস্ত থাকবে। নিশ্চয়ই ফিজিক্স বা কম্পিউটার পড়েছেন, লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন, ভালো রেজাল্ট ছিল, পড়াশোনা নিয়েই সময় কাটিয়েছেন; রাজনীতির ছকে যাওয়ার কথা নয়। ভালো ছেলেমেয়েরা কি আর রাজনীতি করে! আমরা তা কিছুটা অনুভবও করতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি নিয়ে যতটা মাথা ঘামাত, কার্জন হলের তারা ততটা ঘামাত না। মেডিকেলে

আমাদের খুব ভালো অবস্থান ছিল না। ওরা ভালো ছাত্র ছিল বলে ওদের নজর পড়াশোনায় বেশি থাকত। আমাকেও সেই দলের মনে করা হয়। কিন্তু আসলে আমি কী, তা আমি জানি। তারা হয়তো এটিও ভাবতে পারে না যে, কেবল আমি নই, আমার বয়সি অনেক মানুষই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। চিশতী ২ মার্চেই শহিদ হয়েছে। কাকতালীয় হলেও সত্য যে, ২০১১ সালে যখন বিসিএস-এর সভাপতি ছিলাম আমি, বেসিস-এর সভাপতি ছিলেন মাহবুব জামান এবং আইএসপিএবির সভাপতি ছিলেন আক্তারুজ্জামান মঞ্জু–তখন তিন সভাপতিই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া মানুষ ছিলাম। সেজন্য ওরা আমাদের সংবর্ধনাও দিয়েছিল।

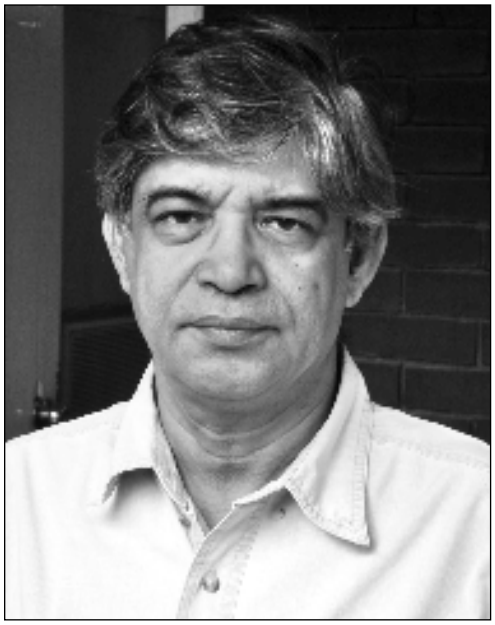

মোস্তাফা জব্বার

একাত্তরের মার্চ মাস আসার অনেক আগেই আমরা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা নির্ধারণ করে ফেলেছিলাম। জাতীয় পতাকাটির ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধুর মেধা থেকে প্রবাহিত সিরাজুল আলম খান ঘরানার নেতাকর্মীদের। এটি এঁকেছিলেন কুমিল্লার শিব নারায়ণ দাস। ছাত্রলীগের পোস্টার লেখা থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রকাশনায় আঁকাআঁকির কাজ করতেন তিনি। জাতির পিতার নির্দেশে জাতীয় সংগীতও আমরাই গেয়েছিলাম।

একাত্তরের পহেলা মার্চের কথা স্মরণ করতে পারি। বেলা ১টার কিছু আগে আমি কার্জন হলের সামনে দিয়ে রিকশায় যাচ্ছিলাম। তখনই রেডিয়োতে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করা হলো। রিকশা থেকে নেমে দেখলাম জয় বাংলার মিছিল চলছে। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কার্জন হলসহ সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করতে থাকে। বিষয়টা এমন যে সবাই যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। কার্যত এমনটা চলছিল অনেকদিন থেকেই। ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনতাযুদ্ধের অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে উঠেছিল। বাস্তবতাও এটি যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লড়াইটা শুরু করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই আটচল্লিশ সালের জিন্নাহবিরোধী ঘোষণা, বায়ান্ন সালের ভাষার লড়াই, ছেষট্টি-আটষট্টি-উনসত্তরের গণআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরে যুদ্ধপ্রস্তুতি–সবকিছুরই সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আমি মিছিলের সঙ্গেই কলা ভবনে পৌঁছাই।

তখনই আমরা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলের নাম পালটাই। হলের গাড়ি বারান্দায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নাম মুছে আমরা মাস্টারদা সূর্যসেন হল লিখি আলকাতরা দিয়ে।

আফতাবের (তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে আহত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিহত হন) প্রস্তাবেই এই হলের নাম সূর্যসেন হল করা হয়। কিন্তু পরে আমরা মাস্টারদা শব্দটি সূর্যসেনের নামের আগে যোগ করি। আমার মনে আছে, আমরা আমাদের রোল নম্বরের আগে ইংরেজি এম অক্ষরটি লিখতাম। এটি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলের মোহাম্মদ শব্দটিকে প্রতিনিধিত্ব করত। মাস্টারদা যোগ করা হয় সেই এম অক্ষর অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। সেদিনই ইকবাল হলের নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল করা হয়। সেদিন সন্ধ্যায়ই আমরা আমাদের হলের পাশের দুটি ব্যাংকে (ইউনাইটেড ও ন্যাশনাল) অপারেশন করি। ইউনাইটেড ব্যাংক ছিল ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে। এটি এখন জনতা ব্যাংক। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ছিল রেজিস্ট্রার ভবনে। এখন সেটি সোনালী ব্যাংক। মাহবুব ভাই আর আফতাব ছিল এই অপারেশনের নেতৃত্বে। শাহাবুদ্দিন, শামসুদ্দিন এবং আমিও ছিলাম এই দলে। আমরা শুধু দারোয়ানদের বন্দুকগুলো কেড়ে নিই। তেমন কোনো প্রতিরোধ দারোয়ানরা করেনি। ওগুলো তখন জমা দেওয়া হয় সার্জেন্ট জহুরুল হলে। আমাদের মধ্যে আতিকের ছিল ইউওটিসির (১৯৭৯ সাল থেকে বিএনসিসি) প্রশিক্ষণ। ওরা ডামি রাইফেল দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিত। ছাত্রলীগ কর্মীদেরও একসময়ে সেসব রাইফেল দিয়ে কলা ভবনের ছাদে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এমনকি আমার স্ত্রী বকুল মোস্তাফাও ওই সময়ে রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

এমনই এক ধারাবাহিকতায় প্রতিদিনের সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একসময় আমরা একাত্তরের ৭ মার্চে পৌঁছাই। ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের আগেই আমাকে বলা হলো, 'গ্রামে যাও। যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। যুবকদের সংগঠিত করো।' যারা এখন এ কথা বলেন যে, একাত্তরে আমাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল না, তারা হয়তো এ কথা বলতেই পারেন যে, পাকিস্তান বাহিনীর মোকাবিলা করার মতো প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। কিন্তু আমরা মানসিকভাবে যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না বা আমাদের নেতারা সেটি ভাবেননি–এটি ঠিক নয়। কোনো একজন মেজর বেতারে কিছু একটা ঘোষণা দেওয়ার পর স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত হই–এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা। দুনিয়ার কোথাও একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরে অন্যরকম সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পেরেছে, সেটি আমার মনে হয় না। সেই সময়ে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় এবং সেই সংগ্রাম কমিটি কার্যত দেশের প্রশাসন পরিচালনা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী গড়ে তোলার জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণ বা এই ধরনের কোনো ব্যাপক কর্মকাণ্ড তখন করা না হলেও জনগণকে সংগঠিত করার সেই প্রচেষ্টা একেবারেই নজিরবিহীন। ফলে আমি মনে করি, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার সব প্রস্তুতিই আমাদের ছিল। তবে যুদ্ধটি আরও যখন বিস্তৃত হতে পারত, তখন যুদ্ধ শেষই হয়ে যায়। যুদ্ধের রাজনৈতিক পর্বটি বাকি ছিল বলে বাংলাদেশে আজকের রাজনৈতিক সংকটগুলো তৈরি হচ্ছে। বস্তুত আমরা সত্তরে স্বাধীন বাংলার পক্ষে ভোট চেয়েছি।

আমি তখন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাহিত্য সম্পাদক। আফতাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি। আমি আফতাবের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকি। মিয়া মুশতাক, শামসুদ্দিন, মধু ছাড়াও চিশতী (একাত্তরের শহিদ), রেজাউল হক মুশতাক, আনসারউদ্দিন, মহিউদ্দিন বুলবুল, শাহাবুদ্দিনসহ ৪০/৫০ জনের একটি দল আমরা বলতে গেলে ফুল টাইমার ছাত্রলীগ কর্মী। আগেই বলেছি, আমাদের নেতা ছিলেন প্রয়াত বাসদ নেতা মাহবুব ভাই। তিনি আমার

জেলার ছাত্রনেতাদের ভালো করেই চিনতেন। মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে তাঁদের সবার যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে নেত্রকোনা ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম এরশাদুর রহমানের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। হায়দার জাহান চৌধুরী নামক আরেকজন ছাত্রনেতা তখন নেত্রকোনা মহকুমা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দুজনেই পরে জাসদ করেন। এর মাঝে হায়দার চৌধুরী পরে বিএনপিতে যোগ দেন। আমার নেতা মাহবুব ভাই সম্ভবত তাঁদের কাছ থেকেই জানতেন যে আমার থানা খালিয়াজুরিতে বস্তুত আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের কোনো অস্তিত্বই নেই। সেজন্য তিনি আমাকে আমার থানায় কাজ করার জন্য দ্রুত বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমার থানার বোয়ালি নামক একটি গ্রামের আবদুল মান্নান তালুকদার নামক একজন ছাত্র তখন নেত্রকোনা জেলা পর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। তিনিও তখন থানার সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক রাখতেন না। সত্তরের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সঙ্গে সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার নামে একজন মানুষকে আমি থাকতে দেখতাম। ফলে আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে আমার থানায় ছাত্রলীগ তো নেই–আওয়ামী লীগও নতুন করেই তৈরি করতে হবে। মনে মনে ভাবছিলাম সিদ্দিকুর রহমানকে সঙ্গে পাওয়া যাবে–পাঁচহাট গ্রামের ওহাব চাচা, লিপসার গণি চাচা, বোয়ালির হাসান চৌধুরী হয়তো কোনো-না-কোনোভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। স্মরণ করা উচিত–তখন পুরো থানায় একটিও কলেজ ছিল না। আমার গ্রামে কেবল একটি জুনিয়র স্কুল উনসত্তর সালে শুরু করেছিলাম। আমাদের বাড়ির সামনের আমগাছতলার নিচে দাঁড়িয়ে স্কুল করার সিদ্ধান্ত নিই। বাজারের একটি ঘরে ছয়জন ছাত্র নিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়েছিল।

ঢাকার রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে ভৈরব। ভৈরবের খালার বাড়িতে কিছুটা সময় কাটিয়ে পুরো ১২ ঘণ্টার লঞ্চ ভ্রমণের পর আজমিরীগঞ্জ এবং এরপর ২০ কিলোমিটার শুধু হেঁটে বাড়ি পৌঁছাই আমি ৯ মার্চ ১৯৭১। সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তখন স্বাধীনতা নিয়ে তুমুল উত্তেজনা। বাড়ি পৌঁছানোর পরপরই যারা রেডিয়ো শুনতেন বা কিছুটা রাজনীতি সচেতন ছিলেন, তাঁরা সবাই একের পর এক এলেন। উনসত্তরের গণআন্দোলন এবং সত্তরের নির্বাচনের বদৌলতে ততদিনে আমার একটি রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে উঠেছে। শ্যামপুরের সুখময় বাবু, শিবপুরের প্রহ্লাদ বাবু, শরৎ বাবু এবং আমাদের গ্রামের নৃপেন, বলু মিয়া ও কেনু মিয়াদের সঙ্গে আলোচনা হলো। ওরা সবাই ন্যাপ করত। ওদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার নিজের চিন্তাভাবনার পার্থক্য ছিল। ওদের রাজনীতি ছিল মস্কোপন্থি কমিউনিজম। তবে ততদিনে তারাও পাকিস্তান যে আমাদেরকে ছাড়তে হবে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেছেন।

আমার নিজের গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলতে আমি ছাড়া একমাত্র কাশেম। কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বটেই; এর আগে যখন হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজে পড়ত, তখনও ছাত্র ইউনিয়ন করত। আমি ও কাশেমের বাইরে গ্রামের কেউ কলেজগামীও ছিল না। শুধু গ্রামের কথা বলি কেন, পুরো ইউনিয়নেই কলেজপড়ুয়া কোনো ছাত্র ছিল না। বোধহয় মান্নান ছাড়া থানায়ও কেউ ছিল না। গ্রামে তখন প্রাইমারির ওপরে কোনো বিদ্যালয় নেই। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন বহুদিন আগে বাইরে থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। আমার চাচাতো ভাই বোরহান ভাই, আব্দুল হক মাস্টার, চাচাতো ভাই আছমত মাস্টার–ওরা সবাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোনো-না-কোনো স্কুলে পড়ে এসএসসি পাস করেন। বাবা এসএসসি পড়েন, পরীক্ষা দেননি। কেবল ফোরকান ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারমিডিয়েটে পড়াকালে বিমানবাহিনীতে গিয়েছিলেন। জয়নাল চেয়ারম্যান বাইরে থেকে এসএসসি পাস করেছিলেন। তিনি ন্যাপ করতেন। তাঁর সহকর্মীরাও ন্যাপ করত। তাঁদের সঙ্গেই যোগাযোগ করলাম। তাঁরা ঠিক মেনে নিতে পারছিলেন না যে, আমাদেরকে সশস্ত্র লড়াই করতে হবে। বরং দিনে দিনে একটি আপসকামিতার বিষয় স্পষ্ট হচ্ছিল তাঁদের কাছে। তবে তাঁরা সংগ্রাম কমিটিতে থাকতে রাজি হলেন। আমার বাবা আব্দুল জব্বার তালুকদার তখন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ভালো মানুষ–তবে তখন সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দল করেন না। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে আমি কাজ করেছি বলে বাবা আওয়ামী লীগের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং তাঁদের সঙ্গে বাবার পরিচিতি গাঢ় হয়ে যায়। সত্তরের নির্বাচনের এমপি মরহুম আব্দুল খালেক সাহেব বাবাকে ভীষণ পছন্দ করতেন। নির্বাচনি প্রচারে যখনই আমাদের গ্রামে আসতেন, তখন উঠতেন আমাদের বাড়িতে। এরপর বাবা ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। নির্বাচনের পর বাবাকে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলা হলো স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম কমিটি। ন্যাপের অনেকেরই দো-মনা ভাব ছিল। তাঁরা আবার বাবাকে তেমনভাবে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁরা প্রায় সবাই মনে করতেন, পাকিস্তানের সঙ্গে আপস হবে। কিন্তু আমি জানতাম, আপস হবে না। ঢাকার সঙ্গে কোনো যোগাযোগের উপায়ও নেই। প্রত্যহ বিবিসিতে খবর পাচ্ছি। বাড়িতে পত্রিকা আসে তিন/চারদিন পর। কখনো সাতদিনেও পত্রিকা আসে না। ২০ মার্চের পর মনে হলো আমি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে গেছি। রেডিয়োতে যেসব খবর আসে, এর সঙ্গে আমার বন্ধুদের সিদ্ধান্ত যে মিলবে না, সেটি আমি জানি। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের আমাদের অংশটি কোন পথে যাচ্ছে। সেই মাসখানেক আগে আমরা সশস্ত্র লড়াই করে দেশ স্বাধীন করার যে পথ ধরেছিলাম, সেই পথেই আমরা তখনও আছি কি না বা নতুন কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে কি না–সেসব জানার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়ি। আজকের দিনে এটি হয়তো কল্পনাও করা যাবে না যে ১৫ দিনে আমি আমার শত শত বন্ধু ও রাজনৈতিক সহকর্মীর একজনের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি। তখন আমার বাড়ি থেকে ঢাকা শহরে চিঠি আসত ১৫ দিনে। এর জবাব পেতে লাগত আরও ১৫ দিন। আমাদের থানায়ও কোনো টেলিগ্রামের ব্যবস্থা ছিল না। থানা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মোহনগঞ্জে ছিল টেলিগ্রাম অফিস। ফোন বা অন্য কোনো যোগাযোগ তো চিন্তাও করা যেত না। আমাদের ইউনিয়নে তিন কপি সংবাদ পত্রিকা যেত। সেটিও তিন থেকে ১০ দিন পর পৌঁছত। সংবাদ থেকে আমি আমার রাজনৈতিক সহকর্মীদের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি অনুভব করতে পারছিলাম না। কারণ সংবাদ ন্যাপের পত্রিকা। শেষ পর্যন্ত ২৫ মার্চ সকালে ঢাকা রওয়ানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাবাকে সালাম করতে গেলেই বাবা থামিয়ে দিলেন–বললেন, বৃহস্পতিবার দক্ষিণে যাওয়া যাবে না। শুক্রবার জুমার পর রওয়ানা দিতে হবে। বাবার কথা শুনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলাম। পরে উপলব্ধি করেছি কুসংস্কার মানার ফলে সেই যাত্রায় নিশ্চিত বেঁচে গেলাম। অন্তত নানা বিড়ম্বনা থেকেও রক্ষা পেলাম। তবে যদি কোনোমতে সেদিন আমি বাড়ির বাইরে পা ফেলতে পারতাম তবে আমার একাত্তরের নয় মাস একটু ভিন্ন হতো। যুদ্ধের পরে জেনেছি, সেই বৃহস্পতিবার রাতে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু জহুরুল হক হলের চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান শহিদ হয়েছেন। আমি হয়তো আজমিরীগঞ্জ থেকে ফিরেই আসতাম। ভৈরব হয়ে ঢাকা যাওয়া হতো না।

পঁচিশে মার্চের ঢাকার পথের সেই রওয়ানা দিয়েছিলাম আমি প্রায় দশ মাস পর–১৪ জানুয়ারি ১৯৭২। পৌঁছেছিলাম ১৬ জানুয়ারি

১৯৭২। আবারো সেই আফতাবের টেলিগ্রাম, কাম শার্প। সেই টেলিগ্রাম নিয়ে যখন গুলিস্তান হয়ে সূর্যসেন হলের দিকে রিকশায় যাচ্ছি, তখন মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি আর আমাকে হলে যেতে দিলেন না। বললেন, র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে চলো–আফতাব ওখানেই। সেখানেই তোমাদের কাজ। সেখানে গিয়েই শুরু করি এক নতুন জীবন।

সে কথা আরও পরে বলা যাবে। পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত আমাদের অবস্থান ছিল একরকম। প্রায় পুরো দেশটা আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে। তখন বলতে গেলে আমি পুরো প্রশাসন চালিয়েছি। এলাকার তেল-লবণ রেশনিং করতাম। থানা চলত আমাদের কথায়। ২৬ মার্চ থেকে গ্রামেই শুরু হলো আমার আরেক জীবন। যুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেছে। এলাকায় সংগ্রাম কমিটি আগেই করা হয়েছিল। বাবা আর কেতন ভাই (মরহুম ডাক্তার নিয়াজ মোহাম্মদ) ছাড়া প্রায় সবাই ন্যাপের লোক। আমাদের গ্রামের মাতব্বররা রাজনীতি বুঝেন না। বাবা যা বলেন, তা-ই মানেন। এলাকায় পাকিস্তান বাহিনী বলতে কিছু নেই। বাবার নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি সব নিয়ন্ত্রণ করে। থানার পুলিশ বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে, তারা থানার বাইরে আসবে না। প্রশাসন যেন তিনিই চালান। তখন গ্রামে পুলিশের কোনো প্রয়োজনও ছিল না। কারণ মানুষ নিজেরা নিজেদের মাঝে সমঝোতা করেই জীবনযাপন করত। আইন-আদালত কখনো কেউ দেখত না। ছোটোখাটো বিরোধ নিজেরাই মীমাংসা করে নিত। মার্চে আমাদের কৃষকরা দুশ্চিন্তায় ছিল যে ধান কাটার জন্য এলাকার বাইরে থেকে ধান কাটার শ্রমিক আসবে কিনা। সচরাচর মানিকগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ এলাকা থেকে এসব ধান কাটার শ্রমিক আসত। এরপর আসে এপ্রিল-বৈশাখ মাস। ততদিনে ধান কাটা শুরু হয়েছে। দাওয়ালরা (ধান কাটার বাড়তি শ্রমিক) এসেছে। ভৈরব পর্যন্ত নৌ চলাচলে সমস্যা নেই। ভৈরবের সেতুর এপারে হাওর অঞ্চলে চলতে নৌকায় জয় বাংলার পতাকা উড়ে। এই এলাকাটি পুরোটাই মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ভাটিতে যাওয়ার পথে ভৈরব সেতু দেখা গেলেই মাঝিরা জয় বাংলার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানি পতাকা উড়ায়।

পাকিস্তানিরা এমন দুর্গম এলাকা দিয়ে গানবোট নিয়েও যাওয়ার সাহস করেনি। চারপাশে নির্জন জায়গা থেকে কখন তাদেরকে অ্যাম্বুশ করা হয়, সেই ভয় ছিল তাদের। তাছাড়া ওখান থেকে পালানোর পথ ছিল না। থানা সদরটিও একেবারে ধনু নদীর পাড়ে ছিল না

মার্চ-এপ্রিল পেরিয়ে মে-জুনে পুরো দেশেই পাকিস্তান বাহিনী অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। বিশেষ করে যোগাযোগ আছে তেমন শহরগুলোয় পাকিস্তান বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে ওঠে। তৎকালীন ইপিআর, ছাত্র-জনতা যতটা সাধারণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, পেশাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সামনে সেটি টিকে থাকার কথাও ছিল না। তবে আমার থানা খালিয়াজুরী বা হাওর এলাকার জন্য এসব কোনো ঘটনাই ছিল না। বর্ষার পানি আসার পূর্বপর্যন্ত খালিয়াজুরী সদরে যাওয়া মানে ধনু নদী দিয়ে নৌযানে যাওয়া এবং হাঁটা। পাকিস্তানিরা এমন দুর্গম এলাকা দিয়ে গানবোট নিয়েও যাওয়ার সাহস করেনি। চারপাশে নির্জন জায়গা থেকে কখন তাদেরকে অ্যাম্বুশ করা হয়, সেই ভয় ছিল তাদের। তাছাড়া ওখান থেকে পালানোর পথ ছিল না। থানা সদরটিও একেবারে ধনু নদীর পাড়ে ছিল না। নদী থেকে নেমে কয়েক মাইল হাঁটতে হতো। এর বাইরে বড়ো বিপদ ছিল, থানা থেকে হাঁটা ছাড়া থানার আর কোথাও যাওয়া যেত না। যেদিকেই যাক না কেন, ২৫-৩০ মাইল হাঁটতে হতো। নৌকায় যেতে হলে পুরো দিনে কেবল হয়তো যাওয়া যেত। সেদিন আর ফিরে আসা যেত না। থানার বাইরে রাতে থাকার কথা স্থানীয় পুলিশও ভাবতে পারত না। স্বাভাবিক অবস্থায় পুলিশ বা থানার অন্য কোনো কর্মকর্তা গ্রামে গেলে অবস্থাপন্ন মানুষের বাড়িতে থাকত। কিন্তু তখন কেউ বাড়িতে পুলিশ রাখতে রাজি ছিল না। পুলিশের আশ্রয় হিসেবে মুক্তিবাহিনীর হাতে জীবন দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। থানায় কোনো দ্রুত গতির নৌযানও ছিল না। ফলে খালিয়াজুরী থানার সাধারণ মানুষ পুলিশ বা পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা বিরক্ত হয়নি। রেডিয়োতে দেশের সংকটের খবর শোনার বাইরে হাওরের মানুষের জীবনে মার্চের ঘটনার আর কোনো প্রভাবই ছিল না। তাদের প্রথম ভয় ছিল, এলাকার বাইরে থেকে যদি লবণ-কেরোসিন বা কাপড় না আসে তবে খেয়ে-পরে বাঁচতে অসুবিধা হবে। এই তিনটি জিনিস ওখানে তৈরি হয় না। খাবার তেলও সেখানে ছিল না। তবে কৃষক সরিষা বুনত বলে খাবার তেলের ভয় তাদের ছিল না। কিন্তু লবণ-কেরোসিন ছাড়া তো জীবন চলবে না। ফলে এর জন্য হাওরের মানুষ বাইরের বন্দর যেমন আজমিরীগঞ্জ বা ভৈরবের ওপর নির্ভর করত। দিনে দিনে এসব পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে পড়লে সেসব নিয়ে তাদের চিন্তা দূর হয়ে যায়। এরপর তাদের চিন্তা ছিল ধান কাটার জন্য বাইরের শ্রমিক বা দাওয়াল আসবে কি না। বৈশাখ আসার আগেই দেখা গেল, সেই শ্রমিকরাও এসে যায়। তারা যেসব রসদ নিয়ে অন্য বছর আসত, সেসব রসদ নিয়ে সেই বছরও এলো। ফলে লবণ-তেলের অভাব আর থাকল না। তারা জানত, পাকিস্তানিরা আর যেখানেই যাক, হাওরের গভীরে গিয়ে শাসন কায়েম করবে–তেমন সাহস তাদের ছিল না। অবশ্য পুলিশ প্রশাসন সেই সময়ে চালু হয়। পুলিশ থানায় বসে থেকে মাসে মাসে বেতন নিত। থানার বাইরে ওদের কোনো কাজ ছিল না। আমার স্মরণ হয় না যে, একাত্তরে ৯ মার্চের পর আমি আমার এলাকার কাউকে থানায় মামলা করতে বা অন্য কোনো কাজে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তখন বস্তুত থানা সদরে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো কাজও ছিল না। খালিয়াজুরী থানার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ওখানে কিছুই–এমনকি একটি অতিসাধারণ বা ছোটো বাজারও ছিল না। ছোটো একটি গ্রামে থানা সদর স্থাপিত হয়। হাওরের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মতো ছিল গ্রামটা। অল্পসংখ্যক মানুষ বাস করত। স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল কিছুই ছিল না। সবচেয়ে কাছের গ্রামটার দূরত্বও ছিল পাঁচ–ছয় মাইল। ফলে থানার কোনো গ্রামের মানুষ সচরাচর থানা সদরে যেত না। থানার পূর্বাঞ্চলের মানুষ যাতায়াত করত আমাদের গ্রামের বাজারে। ওখানে সপ্তাহে দুদিন শনি-মঙ্গলবার বাজার বসত। থানার উত্তরাঞ্চলের মানুষ যাতায়াত করত লিপসা বাজারে। থানার পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ বোয়ালী বাজারে যাতায়াত করত। দক্ষিণের মানুষ যেত ইটনার ধনপুর বাজারে। বাজার হিসেবে লিপসা অনেক বড়ো ছিল। ধনু নদীর পাড়ে ছিল বলে এর গুরুত্বও ছিল অনেক। কাঠ-বাঁশ ছাড়াও বালু-পাথর-তেলবাহী কার্গো জাহাজগুলো লিপসায় রাত

কাটাত। ফলে অপেক্ষাকৃত বড়ো নদীবন্দর ছিল লিপসা। ধনপুর বাজারটিও ধনুর কাছেই ছিল। আমাদের বাজারটা সুরমার পাড়ে অবস্থিত। এটি থানার পূর্বপ্রান্তে থাকলেও বিশেষত শাল্লা থানার গ্রামগুলোর জন্য বাজারটির গুরুত্ব ছিল অনেক।

আমাদের পাশের থানা শাল্লার অবস্থাও ছিল খালিয়াজুরীর মতো। শাল্লার প্রথম সদর দপ্তর ছিল শাল্লা নামক গ্রামে। সেটি কুশিয়ারা নদীর পাড়ে এবং আজমিরীগঞ্জের কাছে ছিল। কিন্তু নদীভাঙনের ভয়ে থানা সদরটি শাল্লা গ্রাম থেকে সরিয়ে ঘুঙ্গিয়ার গাও নামক একটি অজগ্রামে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে এমনকি একটি মুদি দোকানও ছিল না। এসব থানায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আসার বা থাকার কথা ভাবাই যেত না। আমার নিজের বাড়িটা ছিল শাল্লা ও খালিয়াজুরী থানার সীমান্তে। আমাদের হাওরটি হচ্ছে ছায়ার হাওর, যার শতকরা ৭৫ ভাগ শাল্লায় এবং বাকিটা খালিয়াজুরীতে। আমার জন্য তাই খালিয়াজুরীর পাশাপাশি শাল্লা থানার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বস্তুত, শাল্লা থানায় রাজাকার বাহিনী তৈরি না হলে হয়তো আমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়াই হতো না। পুরো নয়টা মাস হয়তো আমি মুক্তাঞ্চলেই কাটাতে পারতাম।

ধীরে ধীরে হাওরে বর্ষার পানি আসে। ধান কাটার পর মানুষ অলস সময় কাটানোর সময় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ আলাপ-আলোচনাও করে। চারদিকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হতে শুরু করেছে। প্রাথমিক প্রতিরোধের পর সামনাসামনি যুদ্ধ করে যে টিকে থাকা যাবে না, সেটি অনুভব করার পর গেরিলা যুদ্ধের ধারণা আসে। আমি স্মরণ করতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যে ধরনের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে বলে মনে করতাম, সেটি হলো গেরিলা যুদ্ধ। অনেক আগেই বিএলএফ-এর ধারণা ছিল। ছাত্রলীগের ত্যাগী, মেধাবী ও দেশপ্রেমিক কর্মীদের সংগঠিত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একটি বাহিনীকে কাজ করতে হবে, সেটিও আমার জানা ছিল। আমাদের মাঝে তখন রেজিস দেবরে এবং চে গুয়েভারা খুব জনপ্রিয়। আমরা লাওস-ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি পড়ি। প্রায় সবাই কাস্ত্রোর বই পড়ে ফেলেছিলাম। বলাকা বা নাজ সিনেমা হলে তখন আমরা যুদ্ধের ছবি দেখি। পেট্রোলবোমা বানানো তখন মামুলি ঘটনা। মনে আছে, ১ মার্চেই আমরা দুটি ব্যাংক থেকে বন্দুক লুটেছিলাম। কিছুটা সামরিক প্রশিক্ষণ, কিছুটা সামরিক জ্ঞান তখন আমাদের জানা হয়ে গেছে। একই সঙ্গে আমাদের মগজে ছিল সমাজতন্ত্রের আদর্শ। তবে পার্থক্যটা হলো আমরা স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ চাই। আমাদের কাছে পিকিং বা মস্কো কোনো বিষয় নয়। কিন্তু আমার এলাকায় যারা প্রবলভাবে সমাজতান্ত্রিক তাঁরা মনে করত স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো জিনিস সমাজতন্ত্র। পাকিস্তানে থাকতেও তাঁদের কোনো সমস্যা নেই যদি সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। আমাদের বিশ্বাস–ছিল সমাজতন্ত্র চাই; কিন্তু এর আগে চাই দেশটা স্বাধীন হোক।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বাড়ির উত্তরে সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনার ভারত সীমান্তের গারো পাহাড়ে যথাক্রমে টেকেরঘাট ও মহিষখলায় অন্তত দুটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল। সুনামগঞ্জেরটির নেতৃত্ব ন্যাপ-সিপিবি ঘরানার মরহুম বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের হাতে ছিল। নেত্রকোনা অঞ্চলের নেতৃত্ব তৎকালীন এমপি (মরহুম) আব্দুল খালেক সাহেবের হাতে ছিল। সম্ভবত নেতৃত্বের কারণেই ছাত্র ইউনিয়ন ঘরানার তরুণরা টেকেরঘাটে যেত এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মহিষখলায় যেত। আমিও এপ্রিলের শেষের দিকেই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা ভাবলাম। আমি সত্তরের নির্বাচনে খালেক সাহেবের নির্বাচন করেছি। তাঁর সঙ্গে আমার এবং বাবার সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। বাবাকে বললাম, খালেক সাহেব আছেন মহিষখলার ক্যাম্পে, তাঁর মাধ্যমে আমি মুক্তিযুদ্ধে যাব। যেমনটি সব সময়েই হয়–বাবা চারপাশে এমন কোনো অবস্থা দেখলেন না যে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে দেওয়া উচিত বলে তার মনে হতে পারে। হাওরের জল শান্ত। আশপাশে না আছে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, না আছে পাকিস্তান বাহিনী এবং না আছে তাদের দোসর রাজাকার বাহিনী। আমাদের থানাটি তখন তো বটেই পুরো নয় মাস মুক্তাঞ্চল ছিল। কোনো সময়েই ওখানে কোনো ধরনের সশস্ত্রবাহিনীর কেউ আসেনি। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা লিপসা বাজারে একটি ক্যাম্প স্থাপন করেছিলাম। থানা সদর ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ওড়েনি বা পাকিস্তানের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। পাশের থানা শাল্লায়ও যুদ্ধের শুরুতে একই অবস্থা ছিল। হাওরে পানি আসা পর্যন্ত সেখানে কারও কোনো পদচিহ্ন পাওয়া যায়নি। তখন বাবা জানলেন যে, ভাটি এলাকায় ভৈরব পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদারদের কোনো অস্তিত্বই নেই। তিনি আমাকে বলে দিলেন, যুদ্ধ করবে, মুক্তাঞ্চলে থেকেই করো। সেই সময়ে আমাদের মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করি আমরা। খালিয়াজুরীর পশ্চিম দিকের সঙ্গে আমাদের তেমন কোনো যোগাযোগ রাখার দরকার হয় না। মোট ছয়টি ইউনিয়নের শেষ দুটি ৫ ও ৬ নম্বর আমি নিয়ন্ত্রণ করি। দুটি ইউনিয়নেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বেশি। তাঁরাও তখন শরণার্থী হয়নি। নিজের বাড়িতে থেকেই শান্তিতেই বসবাস করছিল তাঁরা সবাই। ফলে বাবা কোনোমতেই আমাকে যুদ্ধে যেতে দিলেন না। যতবারই তাঁর অনুমতি চাই, ততবারই তিনি 'না' বলেন। এপ্রিল থেকেই আমি দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু কোনোমতেই বাবার কাছ থেকে অনুমতি পাচ্ছি না। তখন চরম অস্থিরতা কাজ করেছে আমার মাঝে। আমার এলাকায় মুসলমানদের মাঝে রাজনীতি সচেতনতা খুবই কম ছিল। তবে হিন্দুরা শিক্ষায় ও সচেতনতায় এগিয়ে ছিল বলে বাম রাজনীতি সেখানে বেশ পোক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছিল। উনসত্তরে ন্যাপের নেতাদের পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে তেমন পাওয়া যেত না। তারা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বুলি ছড়াতেন। মস্কোপন্থি ন্যাপই ছিল প্রধান দল। সেই সময়েও আমি আমাদের বাজারে ধর্মঘট করেছি। কিন্তু তখন তারা এর প্রতি সমর্থন দেয়নি। সত্তরে ন্যাপ আলাদা নির্বাচন করেছে। তবে একাত্তরের ৯ মার্চের পর স্থানীয় ন্যাপ নেতারা আমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই কাজ করেছেন। তাঁরা আমাদের তৈরি করা সংগ্রাম কমিটিতেও শরিক ছিলেন। তবে আমি লক্ষ করছিলাম যে, সংগ্রাম কমিটির কাজও তেমন কিছু ছিল না। সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা এবং সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজই ছিল আমাদের। খালিয়াজুরীর মরহুম সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার এক্ষেত্রে বেশ বড়ো ভূমিকা পালন করেন। ওই সময়ে আমি ও সিদ্দিকুর রহমান খালিয়াজুরীর পুরো এলাকা চষে বেড়াই। এর ফলে ইটনার কাছে পাঁচহাট বা ধনপুর থেকে শুরু করে লিপসা পর্যন্ত পুরো এলাকাতেই ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি প্রবলভাবে গড়ে ওঠে। সত্তর সালের নির্বাচনে যারা আমাদেরকে সহায়তা করেছিলেন বা নৌকা মার্কার পক্ষে কাজ করেছিলেন, তাঁরা দিনে দিনে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকেন।

ঢাকা শহরের ছাত্ররাজনীতিতে যারা আমার সঙ্গে যুক্ত, তাদের কারও কোনো খবর ছিল না। কিন্তু এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, ওরা কেউ চুপ করে বসে নেই। আমরা সশস্ত্র যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করব, সেই সিদ্ধান্ত তো নেওয়াই আছে। ওরা নিশ্চয়ই সশস্ত্রযুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। হয়তো তারা ভারতে গিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েও ফেলেছে। আমার এলাকাটি মুক্তাঞ্চল ছিল এবং এখানে পাকিস্তান

বাহিনীর আক্রমণ করার আশঙ্কা ছিল না। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে প্রকৃতি আমাদেরকে নানাভাবে বুকের মাঝে লালন করে যে অস্থানীয় কোনো মানুষ এখানে আর যাই করুক যুদ্ধ করতে আসবে না। তবে ভয় ছিল, স্থানীয় কোনো লোক হয়তো পাকিস্তানিদের দোসর হয়ে উঠতে পারে। এমনকি তাদের হাত ধরে পাকিস্তানিরাও এখানে যুদ্ধ করতে আসতে পারে। বড়ো ভয় ছিল পুরো এলাকায় হিন্দুর সংখ্যা অনেক ছিল বলে। পাকিস্তানিরা ধর্মের নামে হিন্দুদের ওপর যে নির্যাতন করছে, সেটি প্রতিরোধ করা খুবই জরুরি। আমার নিজের কাছেই প্রশ্ন ছিল তখন এই এলাকাটিকে কেমন করে রক্ষা করব। তাছাড়া তখন পাশের থানা শাল্লার দুই প্রভাবশালী চেয়ারম্যান খালেক ও শরাফত রাজাকার বাহিনীতে যাওয়ার কথা ভাবছে। ওরা যদি রাজাকার হয় এবং এলাকায় ফিরে আসে তবে আমাদের জন্যও সমস্যা তৈরি হবে। কিন্তু বাবাকে সেটি বোঝাতে পারা যাচ্ছে না। কেবল যে মুখের বুলিতে যুদ্ধ হবে না এবং আমাদের যে অস্ত্র দরকার সেটিও বাবাকে বোঝানো যাচ্ছে না। চারপাশে স্বাভাবিকতা দেখে বাবা কোনোভাবেই ছেলেটাকে যুদ্ধে পাঠাতে রাজি হননি। আমার দিন তখন এলাকার আমার বয়সি বা তার চেয়ে কম বয়সি ছেলেদের নিয়ে কাটে। আলাপ-আলোচনা, রেডিয়ো শোনা এবং ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির বড়ো নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে সময় কাটে। এলাকার লোকজন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তেমন ব্যস্ত নয়। জীবন তো স্বাভাবিক। কেবল লবণ আর কেরোসিন বাইরে থেকে কিনতে হয়। পাশের গ্রাম কল্যাণপুরের নুরুল্লাহ নামক একজন ব্যবসায়ীকে আমি স্লিপ দিলে রেশনিংয়ের মতো লবণ আর কেরোসিন দেওয়া হয়। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। বর্ষার পানি আসার পর নৌকার চলাচল স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ফলে লবণ-কেরোসিনের সরবরাহও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে গেল। রেশনিং আর দরকার হলো না।

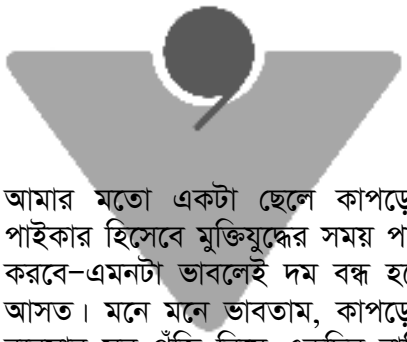

আমার মতো একটা ছেলে কাপড়ের পাইকার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় পার করবে–এমনটা ভাবলেই দম বন্ধ হয়ে আসত। মনে মনে ভাবতাম, কাপড়ের ব্যবসার সব পুঁজি নিয়ে একদিন বাড়ি ছেড়ে পালাব। কিন্তু বাবার কথা ভেবে তেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি

বারবার চেষ্টা করেও যখন যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি পাচ্ছিলাম না, তখন হতাশায় একবার ঠিক করলাম–মুক্তিযুদ্ধ নামক কিচ্ছু আমি করতে পারব না। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একটি ছেলেকে ঘরে বন্দি করে রাখা যে একটি মারাত্মক অন্যায়, সেই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাছাড়া বাবা জানতেন যে, আমি নন-পলিটিক্যাল ছেলে নই। বাবা সেইসব উপলব্ধি করছেন না দেখে কষ্ট পাচ্ছিলাম। বাবার এই পসেসিভ মানসিকতার জন্যই মাঝেমধ্যে আমার মনে হতো, বিদ্রোহ করি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই এমনভাবে বড়ো হয়েছি যে, বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মানসিক শক্তি আমার ছিল না। বাবার হাতে মার খেয়েও কোনোদিন প্রতিবাদ করার সাহস পাইনি। যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছি, তখনও তিনি আমাকে জুতাপেটা করেছেন। দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সাহসও আমার ছিল না। বাবার পরামর্শে হতাশ হয়ে মে মাস নাগাদ আমাদের গ্রামের বাজারে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করলাম। পুঁজি দিলেন বাবাই। ভৈরববাজার থেকে কেউ একজন কাপড় এনে দেন, স্থানীয়ভাবে আমি সেইসব কাপড় কিনি এবং আমাদের বাজারের নিজেদের একটি ভিটায় বসে আমি কাপড় বিক্রি করি। শাড়ি-লুঙ্গি এসব কাপড়। কিন্তু তাতেও মন বসাতে পারলাম না। আমার মতো একটা ছেলে কাপড়ের পাইকার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় পার করবে–এমনটা ভাবলেই দম বন্ধ হয়ে আসত। মনে মনে ভাবতাম, কাপড়ের ব্যবসার সব পুঁজি নিয়ে একদিন বাড়ি ছেড়ে পালাব। কিন্তু বাবার কথা ভেবে তেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।

এমন একটি অবস্থায় আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে থাকি। আমার মাঝে এই বিষয়গুলো কাজ করে যে নিজে বাংলাদেশের পতাকা, জাতীয় সংগীত, ইশতাহার ইত্যাদি প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর বাড়িতে বসে থাকব, সেটি কেমন করে হয়। দাদা (সিরাজুল আলম খান), রব ভাই, শাজাহান সিরাজ ভাই, মাহবুব ভাই এবং আফতাব এবং শামসুদ্দিনসহ সব বন্ধুর কথা মনে পড়ল। আমার কেবলই মনে হতে থাকল যে, ওরা কেউ এখন বসে নেই। এমনকি তারা যে বাংলাদেশে নেই, সেটিও আমি মনে মনে স্থির করলাম। স্বাধীনতার পরে জেনেছি যে, আমার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। ততদিনে ওরা সবাই ভারতে পাড়ি দিয়েছে। মুজিববাহিনী গঠন করে এর মাধ্যমে তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। দেশের মানুষের কাছে একেবারেই অপরিচিত একটি নাম মুজিববাহিনী। এতটাই অপরিচিত যে এখন পর্যন্ত মুজিববাহিনী বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি বা এর কোনো সঠিক ইতিহাস আমরা এখনো পাইনি। কোনো বইপত্রের হদিস নেই। তবে মুজিববাহিনীর গঠন বিষয়ে কথা বলার মতো মানুষ এখনো বেঁচে আছেন। সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ এখনো জীবিত। শেখ ফজলুল হক মনি পঁচাত্তরে নিহত হয়েছেন। এরপর নিহত হয়েছেন কাজী আরিফ। আবদুর রাজ্জাক কদিন আগে মারা গেলেন। তাঁরা সবাই মুজিববাহিনীর সংগঠক ছিলেন। অবশ্য মুজিববাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগঠক আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, মার্শাল মণি, হাসানুল হক ইনু প্রমুখরা এখনো জীবিত। সংগঠকদের মাঝে যারা জীবিত তাঁরা প্রায়ই এ কথা বলেন যে মুজিববাহিনী ১৯৭১ সালে গঠিত হলেও বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য একটি স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস ষাটের দশক থেকেই কাজ করছিল। সত্তর দশকে এই নিউক্লিয়াসের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক তরুণ যুক্ত হয়। ভাগ্যক্রমে আমিও সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। মুজিববাহিনীর প্রশিক্ষক ভারতীয় জেনারেল মেজর জেনারেল (অব.) এসএস উবান তার 'ফ্যান্টমস অব চিটাগং দ্য ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ' বইয়ে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি মুজিববাহিনী গড়ে তোলার বিষয়ে কিছু তথ্য দিয়েছেন। মুজিববাহিনী সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্য বইটিতে দেওয়া আছে। তবে মুজিববাহিনীর রাজনীতি সম্পর্কে জানতে হলে সম্ভবত এখনো যারা জীবিত আছেন, তাঁদের সঙ্গেই কথা বলতে হবে।

যাহোক, আমি তখনও জানি না আমার বন্ধুরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করছে নাকি মুজিববাহিনী গড়ে তুলেছে। ঘরে বসে সেই খবর পাওয়াও সম্ভব ছিল না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ভারতীয় বেতার, বিবিসি বা ভয়েস অব আমেরিকার খবরে এসব বিষয় জানা সম্ভব ছিল

না। তখন জ্যৈষ্ঠ শেষ হচ্ছে। পানিতে ভরে গেছে সারা হাওর অঞ্চল। ঘরে ধান উঠে যাওয়ার পরই ধীরে ধীরে আমাদের পাশের থানায় রাজনীতি গরম হয়ে পড়ল। শাল্লা থানার বাহারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরাফত আলী এবং দিরাই থানার শ্যামারচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ঘটনাটি আসলে স্থানীয় রাজনীতির প্রভাবে ঘটেছিল। এই দুই চেয়ারম্যানের লোকজন সুরঞ্জিত বাবুর প্রতিপক্ষ ছিল এবং স্থানীয় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে অবস্থান নিত। সত্তরের নির্বাচনে তারা সুরঞ্জিত ও আওয়ামী লীগ উভয়ের বিরোধিতা করেছিল। ওদের অবস্থান ছিল মুসলিম লীগের পক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সুরঞ্জিত ও আওয়ামী লীগের অবস্থানের ফলে তারা এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। শরাফত চেয়ারম্যানের বাড়ি ছিল সুলতানপুর গ্রামে। তার পরিবারটিও ছিল অনেক বড়ো। তার এক ভাই আহাদ স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল। আমরা হবিগঞ্জ থেকে একসঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। শরাফতের এক বোনের বিয়ে হয়েছিল আমাদের গ্রামে। মুক্তিযোদ্ধা কাশেমের দাদি ছিলেন তিনি। ছোটো সুলতানপুর গ্রামের অধিবাসী হয়েও শরাফত তাদের বাহারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে বারবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তার জন্য একটি বড়ো সংকট ছিল ইউনিয়নের হিন্দু ভোটাররা। ফলে তার একটি প্রবল আক্রোশ ছিল হিন্দুদের প্রতি। একই আক্রোশ ছিল খালেক চেয়ারম্যানের। চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য তাকেও এই হিন্দু ভোটারদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই একাত্তরে শরাফত বাহিনী পাশের থানার দিরাই থানার শ্যামারচর বাজারের খালেক চেয়ারম্যানের সঙ্গে হাত মেলায়। খালেক চেয়ারম্যানরাও আমাদের আত্মীয় ছিল। ওদের পরিবারে আমার এক ভাগনিকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয় হচ্ছে–সেই ভাগনিজামাইটিও রাজাকার ছিল। আমার ভাগনিটি আত্মহত্যা করে। আমাদের পরিবারের এবং গ্রামের মানুষের সঙ্গে উভয় চেয়ারম্যানের যোগাযোগ থাকলেও একাত্তরে তারা যখন রাজাকার হয়, তখন কারও সঙ্গেই তারা কোনো পরামর্শ করেনি। তারা ছাড়া এলাকার কোনো মানুষ তাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেনি। বরং আমার ধারণা–এ দুই চেয়ারম্যান একাত্তরের সার্বিক অবস্থাটিকে হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে।

সেই সময়েই আমাদের বাজার এলাকায় একটি ছোটো মুক্তিযোদ্ধাদের দল আসে। তারা শাল্লা থানায় নিয়োজিত ছিল। সুরঞ্জিত বাবুর ক্যাম্পে থেকে খুব সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে হালকা অস্ত্র নিয়েই তাঁরা আমাদের পাশের থানায় প্রবেশ করে। দলটির নেতা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শহীদ। তাঁর নিজের জন্য একটি এসএমজি, পুরো দলে একটি এলএমজি, কিছু গ্রেনেড এবং কয়েকটি থ্রি নট থ্রি ছিল। একটি ছোটো গস্তি নৌকা নিয়ে তাঁরা আমাদের ছায়ার হাওরে অবস্থান নিয়েছিল। একদিন বাজারবারে তাঁরা আমাদের বাজারে আসে কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে। এ ঘটনায় পুরো এলাকার মানুষ জানতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধারা কেবল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিষয় নয়, ওদের সরাসরি অস্তিত্ব রয়েছে। শহীদ সঙ্গে করে একটি এসএমজি নিয়ে এসেছিল। ফলে মানুষ এটিও জানতে পারে যে, মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র নিয়েই দেশে প্রবেশ করেছে। শহীদরা জানত যে, আমাদের এলাকাটি মুক্তাঞ্চল, শাল্লাও তখন মুক্তাঞ্চল। বস্তুত পুরো হাওর এলাকায় মুক্তাঞ্চল। শহীদ যেদিন বাজারে আসে, সেদিন আমি বাজারেই ছিলাম। শহীদের সঙ্গে কথা হলো। আমাদের গ্রামের কিনারায় মহাজন বাড়ির খালের কদম গাছতলাটায় ওদের নৌকাটা ছিল। আমি ওদের নৌকায় গেলাম। সবার সঙ্গেই পরিচিত হলাম। ২৫ মার্চের পর সেদিনই সম্ভবত সবচেয়ে আনন্দিত ছিলাম। কারণ সেদিনই প্রথম আমাদের স্বপ্নের মুক্তিবাহিনীকে পুরো এলাকার মানুষের সামনে উপস্থিত হতে দেখছিলাম। নৌকার কেউই আমাদের এলাকার নয়। দেশের নানা প্রান্ত থেকে ওরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। কারও বয়স তিরিশের উপরে নয়। ওরা জানাল যে, এই এলাকায় এসে তারা আমার কথা অনেক শুনেছে। এলাকাটি মুক্ত রাখার জন্য আমাদের জনপ্রচেষ্টার প্রশংসাও করল তারা। আমি তাঁদেরকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলাম। কিন্তু তারা জানাল যে, ওরা টেকেরঘাট থেকে নির্দেশ পেয়ে এসেছে যেন তাঁরা কারও বাড়িতে দাওয়াত না খায়।

শহীদ জানাল, টেকেরঘাটে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম দলটির প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং তাঁরা সশস্ত্র হয়ে তাঁর মতোই সুনামগঞ্জের বিভিন্ন থানায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তবে তাঁরা ছোটো ছোটো দল। যেহেতু তখনও শাল্লা থানায় পাকিস্তানি বাহিনী বা রাজাকার ছিল না, সেহেতু তাঁদের তেমন কোনো কাজও ছিল না।

আমাদের বাজারে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আসার ফলে পুরো এলাকাটিতেই বড়ো ধরনের ধাক্কা লাগে। প্রথম ধাক্কাটি হলো বাংলার তরুণরা অস্ত্র হাতে নিয়ে ফেলেছে এবং তাঁরা নিজেরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে। ব্যাপারটা এখন আর পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার ঘটনায় সীমিত নেই। এটি শুধু গোলমাল নয়। প্রায় সবাই এটি বিশ্বাস করতে থাকেন যে পাকিস্তান টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা আর বোধহয় নেই। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের পক্ষের লোকজনের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে যায় যে তাঁদেরকেও অস্ত্র হাতে নিয়েই টিকে থাকতে হবে। পাকিস্তানপন্থি শরাফত ও খালেকের দল নিশ্চিতভাবেই সশস্ত্র হয়। আমার চারপাশের তরুণদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহও ব্যাপকভাবে তৈরি হতে থাকে।

শহীদের কাছ থেকেই টেকেরঘাটের বিবরণ শুনলাম। সুনামগঞ্জের সীমান্তে টেকেরঘাটে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ইয়ুথ ক্যাম্প ছিল। সেটি পরিচালনা করতেন ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা। ওখানে ছাত্র ইউনিয়নের লোকজনকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করা হচ্ছিল। এরপর তাঁদেরকে ভারতে পাঠানো হচ্ছিল প্রশিক্ষণের জন্য। আমি বাড়িতে বসেই ঠিক করলাম, আমি ছাত্র ইউনিয়নের ক্যাম্পে যাব না। এর প্রধান কারণ, ওদের কাউকে আমি চিনি না। ওই এলাকার আওয়ামী লীগের নেতাদেরকেও তেমন চিনি না। সুরঞ্জিত বাবু আমার অপরিচিত। ফলে সেখানে গেলে সামান্য সহায়তাও হয়তো পাওয়া যাবে না মনে করে আমি আমার চেনাজানা এলাকার সন্ধানে লিপ্ত হই।

আমাদের গ্রামের কাশেম আমার সহপাঠী। ছাত্র ইউনিয়ন করত সে। কাশেম একদিন সিদ্ধান্ত জানাল যে, সে টেকেরঘাট যাবে। ওখানকার নেতারা ওর পরিচিত। স্কুলে সে হবিগঞ্জে পড়াশোনা করেছে। ফলে টেকেরঘাটের ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ওর পরিচিত। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমি কাশেমের সঙ্গে যেতে রাজি হলাম না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে নেত্রকোনার সীমান্তে মহিষখলা নামক একটি জায়গায় আওয়ামী লীগ নেতা ও '৭০ সালের এমপি খালেক একটি ইয়ুথ ক্যাম্প করেছেন। আমি সেখানে যাব বলে মনস্থির করলাম। আমি আন্দাজ করলাম ঢাকায় আফতাব-মাহবুব ভাই এরা কেউ নেই। ওরা সম্ভবত আগরতলা বা কলকাতায়। চারপাশের অবস্থার খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, ভৈরব হয়ে আমার বয়সি একটি যুবকের পক্ষে ঢাকা যাওয়ার কোনো মানে নেই। এমনকি কুমিল্লা হয়ে আগরতলা যাব, সেই পরিকল্পনায়ও বাবা রাজি নন। ভৈরব বাজারের মিলিটারিকে তাঁর ভীষণ ভয়। এমনকি পাশের থানার রাজাকারদের জন্য তিনি উদ্‌বিগ্ন হলেও মিলিটারির হাতে জানটা যাক, সেটি তিনি চান না। কিন্তু অবস্থা দিনে দিনে বদলাতে লাগল।

আমি যখন ঢাকায় বসে ছাত্রলীগের রাজনীতি করতাম, তখন আওয়ামী লীগের সব এমপি বা নেতাকে পছন্দ করতাম না। এমনকি সবাইকে বিশ্বাসও করতাম না। খালেক সাহেবকে নিয়ে আমাদের সেই সমস্যা ছিল না। আমি জানতাম, খালেক মুক্তিযুদ্ধ করার মতো প্রত্যয়ী লোক। তাছাড়া নেত্রকোনার ছাত্রলীগ তখন সিরাজুল আলম খানের ভক্তদের দখলে। আমি জানতাম, এরশাদ ভাই আমার মতোই সিরাজুল আলম খানের ভক্ত এবং ছাত্রলীগের আমাদের অংশের নেতা। সেজন্যই আমি ঠিক করলাম, মহিষখলাতে যাওয়াটাই ঠিক হবে। কিন্তু একা যাব কেন? একটি বড়ো দল তৈরি করার কথা ভাবলাম। আমার তো আসলে বড়ো দল ছিলই। যাদেরকে দিয়ে মার্চ থেকে সংগ্রাম কমিটির কাজ করিয়েছি, তাঁদের নিয়েই যুদ্ধে যাওয়া যায়। আমাদের সংগ্রাম কমিটির মুরুব্বি বা বয়স্কদের বাদ দিয়ে আমার বয়সি বা আমার চাইতে কিছুটা বেশি বয়সি লোকজনকে একত্রিত করা শুরু হলো। তবে আমরা লক্ষ রাখলাম যেন এই দলের লোকগুলো খুবই বিশ্বস্ত হয়। শুরুতেই পাওয়া গেল বাচ্চুকে, আমার সমবয়সি, অসম সাহসী–সম্পর্কে ভাগিনা। ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চু আর আমি একসঙ্গে বড়ো হয়েছি। আমি যখন হাইস্কুলে পড়তে যাই, তখন বাচ্চু ব্যবসায় নামে। ওই বয়সেই গ্রামের বাজারে দারুণ সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু পড়াশোনাটা আর হয়ে ওঠেনি। একসময়ে ঢাকায় দোকান দিয়েছিল। কিন্তু কী ভেবে ঢাকা ছেড়ে চলে আসে গ্রামে। বাচ্চুর চেয়ে আমার বিশ্বাসী আর কেউ হতেই পারে না। বাচ্চুর সহায়তায়ই দল ঠিক হলো। বাচ্চুসহ ১৪ জনের পুরো দলটির মাঝে আমার কয়েক সহপাঠী ছিল। আমাদের গ্রামের মোহন মিয়া এবং কল্যাণপুরের সফর আলী ও মহরম ছিল আমার সহপাঠী। এদের সঙ্গে আমি প্রাইমারিতে পড়েছিলাম। এছাড়া ছিল কিছু অতিসাধারণ মানুষ। এদের কেউ কেউ দিনমজুরও ছিল। এখন হয়তো সবার নাম মনে নেই। যেটুকু স্মরণ করতে পারছি তাতে মনে হচ্ছে আমার দলে ছিল: কৃষ্ণপুরের লিয়াকত আলী বাচ্চু ও মোহন মিয়া, নীরু চৌধুরী, মালু মিয়ার ছেলে লিয়াকত, আছু দালালের ছেলে আবুল ও গনি মিয়া, কল্যাণপুরের আবুল কাশেম (জজ মিয়া), নুরুল ইসলাম ও ভুগোইল্যা। নৌকার মাঝির নাম ছিল আব্দুল জব্বার। তাঁর সাথী ছিল আব্দুল হেকিম এবং মহরম আলী। ওরা তিন ভাই ছিল। আমার সাথীদের মাঝে ভুগোইল্যা খুবই গরিব ছিল। এমনকি নৌকার ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। তবে সেটি কোনো বাধা হলো না। বাচ্চু অনেক ছোটো বয়স থেকেই ব্যবসা করে। আমিও কিছুদিন ব্যবসা করেছি। ফলে আমরা টাকার দিক থেকে একেবারেই দুর্বল নই। তবে সবাইকেই কিছু না কিছু টাকা বা চাল-ডাল জোগাড় করতে বলা হলো। এদের মাঝে বাচ্চু ছিল আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত। ভুগোইল্যাও ছিল আমার খুবই ভক্ত।

আমাদের সেই যাত্রা শুরু করার সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হলো। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ, সম্ভবত ২৩ তারিখ, শুক্রবার। চারদিকে ভরা বর্ষা। চারপাশে অথই পানি। হাওরের যৌবন বলে যাকে। যাত্রা হবে আমাদের পাশের গ্রাম কল্যাণপুর থেকে। আমাদের গ্রাম থেকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। কারণ, বাবা জেনে যেতে পারেন এবং এর ফলে পুরো যাত্রাটাই পণ্ড হয়ে যেতে পারে।

আমাদের সেই যাত্রা শুরু করার সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হলো। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ, সম্ভবত ২৩ তারিখ, শুক্রবার। চারদিকে ভরা বর্ষা। চারপাশে অথই পানি। হাওরের যৌবন বলে যাকে। যাত্রা হবে আমাদের পাশের গ্রাম কল্যাণপুর থেকে। আমাদের গ্রাম থেকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। কারণ, বাবা জেনে যেতে পারেন এবং এর ফলে পুরো যাত্রাটাই পণ্ড হয়ে যেতে পারে

কল্যাণপুর গ্রামেরই অলেক মিয়ার বাড়ি থেকে সন্ধ্যার পর উত্তরের দিকে রওয়ানা দিয়ে আমরা একটি হাওর পাড় হয়ে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরের আদাউড়া নামক গ্রামে গিয়ে সুধীর মাস্টারের বাড়িতে রাতে থাকব এবং পরদিন মহিষখলার পথে সুনুই গ্রামের হেকিম সাহেবের বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাব। এভাবেই সবাই মহিষখলা যাই। তখন অনেক শরণার্থী নৌকা এভাবেই মহিষখলা গিয়েছে। হেকিম সাহেব বলতে গেলে লঙ্গরখানা খুলেছেন। মুক্তিযোদ্ধা হলে তাঁর একটু বেশি কদর। তবে শরণার্থীরাও কম আদর পান না। তিনি ওই বছর যত ধান পেয়েছিলেন, এর সবই নাকি সিদ্ধ করে ফেলেছিলেন মেহমানদের খাওয়ানোর জন্য। আমরা যে নৌকায় যাব, তাঁরা এর আগে শরণার্থীদেরকে মহিষখলায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে। পুরো পথটাই তাঁদের তাই জানা। হাতে দাঁড়টানা নৌকায় পরের দিন অর্থাৎ দেড় দিনের পরের দিন দুপুর নাগাদ আমরা মহিষখলা পৌঁছতে পারব। পথে তেমন বিপদের ভয় নেই। বলা যায়, পুরোটাই মুক্তাঞ্চল। কোথাও পাকিস্তানি বাহিনীর কোনো ঘাঁটি নেই। ধনু দিয়ে কার্গো লঞ্চ চলে। কখনো গানবোটও চলে। বেশির ভাগ সময়েই কার্গো লঞ্চকে গানবোট মনে করা হয়। এলাকায় তখন ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে মানুষ পরিচিত নয়। সেজন্য হাওর দিয়ে যেতে হবে, ধনু দিয়ে নয়। তবে তাতেও সাবধানের মার নেই। পাকিস্তানি গানবোট থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের নৌকার মতো ছোটো নৌকা দেখলেই ওরা গুলি চালায়, মুক্তিযোদ্ধা বা হিন্দু শরণার্থী মনে করে।

বাবাকে না জানিয়েই যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। সাথীরা তৈরি। নৌকা প্রস্তুত। টাকাকড়ি নেই। তাতে কোনো সমস্যার কথা মনে হলো না। আমাকে পালাতে হবে বিধায় একটি কারণ দাঁড় করানো হলো। মাঝেমধ্যেই আমি আমাদের নিজের বাড়িতে না থেকে রাতে ফুপু বা জেঠাদের বাড়িতে থাকি। আমার ফুপুর বাড়িটা কাছে। ওটা আবার আমার বোনেরও শ্বশুর বাড়ি। বাবা বড়ো বোনকে আমার ফুপাতো ভাইয়ের কাছে বিয়ে দিয়েছেন। আমার নিজের বোন ছাড়াও এ বাড়িতে আমার আরও এক ফুপাতো বোনের বিয়ে হয়েছে। তিনি আমাকে ভীষণ আদর করেন। তাঁর বড়ো মেয়ে রিজিয়া আমার সঙ্গে সত্তর সালে নির্বাচনে কাজ করেছে। সেই নাইনে পড়া মেয়েকে দিয়ে বোরকা পরিয়ে আমি অনেক ভোট দেওয়াতে পেরেছিলাম। একাত্তরে যতদিন বাড়িতে ছিলাম, ওকে আমি পড়াতাম। রাতে সেখানেই বেশি থাকতাম। ঠিক করলাম, বাবাকে ফুপুর বাড়িতে থাকব বলে বাড়ি থেকে বের হব। ফুপুর বাড়ি পার হয়ে আমাদের নৌকা ছাড়ার গ্রাম কল্যাণপুরে যেতে হবে।

গ্রামে সন্ধ্যায় খাওয়া হয়ে যায়। দুয়েকটা বাড়িতে মিটমিট করে কুপির বাতি জ্বলে। গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ। বেশির ভাগ পথ অন্ধকার। আমাদের বাড়িতেও তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গেল। একদম খালি হাতে ঘর থেকে বেরোনোর আগে বাবার অগোচরে মাকে পা ছুঁয়ে

সালাম করলাম। মা কিছু বললেন না। মুখের কোণে শাড়ির আঁচলটা ধরলেন। কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি জানেন, আমি যখনই বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যাই, তখনই তার পা ছুঁয়ে সালাম করি। বাবা-মা দুজনকেই সালাম করি। আমার মনে হলো তিনি বুঝে গেলেন–কোথায় যাচ্ছি আমি। দুনিয়ার সব মা-ই বোধহয় সন্তানের অন্তরের কথাটি এভাবে জেনে যান। মাকে বললাম, বাবাকে সালাম করতে পারব না। এখন বাবা জিজ্ঞেস করলে বলবেন, ফুপুর বাড়িতে গেছি। রাতে ওখানেই থাকব। সকালে বলে দেবেন– মহিষখলা গেছি আমি। মা কিছু বললেন না। সারাজীবনই তাঁকে কিছু বলতে শুনিনি। কোনো শব্দও আমার কানে এলো না। মার দিকে তাকানোর সাহসও পেলাম না, ভয়–পিছে দুজনেই কেঁদে ফেলি। মা শব্দ করেননি, সম্ভবত এজন্য যে বাবা টের পেয়ে যেতে পারেন। তিনি যদি টের পান, তবে রেগে যেতে পারেন। আর রেগে গেলে আমার যাওয়া তো দূরের কথা, জান বাঁচানো মুশকিল হবে। মা জানেন বাবার রাগের ঠিকানা। একদম শেষ বাক্যটি বললেন–দেশ স্বাধীন কইরা বাড়ি ফিরিস।

খুব স্বাভাবিকভাবেই বাবার সামনে দিয়ে ক্যাজুয়ালি হাঁটতে হাঁটতে আম গাছতলা হয়ে বাংলাঘর পার হয়ে দ্রুত হাঁটা দিলাম। ডানদিকে মোড় নেওয়া দেখে বাবা বুঝে নিলেন আমি ফুপুর বাড়ি যাচ্ছি। কল্যাণপুর নদীঘাটে যাওয়ার পথেই ফুপুর বাড়ি–সেটিও দ্রুত পার হলাম। নৌকার ঘাটে পৌঁছে দেখি সবাই হাজির। পুরো গ্রামের মানুষই নৌকার চারপাশে। সবাই চুপচাপ। শব্দ করছে না কেউ। সঙ্গীদের মা-বাবা-অভিভাবকরা আমার কাছে এসে আস্তে করে বলে যাচ্ছে, বাবা ছেলেটাকে দেখে রেখো। উপরে আল্লাহ আর তোমার ভরসাতেই ছেলেটাকে তোমার হাতে দিয়ে দিলাম। কেউ কেউ বললেন, টাকাপয়সা নেই। দেখে রাখবে। সেই ২২ বছর বয়সেই নিজেকে অভিভাবক মনে হতে থাকল। কোন ভরসায় যে আমি সবার অভিভাবককেই সান্ত্বনা দিলাম, তা আমার জানা নেই। প্রায় আধাঘণ্টা দেরি হয়ে গেল নৌকা ছাড়তে। সবাইকে তুলে শেষে আমি গলুইয়ে পা রেখেছি, আমার সঙ্গে দেখি আরও একটি পা। আব্বাস আলী কাক্কু–আমাদের গোমস্তা। আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। হাতে একটা বেশ বড়ো পুঁটলি। জিজ্ঞেস করলাম, এতে কী কাক্কু? তিনি জানালেন, চিড়া-গুড়। বুঝলাম মা গোপনে কাক্কুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাক্কু লুঙ্গির গিঁট খুলে পাঁচটি ১০০ টাকার নোট তুলে দিলেন আমার হাতে। আমি অবাক হলাম। মা দিয়েছে টাকা? বাবা বাড়িতে থাকলে তো মার হাতে কোনো টাকা থাকে না। কাক্কুকে জিজ্ঞেস করলাম, কে দিল টাকা?

–পীর সাব।

আমার বাবা ওই অঞ্চলে পীর সাহেব নামেই পরিচিত ছিলেন। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। এর মানে, বাবা জেনে গেছে। চিৎকার করে বললাম, বাচ্চু তাড়াতাড়ি নাও ভাসা, আব্বা জেনে গেছে। কাক্কু বললেন, ঘাবড়াইও না। উনি জানলেও ফিরাতে আইব না।

বাবার মুখটা ভেসে উঠল। কঠোর প্রকৃতির মানুষটি, সেই শৈশব থেকে তাঁর হাতে মার খেয়ে বড়ো হয়েছি। যখন ইন্টারমিডিয়েটে ঢাকা কলেজে পড়ি, তখনও তাঁর হাতে মার খেয়েছি। সারাজীবন মনে করেছি ওই মানুষটির বুকে কোনো দয়ামায়া নেই। কোনো একসময়ে মনে হতো, লোকটা মারা গেলে জীবনটা অনেক সহজ হতো। জীবনে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলতে পারিনি। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর বাড়ির ভেতরেই হাঁটাহাঁটি করলে শুয়ে পড়তে বলতেন। মন ভালো থাকলে জিজ্ঞেস করতেন, বিবিসির খবরে কী বলল রে? কখনোই চোখের আড়াল হতে দিতেন না। কিন্তু সেই রাতে যখন তাঁর সামনে দিয়েই বাড়ির বাইরে চলে আসি, তখন আমাকে কোনো প্রশ্নই করেননি। তিনি জানতেন, তাঁর সঙ্গে আমি মিথ্যে বলতে পারব না। তাই জিজ্ঞেস করেননি কোথায় যাচ্ছি। তবে কি তিনি জানতেন?

হ্যাঁ। কাক্কু জানালেন, তিনি জানতেন। বিকালেই নৌকাওয়ালা বাবাকে জানিয়েছিল। নৌকাওয়ালা জানত, বাবাকে না জানিয়ে তাঁর ছেলেকে নিয়ে কোথাও গেলে অন্যায় হবে। পীর সাহেবের অনুমতি ছাড়া সে এত বড়ো বিপদে পা বাড়াতে পারে না। সেজন্যই পীর সাহেবের অনুমতি নিতে গিয়েছিল সে। পীর সাহেব নাকি অনুমতি দিয়েছিলেন, সেই কথা নৌকাওয়ালা কাউকে বলেননি। এরপর বাবা মায়ের কাছ থেকেও জেনেছিলেন। বাবা জিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে একশ গজ যাওয়ার পরই মা বাবাকে জানিয়েছিলেন। বাবা শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন আর কে কে যাচ্ছে? মা শুধু বাচ্চুর নাম জানতেন। বাবাকে তা-ই জানিয়েছিলেন। এরপরই বাবা পকেট থেকে পাঁচটি একশ টাকার নোট বের করে দেন। মা তখন বুঝতে পারেন, বিকেলে হঠাৎ করে ১০ টাকা মন দরে ৫০ মন ধান কেন বিক্রি করেছিলেন বাবা।

আব্বাস আলী কাক্কু পাড়ে থেকেই বাচ্চুকে ডেকে বলেছিলেন, তোর মামুর দিকে খেয়াল রাখিস, তোর নানা কইয়া দিছে। বাচ্চু খুব সাহসী ছেলে। সে কাক্কুকে বলল, ভাইসাব, কিছু ভাইব্যো না–আমার জান থাকতে মামুর কিছু হবে না। নানারে কইও দোয়া করতে। আমাদের নৌকা যখন ঘাট ছেড়ে যায়, তখন কাক্কুর গলা শোনা যাচ্ছিল, তোমার নানা তোমরার লাগি দোয়া করছে। সেই বাবাও নেই, মা-ও আজ আর বেঁচে নেই। আব্বাস আলী কাক্কুও নেই। কিন্তু এখনো মনে হয়, মা-বাবার সেই দোয়া, যদি সেটি থাকার মতো হয় তবে এখনো সঙ্গেই আছে।

আমার এমন অনেক ঘটনা মনে আছে, যখন অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে আমি অনুকূল অবস্থায় এসেছি, আমার মায়ের নিশ্চিত ধারণা ছিল, বাবার দোয়ার জন্যই আমি সহায়তা পেয়েছি। উনসত্তরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। তৎকালীন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলে থাকি। কলা ভবনে বিডিআর-এর সঙ্গে ঢিলাঢিলি করে টিয়ার গ্যাস খেয়ে হলে এসেছি চোখ ধোয়ার জন্য। কলা ভবনের দোতলার সব পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। চোখ-মুখ ধুয়ে লুঙ্গি পরেই হলের অভ্যর্থনা কক্ষের সামনে আসতেই ইপিআর হলে ঢুকে। যাকে সামনে পায় তাকেই আটকায়। আমাকেও আটকায়। কিছুক্ষণ পর ইপিআরের গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড় করায়। হঠাৎ একজন ইপিআর আমাকে লাইন থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। সেই সুবাদে আমি হাজতবাস থেকে বেঁচে যাই। আমার মায়ের বিশ্বাস ছিল এটি আমার বাবার দোয়াতেই হয়েছিল।

২৩ জুলাই ১৯৭১ রাতে কল্যাণপুর থেকে একটি হাওর পার হয়েই আদাউড়া নামক একটি ছোটো গ্রামে এসে আমরা জামাই আদর পেলাম। এই গ্রামের ধনাঢ্য সুধীর বাবু বাবার শিষ্য ছিলেন। তখনও শরণার্থী হয়ে মহিষখলা যাননি। পীর সাহেবের ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে, সঙ্গে দলবল। সেই রাতেই হাঁস জবাই করে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। খুব ভোরে সম্ভবত আমি ঘুম চোখেই নৌকায় উঠেছিলাম। তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়া হলো। দাঁড়ের নৌকা। দুইজন দাঁড় বাইছে। আমাদের নৌকার সবাই দাঁড় বাইতে জানে। আমিও পারি। তবে অভ্যাস নেই বলে হাতে ফোসকা পড়ে। সেই যে স্কুলে পড়ার সময় নৌকা বাইতাম, সেটি বেশ কয়েক বছর হয়ে গিয়েছিল।

দুপুর নাগাদ আমরা আলীপুরে পৌঁছলাম। ওই গ্রামটাকে লোকজন হাওইরা আলীপুর নামে চেনে। আলীপুর নামে হয়তো আরও একটি গ্রাম আছে। এজন্য হাওরের মাঝখানে থাকা এই গ্রামটির নাম হাওইরা হয়েছে। ওখানে সফর আলী তালুকদারের বাড়িতে আমাদের দুপুরের

খাওয়াদাওয়া হলো। তালুকদার আওয়ামী লীগের নেতা এবং সংগ্রাম কমিটির লোক। শরণার্থী হোক আর মুক্তিযোদ্ধা হোক, তাদেরকে সহায়তা করাই তার সব সময়ের কাজ। গোলার ধান সিদ্ধ করে চাল বানিয়ে দলে দলে লোকজনকে খাওয়াতেন তিনি। তিনি কেবল আমাদের খাওয়ালেন না–রাজাপুর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু রাজাপুরে এসেই আমরা বিপদে পড়লাম। মাঝির কানেই প্রথম শব্দটা এলো। ইঞ্জিনের শব্দ। সেই সময়ে হাওরে কোনো ইঞ্জিন চলত না। এর মানে হলো কোথাও লঞ্চ বা অন্য কিছু চলছে। একমাত্র কাছের নদী ধনু দিয়ে কার্গো জাহাজ চলে। মাঝেমধ্যে ওই নদী দিয়ে গানবোট যায়, যাতে পাঞ্জাবিরা থাকে। সফর আলী আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেজন্যই আমরা এক হিজল বনে নৌকা লুকিয়ে বসে থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আওয়াজ আরও স্পষ্ট হলো। আশঙ্কা হলো, এতে পাকিস্তানিরা থাকতে পারে। আমাদের সামনে দুটি পথ ছিল–প্রথমত, আমরা ওরা আসার আগেই ধনু পার হয়ে যাব। অথবা আমরা অপেক্ষা করব। ওরা চলে গেলে আমরা ধনু পার হব। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এই আওয়াজ আর কাছে আসার আগেই আমরা ধনু নদী পার হব। খুব কাছেই নদীটি। আমাদের সুবিধা হলো নদীটি পার হওয়ার পর আমরা নিরাপদ। কেননা গানবোট হোক আর লঞ্চ হোক–সেটি নদী ছাড়া চলতে পারবে না। কেবল ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে যেতে পারলেই হলো। নৌকায় যা ছিল সব নিয়ে আমিসহ নৌকা বাইতে লেগে গেলাম সবাই। প্রচণ্ড ভয় সবার মনে। কিন্তু সাহসও কম নয়। এর মাঝে বিপরীতমুখী ঢেউ। নৌকা বলতে গেলে সামনে যায়ই না। সবাই মিলে একে যতটা সামনে নিতে পারছি, ঢেউ তাকে আবার পেছনে নিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত নদী পার হলাম। আমরা যখন নদী অতিক্রম করে ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে, তখন দেখলাম সত্যি সত্যি একটি গানবোট এবং স্পিডবোট নদী দিয়ে উজানে যাচ্ছে।

এরপর চলাচলে তেমন আর ভয় নেই। হাওর তেমন গভীর নয়। ঢেউও তত বেশি নয়। কিন্তু পথ অনেক। প্রায় মধ্যরাতে আমরা মধ্যনগরের এমপি আব্দুল হেকিম তালুকদারের বাড়িতে পৌঁছলাম–তার সুনুই গ্রামে। সেই মধ্যরাতেই আমাদের ভাগ্যে জুটল খিচুড়ি। ধন্যবাদ তালুকদার সাহেবকে।

পরদিন মহিষখলা বাজারে প্রবেশ করাই সংকটময় হয়ে পড়ে। একেবারে গারো পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ি এই ছোটো বাজারটি ততদিনে সরব হয়ে উঠেছে। শত শত অস্থায়ী ঘরে হাজার হাজার শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের কোলে। হাওর থেকে সরাসরি নৌকা ভেড়ে না পাড়ে। বেশ দূরেই নৌকা রেখে পানি ভেঙে আমরা তীরে উঠি। চোখে পড়ে বেশকিছু নৌকার আনাগোনা। শরণার্থী ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধারা ততদিনে মহিষখলা আসতে ও যেতে শুরু করেছে। অস্ত্র কাঁধে বাংলার ছেলেরা যেমন করে দাপটের সঙ্গে আসা-যাওয়া করছে, তেমনই করে মলিন মুখের বাস্তুহারা শরণার্থীদেরও চোখে পড়ছে। প্রায় সব শরণার্থীই হিন্দু। অতি সামান্য সম্পদ সহায় করে তারা অজানার পথে পাড়ি দিয়েছে। আমাদের ইউনিয়নের কিছু চেনাজানা মানুষকে চোখে পড়ল।

অন্যদের সঙ্গে কথা হলো। কেউ আমার পরিচিত নয়। আমি ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার জায়গা চাইলাম। কিন্তু আমাদের এই পুরো দলটির থাকার কোনো দায়িত্ব কেউ নিতে রাজি হলো না। আমাদের হাতে টাকাকড়ি তেমন নেই। নিজেরা যে পকেটের টাকা খরচ করে থাকব, সেই পথও নেই

মহিষখলা বাজারটি গ্রামের একটি ছোটো বাজারের মতোই। তবে কোনো ঘরবাড়ি নেই। ছাপড়া ধরনের কিছু দোকান হয়তো কোনো একসময়ে জমে ওঠে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি পাহাড়ি ঝরনা। কোনো সীমানারেখা নেই।

আমরা মহিষখলা বাজার পেরিয়ে বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে পড়ি বিপদে। প্রথমত, পাহাড়ি পথে চলতে গিয়ে স্লিপ খেয়ে পা ভেঙে ফেলি আমার। দ্বিতীয়ত, সেখানে পাওয়া যায়নি আমার এমপি খালেক সাহেবকে। তিনি ভারতের বাগমারা থাকেন। সেখানে যেতে পাহাড়ি পথে ২০ মাইল হাঁটতে হবে বলে জানানো হলো। আমার হাঁটার অভ্যাস থাকলেও পাহাড়ি পথে ২০ মাইল হাঁটার কথা ভাবতেও পারছিলাম না। অন্যদের সঙ্গে কথা হলো। কেউ আমার পরিচিত নয়। আমি ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার জায়গা চাইলাম। কিন্তু আমাদের এই পুরো দলটির থাকার কোনো দায়িত্ব কেউ নিতে রাজি হলো না। আমাদের হাতে টাকাকড়ি তেমন নেই। নিজেরা যে পকেটের টাকা খরচ করে থাকব, সেই পথও নেই। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করে পরিস্থিতি দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার সঙ্গে ভুগোইল্যা থাকল। আরও থাকল বাচ্চু, নুরুল ইসলাম ও নীরু। অন্যরা যে নৌকায় গিয়েছিলাম সেই নৌকাতেই ফিরে এলো। কিছুদিনেই টের পেলাম যে পরের তিন মাসেও মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে না। ইয়ুথ ক্যাম্পে ঠাঁই নেই। বাচ্চু, নীরু আর নুরুল ইসলাম জানাল, ওরা ফিরবে না। যেভাবেই হোক টিকে থাকবে। বাচ্চু বলল, মামা, আমরা তো এখনই ট্রেনিং নিতে যেতে পারব না, আপনি আরেকটি দল নিয়ে আসেন। এবার আপনি বাড়ি ফিরে গেলে নানার সাহস হবে এবং আর হয়তো বাধা দেবে না। আমাদের কিছু টাকারও দরকার। নিজের খরচে এখানে থাকতে হলে আমরা সাতদিনের বেশি থাকতে পারব না। আমি বাচ্চুর কথায় যুক্তি খোঁজে পেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার নিজের কাছে থাকা টাকাগুলো বাচ্চুকে দিয়ে গ্রামে এসে আবার আরেকটি দল নিয়ে ফিরে যাব। ওদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য রেখে ফিরে এলাম গ্রামে। কিছুদিন মন্দ কাটল না। আমাদের এলাকাটি তখন মুক্তাঞ্চল। খালিয়াজুরীতে আমাদের নিজস্ব শাসন চলে। নৌকা চলে জয় বাংলার পতাকা উড়িয়ে। থানার বাইরে পুলিশও আসে না। বিচার-আচার সব আমরাই করি। আমার নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি থানার পূর্বাঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা ততদিনে সশস্ত্র হয়ে হাওরে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু আকাশ লাল হতে থাকল আষাঢ় মাসের শেষের দিকেই।

পাকিস্তান বাহিনীর সহায়তায় কিছুদিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে শতাধিক রাজাকারের একটি বাহিনী খালেক চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে শাল্লায় আসে এবং হিন্দু গ্রামগুলো পুড়তে থাকে। হাওরের শান্ত পানি হয়ে ওঠে গরম।

শাল্লা থানার সুলতানপুরের সরাফত চেয়ারম্যান এবং দিরাই থানার শ্যামারচরের খালেক চেয়ারম্যানের আজন্ম ক্ষোভ ছিল হিন্দুদের প্রতি। তারা যখনই নির্বাচন করত, হিন্দুরা তাদের ভোট না দিয়ে আওয়ামী লীগের বা ন্যাপের প্রার্থীকে ভোট দিত। চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচন

করতে গিয়ে তারা বারবার হেনস্তা হয়েছে এই হিন্দু ভোটারদের দ্বারা। হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি বলে তাদের জিতে আসাও কঠিন হয়ে পড়ত। ফলে তারা রাজাকার হয়েই হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। তারা এই কাজটি করে যাতে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমায়। এ দুই চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন রাজাকারদের অত্যাচার-অগ্নিসংযোগে শাল্লা থানার বিশেষত শাল্লার হিন্দু গ্রামগুলো থেকে শত শত শরণার্থী পাড়ি জমাতে থাকে টেকেরঘাট বা মহিষখলা। মুক্তারপুর, আঙ্গাওড়া, বাহারা এসব গ্রাম উজাড় হতে থাকে। হিন্দুদের ধান-চাল ও গোরু-বাছুর লুণ্ঠিত হয়। রাজাকাররা নির্বিচারে লুটতে থাকে একের পর এক গ্রাম। এর প্রভাব পড়ে আমাদের থানায়ও। একেবারে পাশের বাড়ি বলেই আগুন লাগার আগেই প্রাণের ভয়ে আমাদের থানার হিন্দুরা মহিষখলা যেতে থাকে শরণার্থী হয়ে। পেছনে পড়ে থাকে তাদের ধান-চাল, গোরু-ছাগল, ঘরবাড়িসহ সব সহায়সম্পদ। বাবার উদ্‌বেগ বাড়তে থাকে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, হিন্দু গ্রামগুলোর সম্পদ রক্ষা করার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়োগ করা হয় পাহারাদার। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আমাদের ইউনিয়নের সবকটি হিন্দু গ্রামে তিনি পাহারার ব্যবস্থা রাখেন এবং পুরো নয় মাস শূন্য ভিটেয় হিন্দুদের সব সম্পদ অটুট থাকে। আমি জানি না, বাংলাদেশের আর কোথাও এভাবে কেউ কারও সম্পদ রক্ষা করতে পেরেছেন কি না। একই সঙ্গে তিনি শাল্লা-দিরাইয়ের রাজাকারদের সতর্ক করে দেন যে, তারা যেন তাঁর ইউনিয়ন বা থানায় পা না রাখে। ঘটনাচক্রে রাজাকাররা তাঁর কথা রেখেছিল এবং আমাদের ইউনিয়ন বা থানায় তারা কোনো অপকর্ম করেনি। এই ঋণ শোধ করার জন্য বাবা একাত্তরের ডিসেম্বরে এদেরকে হত্যা না করার আবেদন জানাতে সুদূর ঘুঙ্গিয়ারগাঁও পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

বাড়িতে আমার বড়ো বোন জোবেদা খাতুন ও তার কম বয়সি সুন্দরী সতিন রেবা ছিল। ওরা ঢাকায় থাকত। যুদ্ধ তাদেরকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার দুলাভাই–যিনি আমার ফুপাতো ভাই বটে, যখন রেবাকে বিয়ে করেন, তখন বাবা তাকে মারতে গিয়েছিলেন। যে কোনো বাবাই তাঁর মেয়ের সংসারে সতিন আনলে তা-ই করবে এবং সেটিই স্বাভাবিক। তদুপরি বাবা বুবুকে ভীষণ স্নেহ করতেন। আমি জানি না কোন সাহসে আমার দুলাভাই বুবুকে আমাদের বাড়িতে পাঠানোর পাশাপাশি বুবুর সতিনকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো তার আর কোনো বিকল্প ছিল না। বাবা রেবাকে চিনতেন না। কিন্তু যেদিন রেবা আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে পা ছুঁয়ে সালাম করলেন, সেদিন সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বেঁচে থাকো মা। এরপর রেবা আমাদের আরও একটি বোনের মতোই ওই বাড়িতে থেকেছে। রেবা মেয়েটির ফুটফুটে চেহারার চেয়েও সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল–সে আমার মায়ের পাশে পাশে থাকত আর তাঁর সব কাজ নিজের হাতে করে দিত। বাবাও কিছু বলার আগেই সবকিছু হাতের কাছেই পেয়ে যেতেন। বোনের সতিন কার্যত আমার ছোটো ভাইবোনদের সঙ্গেও সখ্য গড়ে তোলে। সুতরাং বাবা রেবাকে নিয়ে আরও বেশি চিন্তিত ছিলেন। তার সৌন্দর্য এবং অল্প বয়সের জন্য বাবাকে এমনকি রাত জেগে থাকতেও দেখেছি আমি। আমার অন্য দুটি বোন খুব ছোটো ছিল। দুটি ভাই–তারাও খুব ছোটো ছিল।

একাত্তরে মহিষখলা ক্যাম্পে প্রথমবার যাওয়ার বিষয়ে ২০১৬ সালে আমার সহযাত্রী আবুল কাশেম সরকার একটি নিবন্ধ লিখেছে ময়মনসিংহের একটি পত্রিকায়। 'আমরা চৌদ্দজন' নামের এই লেখাটি এখানে তুলে ধরছি:

"উনিশ' একাত্তর সাল। আর একাত্তর বলতেই আমরা বুঝি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা ভয়াল সময়। অনাদিকাল থেকে বাঙালি নৃ-গোষ্ঠীর জীবনে সুখ-দুঃখের অনেক ছোট-বড় ইতিহাস আছে; কিন্তু একাত্তরের নিষ্ঠুর ইতিহাস সম্ভবত বাঙালি জীবনের সকল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে।

জুলাই মাসের শেষ দিক। কোনো এক শুক্রবারের শেষ বিকেল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা চৌদ্দজন প্রস্তুত। আমাদের দলপতি 'মোস্তাফা জব্বার'–যিনি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের হাল যুগের শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি কম্পিউটারে বাংলা ভাষা সংযোজনের জনক। আমাদের সকলের বাসস্থান ভাটি বাংলার অন্যতম নিম্নভূমি খালিয়াজুরী থানার কৃষ্ণপুর-কল্যাণপুর গ্রামে।

মোস্তাফা জব্বার সাহেব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঢাকায় একটা বড় ধরনের সংঘাত হবে–হয়তো কিছুটা আঁচ করতে পেরেই ২৫শে মার্চের বিভীষিকাময় বীভৎস রাতের পূর্বেই তিনি নিজ বাড়ি কৃষ্ণপুর গ্রামে চলে এসেছিলেন। গ্রামের লোকজন তার কাছে দেশের অবস্থা, দেশের কথা জানতে সারাক্ষণই ভিড় করত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে স্বাধীনতার পূর্বে খালিয়াজুরী থানায় কোনো হাইস্কুল ছিল না। পাঠক হয়তো সহজেই বুঝতে পারছেন–ঐ থানার মানুষের শিক্ষার হার কেমন ছিল। তখন সে জনপদে সাত গ্রামে খুঁজেও একজন কলেজপড়ুয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যেত না। আমাদের দলপতি ছিলেন তখনকার সমাজের একজন অসাধারণ শিক্ষিত লোক। বলাবাহুল্য যে তিনি বর্তমান বাংলাদেশেরও একজন অসাধারণ ব্যক্তি।

জুলাই মাসে ভাটি বাংলায় ভরা বর্ষা থাকে। চারদিকে কেবলই থৈ থৈ পানি আর পানি। ঝির ঝির দখিনা বাতাস। ঢেউয়ের অনুকূলে আমাদের মাঝারি প্রকৃতির গছতি নৌকাখানি (ভাটি এলাকার বাঁশের ছইয়া ঘেরা এক ধরনের বিলাসী নৌকা) সামনের দিকে এগিয়ে চললো। আমাদের দলপতির পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী আদাউড়া গ্রামের সুধীর মাস্টারের বাড়িতে আমরা রাত্রিযাপনের জন্য অবস্থান নিলাম। সজ্জন সুধীর বাবু আমরা দেশের জন্য লড়তে যাচ্ছি, মরতে যাচ্ছি সে কথা বুঝতে পেরে আমাদেরকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন। আমাদের রাতের খাবারে মাছ, মাংস, ডিম কিছুই বাদ যায়নি।

আমরা চৌদ্দজনের মধ্যে আমি ছিলাম বয়সে সবার চেয়ে ছোট। আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। মোস্তাফা জব্বারের প্রতি বরাবরই আমার শ্রদ্ধাবোধ ছিল অপরিসীম। তাই আমার প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন তিনি। আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাত্রার পূর্বে পঁচিশে মার্চের পরের দিনগুলিতে মোস্তাফা জব্বারের নেতৃত্বে কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে সর্বশ্রেণীর মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত করার জন্য প্রায় প্রতিদিনই আমরা মিছিল মিটিং করেছি। যার ফলে কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন তথা সমস্ত খালিয়াজুরী থানায় কোনো রাজাকার, আলবদরের জন্ম হয়নি। মোস্তাফা জব্বার ছাত্রজীবন থেকেই অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তার কথায় যাদু ছিল।

সুধীর বাবুর অকৃত্রিম আদর আপ্যায়নের মধ্যে কোনোমতে রাতটা কেটে যায় আমাদের। পরের দিন বেলা উঠার আগেই আমরা মহিষখলার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। বাতাসের বেগ অপেক্ষাকৃত স্বল্প থাকায় হাওরে ঢেউয়ের তাণ্ডব ছিল কম। তখনকার সময়ে ইঞ্জিনচালিত নৌকার কোনো প্রচলন ছিল না। পাল তোলা নৌকা ছিল প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য। বাতাস আমাদের অনুকূলে থাকায় নৌকার মাঝি পাল টাঙ্গিয়ে দিল। একটা চমৎকার অথচ শান্ত গতিতে আমাদের গছতি নৌকাখানি সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

মোস্তাফা জব্বারসহ আমরা কয়েকজন নৌকার ছইয়ের ওপর গিয়ে বসলাম। চারিদিকে ভরা বর্ষার সীমাহীন জলরাশি। অন্তহীন নৈসর্গিক শোভা। মোস্তাফা জব্বারের কাছে আমাদের আকুল জিজ্ঞাসা ছিল

আমাদের দেশে কেন এমন রক্তক্ষয়ী ও নিষ্ঠুর অবস্থা সৃষ্টি হল? আমরা তো সবাই মুসলমান। পাকিস্তানি সেনারা মুসলমান হয়েও আমাদেরকে এভাবে হত্যা করছে কেন?

মোস্তাফা সাহেব আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে লাগলেন– 'সর্বভারতীয় আন্দোলনের মুখে ভারত উপমহাদেশে আধিপত্যবাদী ইংরেজ শাসনের অবসান যখন নিশ্চিতপ্রায়–ঠিক তখনই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দ্বিজাতিতত্ত্বের একটি পরিকল্পিত ফর্মুলা ইংরেজ শাসনের শেষ বড় লাট মাউনব্যাটেন ও তার পরিষদের গোচরে চলে আসে।

সুচতুর ইংরেজরা চলে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে ভারতবর্ষে একটি বিষবৃক্ষ রোপণের চমৎকার সুযোগ হাতে পেয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীর অখণ্ড ভারত আন্দোলন নিমিষে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত জাতি ও ধর্মীয় বৈষম্যের কারণে ভারতবর্ষ ভেঙে ফেলে ইংরেজরা। জন্ম হয় হিন্দুদের জন্য ভারত আর মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। দ্বিজাতিতত্ত্বে রাষ্ট্র হয় দুটি; কিন্তু বঙ্গ ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

আবহমানকাল থেকে বঙ্গ ভঙ্গের বেদনা দুই বাংলার আকাশে বাতাসে আজও গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে। পূর্ব বঙ্গ চলে আসে পাকিস্তানে আর পশ্চিম বঙ্গ চলে যায় ভারতে; কিন্তু বাঙালির আত্মা, মনন ও সংস্কৃতি আজও অবিচ্ছেদ্য। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুধু ধর্ম একটি সুষমরাষ্ট্র গঠনের মৌল উপাদান নয়। ভূমির ভৌগোলিক অখণ্ডতা; ভাষাসহ আরও নানাবিধ উপাদান এতে বিদ্যমান।

যুগে যুগে সোনার বাংলা বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানুষ কর্তৃক শাসিত-শোষিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে। কালে কালে বাংলা লুণ্ঠনের ইতিহাসের শিক্ষা থেকে বাদ পড়েনি তদানীন্তন পাকিস্তানের বড়ো লাট কায়েদে আজম, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, ইস্কান্দার মির্জা, আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোরা।'

আমরা তন্ময় হয়ে মোস্তাফা জব্বার সাহেবের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ দেখা গেল অনেক দূর থেকে একটা সাদা স্পিডবোট আমাদের নৌকার দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা কিছুটা চমকিত ও আতঙ্কিত হলাম। কারণ আমাদের নৌকার উজান বাঁকে গাগলাজোড় নামক স্থানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল।

মোস্তাফা জব্বার সাহেবের বঙ্গ ভারত ও পাকিস্তান জন্মের ইতিহাস বলা সহসা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সকলে আমাদের দলনেতার নির্দেশমতো নৌকার ছইয়ের ভিতর চলে গেলাম। ক্রমেই স্পিডবোটটা অধিকতর দৃশ্যমান হতে শুরু করল। দূর থেকে যাতে নৌকার মধ্যে মানুষজন কম দেখা যায় সেজন্য আমি এবং আর একজন বাদে সবাই নৌকার পাটাতনের নিচে গাদাগাদি করে ঠাঁই করে নিল। প্রায় সকলেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর করুণার জন্য নানারকম সুরা কালাম পড়তে আরম্ভ করল। ভয়ার্ত আর্তনাদে আমাদের নৌকাটা থরথর করে কাঁপছিল।

যুবা পুরুষ ছিল পাকবাহিনীর অন্যতম আতঙ্ক। তাই যুবা পুরুষ নিধন এবং নির্যাতন ছিল ওদের প্রধান কাজ। আমাদের চৌদ্দজনের গ্রুপে মোস্তাফা জব্বার সাহেবের বয়স ছিল তখন আঠার-উনিশ আর বাদবাকি আমরা সবায় ছিলাম তার থেকে বয়সে কমবেশ ছোট। হানাদার বাহিনীর হাতে মরার জন্য আমাদের প্রত্যেকের বয়স ছিল অতিশয় বিপজ্জনক।

নৌকার পাটাতনের নিচে মোস্তাফা জব্বারসহ সকলেই সম্ভবতঃ যমদূতের আবছা আবছা চেহারা দেখে শুধুই আহাজারি করছিল। আর আমরা দুজন নৌকার আড়ালে আবডালে থেকে স্পিডবোটের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। হঠাৎ দেখা গেল স্পিডবোটটি আমাদের নৌকার খুব কাছাকাছি এসে এর গতিপথ পরিবর্তন করে অন্যদিকে চলে গেল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী–সহসাই যেন আমাদের সকলের ঘাম দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর থেমে গেল।

তারপর পাটাতনের নিচ থেকে উঠে অনেকেই মাথায় ঠান্ডা পানি ঢেলে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে। অতঃপর আমরা পালের সঙ্গে নিজেরা দাঁড় টেনে গাগলাজোড়ের বিশাল এবং বিপজ্জনক হাওরটা অতিক্রম করলাম।

আমাদের নৌকা মহিষখলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মেঘলা আকাশ। ঘন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যটা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। আমাদের দলপতিসহ কারোর হাতেই ঘড়ি ছিল না। তাই আমরা কেউ বলতে পারছিলাম না সঠিক কয়টা বাজে। অনুমানে বুঝতে পারছিলাম তখন আসরের নামাজের ওয়াক্ত।

স্থানীয় লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মহিষখলা আর বেশি দূরে নয়। ছোটকাল থেকেই আমার উত্তরের গারো পাহাড় দেখার শখ ছিল। আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে গারো পাহাড়টা কোথাও উঁচু কোথাও নিচুমত আকাশের চেয়েও নীলাভ দেখা যেত। মনে হতো আকাশটা যেন অনেকটা ঘন রং ধারণ করে পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে।

> মেম্বার সাহেবের হাঁকডাকে বাড়ির ভেতর থেকে দু-একজন কামলাগোছের লোক বেরিয়ে এলো। তিনি আমাদের যত্ন করার জন্য ওদেরকে তাগিদ দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। তারা সাধ্যমতো আমাদের যত্নের কোনো ত্রুটি করেনি

আমি নৌকার ছইয়ের উপর বসে আমার আবাল্য স্বপ্নের পাহাড়টা বাস্তবে অবলোকন করার জন্য উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। লোকজনের দিকনির্দেশনা অনুসারে পাহাড়টা হয়তো আরও পাঁচ-ছয় কিলো দূরে আছে।

অচেনা পথ। সূর্য অস্তমিত হয়েছে অনেকক্ষণ। আবছা অন্ধকারে আমাদের সামনে পথচলা কঠিন হয়ে পড়ল। আমরা রাত্রিযাপনের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করছিলাম। যুদ্ধের সময় নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। কারণ দেশের মানুষের একটা অংশ ছিল পাকিস্তানপন্থি। মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়া এবং বিনাশ সাধন করাই ছিল ওদের কাজ। এরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রাজাকার-আলবদর নামে পরিচিত। ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে অন্য এক নৌকায় অবস্থানরত সেখানকার এক ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। মেম্বার সাহেব আমরা না বললেও বুঝতে পারলেন–আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছি। তিনি অনেকটা অযাচিতভাবে তার নৌকা থেকে আমাদের নৌকায় উঠে এলেন এবং আমাদের সবাইকে ভালো করে দেখে উৎফুল্লচিত্তে বললেন, 'বাবাসকল দেশের আকাশে এখন দুর্যোগের ঘনঘটা–কেবল তোমরাই পার এ দুর্দিনে দেশমাতৃকাকে সাহায্য করতে। মনে রাখবা যৌবন যার যুদ্ধে যাবার অধিকার কেবল তাদেরই।'

আমরা তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় জানতে পারলাম নাম আনছার আলী। একটু সামনেই তাঁর বাড়ি। তিনি আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন, 'বাবারা এখন রাত হয়ে গেছে। অচেনা রাস্তা। সামনে এগোনু তোমাদের জন্য অনেকটা কষ্টকর হবে। এরচেয়ে বরং আমার বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে যাও। আমি খুশি হব। রাত পোহালে আমি তোমাদের বর্ডার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব।' আমরা অনন্যোপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত মেম্বার সাহেবের কথায় তার বাড়িতে রাত্রিযাপনে রাজি হলাম। আমাদের দলপতি মোস্তাফা জব্বারসহ আরও অনেকে মেম্বার সাহেব কোনো রাজাকার-আলবদর কিনা সে ব্যাপারে কিছুটা সন্দিগ্ন হয়ে পড়লেন। যদি তিনি সেরকম কিছু হয়ে থাকেন তবে তার পিছু নেওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

কিন্তু তখন আমাদের আর কিছু করার ছিল না। অনেকটা বাধ্য হয়ে তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে হল। আমাদের নৌকা অগত্যা মেম্বার সাহেবের বাড়ির সামনে থেমে গেল। তখন অনেকটা অন্ধকার নেমে এসেছে। আমরা কম্পিত পায়ে, দুরু-দুরু বক্ষে মেম্বার সাহেবকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

খালের সন্নিকটেই মেম্বার সাহেবের চমৎকার টিনশেড বাড়ি। আমাদেরকে সামনে দহলিজে বসানো হলো। টেবিল, চেয়ার, খাট পরিবেশিত দহলিজখানা বেশ সুন্দর ছিল। ঘরের ভেতরে গ্রামীণ আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। সুরুচিবোধের পরিচায়ক।

মেম্বার সাহেবের হাঁকডাকে বাড়ির ভেতর থেকে দু-একজন কামলাগোছের লোক বেরিয়ে এলো। তিনি আমাদের যত্ন করার জন্য ওদেরকে তাগিদ দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। তারা সাধ্যমতো আমাদের যত্নের কোনো ত্রুটি করেনি। বাড়ির ভেতর মোরগের গলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা দুশ্চিন্তার মাঝেও ভালো লাগছিল।

আমরা সারাদিন জার্নিতে খুবই ক্লান্ত ছিলাম। তাই শুয়ে-বসে আমাদের সময় কাটতেছিল। মেম্বার সাহেব এতগুলো মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করে আবার আমাদের কাছে এলেন। আমাদের দলনেতা মোস্তাফা জব্বারের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ এবং আরও অনেক বিষয়ে আলাপ করে তিনি খুবই খুশি হলেন। মোস্তাফা জব্বার সাহেব বাল্যকাল থেকেই কথার জাদুকর ছিলেন। যে কাউকে তিনি অল্প সময়ে কথায় মুগ্ধ করতে পারেন। এটি ছিল তার স্বভাবজাত এক অসামান্য গুণ।

আমরা গল্প করতে করতে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। অল্প সময়ে হলেও খাবারের ম্যানুতে মাছ, মাংস ডাল, দুধ সবই ছিল। আমরা সকলে বেশ ক্ষুধার্ত ছিলাম। বাড়ি থেকে যাত্রার দু'দিনের মাথায় এই প্রথম তৃপ্তিসহকারে খেলাম এবং পথে পরিচিত সহৃদয় মেম্বার সাহেবকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম।

রাত অনেক হওয়ায় ঘুমানোর জন্য চৌকি ও খাটের বিছানায় গাদাগাদি করে শুয়ে পড়লাম। আমাদের সকলের মনেই কিছুটা সন্দেহ থাকলেও আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমাদের দলপতি মোস্তাফা জব্বার সাহেব ভালো করে ঘুমাতে পারেননি। কারণ তার মনে সংগত কারণেই সন্দেহ ও ভয়ভীতিটান একটু বেশি ছিল। শত হলেও তিনি আমাদের দলনেতা।

কিন্তু আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমরা যা ভেবেছিলাম তার কিছুই হয়নি। আনছার আলী মেম্বার সাহেব প্রকৃতপক্ষে মনেপ্রাণে একজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় প্রচণ্ড বিশ্বাসী তিনি, যার জন্য স্বাধীনতার সৈনিকদের মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহর সৃষ্টিকেও তারা ভালোবাসে।

পরের দিন কিছুটা বিলম্বে আমাদের ঘুম ভাঙে। ঘুম থেকে উঠেই দেখি সকালের নাশতা রেডি। আলু ভর্তা, করলা ভাজি আর ডাল। বাংলাদেশি খাবার সংস্কৃতির আদিরূপ। আমাদের দলনেতাসহ সকলেই আমরা তখন শঙ্কামুক্ত ছিলাম। মেম্বার সাহেবের প্রতি আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস শতগুণে বেড়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি প্রগার ভালোবাসা ও আমাদের প্রতি তার উষ্ণ আতিথেয়তা জীবনে কখনো ভুলার নয়।

সকালের নাশতা সেরে মোস্তাফা সাহেবকে নিয়ে আবার আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। সকালের আকাশ ছিল পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। এত কাছাকাছি আসার পরও তখনও গারো পাহাড়টা নীলাভ দেখাচ্ছিল পাহাড় নাকি আকাশ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

আমাদের নৌকা আরো কিছু পথ এগিয়ে গেল। আমি বরাবরের মতো নৌকার ছইয়ের উপর বসে সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছি। আমার আগ্রহের শেষ ছিল না। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে দেখলাম নীলাভ অবস্থার ভিতরে সীমাহীন সবুজের সমারোহ। কিছুসময় পূর্বেও যা আমার চোখে আকাশ ছিল–চোখের পলকেই তা হয়ে গেল সবুজ পাথরের পাহাড়। আমার সারা জীবনের বিস্ময় এক মুহূর্তে কেটে গেল। অবাক চোখে আমি সামনের দিকে চেয়ে রইলাম শুধু।

মহিষখলার সন্নিকটে পাহাড়ের পাদদেশে পাকিস্তানের বাজার নামে একটা বাজার ছিল। একটা খালের মতো ছোট নদী দিয়ে আমাদের নৌকাখানি পাকিস্তানের বাজারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে নদীতে দেখলাম অসংখ্য মৃতদেহ। মাঝে মাঝে আমাদের নৌকা লাশের সঙ্গে আটকিয়ে যাচ্ছিল। লগি দিয়ে লাশ অপসারিত করে তারপর যেতে হয়েছে। উৎকট দুর্গন্ধের সীমা ছিল না। তবু আমরা অদম্য উৎসাহে এগিয়ে গেলাম।

প্রায় দুপুর নাগাদ আমরা পাকিস্তানের বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম নদীর পাড়ে পাহাড়ের পাদদেশে হাজার হাজার শরণার্থীশিবির। নদীর পাড়ে নারী-পুরুষ একত্রে খোলা আকাশের নিচে প্রস্রাব-পায়খানা করে। লজ্জা-শরমের কোনো বালাই নেই–যেন আদিম কালের আদিম মানুষ। চূড়ান্ত মানবেতর জীবন। অবাক হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

চোখে-মুখে হাজারো প্রশ্ন এবং বিস্ময় নিয়ে পাকিস্তানের বাজারটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। ছোট বাজারে। সেখানে অধিকাংশ দোকানপাট উপজাতিদের। বেশির ভাগ দোকানে গারো মেয়েরা কেনাবেচা করে।

রাতের খাবারের জন্য আমাদের কিছু কেনাকাটার মাছ কিনতে মাছের বাজারে গেলাম। বাজারে প্রচুর নানিদ মাছ দেখতে পেলাম। নানিদ মাছ রুই, কাতলাজাতীয় মাছ। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের নদ নদীতে প্রচুর নানিদ মাছ পাওয়া যেত। স্বাদের দিক থেকে মাছটি ছিল অসাধারণ; কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এ প্রজাতির মাছ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আমরা কয়েকটি নানিদ মাছ কিনলাম। দামে অনেক সস্তা ছিল। নৌকার মাঝি রাতের খাবারের জন্য ভাত মাছ পাক করল। আমাদের দলনেতা মোস্তাফা জব্বার সাহেব পাকিস্তানের বাজারে আমাদের নৌকা নোঙরের পর থেকেই বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে শুরু করলেন, তিনি শুধুমাত্র এ কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। পরে তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং সেন্টার বাঘমারা এবং তোরা। মহিষখলা থেকে রিক্রুটিং সেন্টার প্রায় বিশ কিলোমিটার। হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হাঁটতে আমরা ভীত নই। কারণ ভাটি এলাকার মানুষের হাঁটা হলো জন্মগত অধিকার।

আমরা সকলেই বাঘমারা যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। পূর্বপরিকল্পনা ছিল রাতের খাবারের পর বাঘমারার উদ্দেশে যাত্রা করব; কিন্তু আমাদের দলনেতা সর্বশেষ আমাদেরকে জানালেন,

বাঘমারায় মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং সাময়িকভাবে বন্ধ। কখন খুলবে তা সঠিক বলা যাচ্ছে না। এহেন ভয়াল সময়ে অনিশ্চিত পথে যাত্রা করা ভালো হবে না বলে তিনি মতপ্রকাশ করলেন। তিনি যুক্তি দিলেন এতগুলো মানুষের থাকা খাওয়া ঘুমানো ইত্যাদি তদুপরি অচেনা রাস্তা; আবার অনিশ্চিত রিক্রুটিং অবস্থায় আমাদের বাঘমারা যাওয়া ঠিক হবে কিনা তিনি আমাদের মতামত চাইলেন। তার কথায় সহসা যেন আমাদের মনের ভেতরে একটা ছন্দপতন ঘটে গেল। আমরা অনেকটা নির্বাক হয়ে গেলাম।

কিছু সময় নীরবতার পর আমরা সকলে মোস্তাফা সাহেবকে বললাম আপনি আমাদের দলনেতা আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব। তিনি বললেন যেহেতু আমাদের গ্রামের নৌকাটি এখনো ফিরে যায়নি–আমরা ইচ্ছে করলে সে নৌকায় বাড়ি ফিরে যেতে পারি। সবকিছু ঠিকঠাক হলে প্রয়োজনে আবার আসব আমরা। পথিমধ্যে সুধীর বাবুর শুভকামনা, আনছার আলী মেম্বার সাহেবের বুকভরা আশা সবকিছু পিছনে ফেলে আমরা মোস্তাফা জব্বার সাহেবকে বিনীতভাবে বললাম 'তথাস্তু'।

অতঃপর বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো। আমাদের চৌদ্দজনের মধ্যে কেবল লিয়াকত আলী বাচ্চু ও নিরঞ্জন চৌধুরী আমাদের সঙ্গে ফিরে আসতে রাজি হলো না। অগত্যা এদের দুজনকে মহিষখলা রেখে প্রায় দু'দিন পর আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

নানাবিধ কারণে পরে আর আমাদের মহিষখলা যাওয়া হয়নি। আমরা মোস্তাফা জব্বার সাহেবের নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক সভাসমিতি করে সময় পার করতে লাগলাম। এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, হিন্দুদের ফেলে যাওয়া বাড়ি-ঘর, গোরু-বাছুর সংরক্ষণের জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজগুলো আমরা যথাযথভাবে পালন করেছি।

উল্লেখ্য, আমাদের পার্শ্ববর্তী শাল্লা থানায় ছিল পাকবাহিনী ও রাজাকার- আলবদরের শক্তিশালী ঘাঁটি। আমাদের ইউনিয়ন থেকে মাত্র চার-পাঁচ মাইল দূরে। প্রায়ই রাতের বেলা তারা পাঁচ-সাতটি হিন্দু গ্রামে একসঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিত। আগুনের লেলিহান শিখায় আমাদের জনপদগুলো দিনের মতো ফরসা হয়ে যেত। প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটতো আমাদের।

এভাবে আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাস কেটে গেল। নভেম্বরের শেষদিকে আমরা বুঝতে পারছিলাম দেশের স্বাধীনতা আর বেশি দূরে নয়।

অতঃপর এক নদী রক্ত ঝরিয়ে উনিশ শ' একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর সত্যি সত্যিই আমাদের স্বাধীনতা এলো।"

আবুল কাশেম সরকারের এই লেখার সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যগত বিভ্রান্তি থেকে থাকতে পারে। তিনি তাঁর লেখায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতির কথাও বলেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, 'পরিশেষে আমি বলতে চাই–আমরা যে ক'জন মোস্তাফা জব্বার সাহেবের সঙ্গে সারাক্ষণ সহযোদ্ধা ছিলাম–তার নির্দেশমতো সবকিছু করেছি। সদাশয় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমাদের আকুল আবেদন–'তবে কেন আমরা কজন মুক্তিযোদ্ধা সনদ পাব না।' সনদ তো আমিও পাইনি। সনদের জন্য আবেদনও করিনি। করার ইচ্ছাও নেই। মুক্তিযুদ্ধটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো পাওয়া।

বড়ো বোন জোবেদা এবং রেবাকে নিয়ে ভয়–পাকিস্তানি ও রাজাকাররা এই বয়সের মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। গ্রামে কোনো বদমাইশ লোক নেই। কিন্তু বুবু ও রেবা দুজনেই এত বেশি সুন্দরী ছিলেন যে, বাবা পারলে তাদের দুজনকেই সারাদিন বোরকা পরিয়ে রাখতেন। যদিও আশপাশে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, তবুও শাল্লার রাজাকারদের নিয়ে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। বাবা তাদের দুজনকেই ভালো করে জানতেন। কিন্তু বাবা এসব কোনোটাকেই বেঁচে থাকার উপায় মনে করতেন না। বিশেষ করে ওরা যখন হিন্দুদের গ্রামগুলো সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দিচ্ছে, তখন বাবা সারাদিন কেবল উঠানে পায়চারি করতেন। সার্বিকভাবে আমাকে নিয়ে বাবার দারুণ আতঙ্ক ছিল। কিন্তু তবুও যুদ্ধে যাবে ছেলে, সেটি তিনি ভাবতেই পারেন না।

কিন্তু আমি কোনোমতেই বাড়িতে থাকতে রাজি নই। আমার ধারণা, ততদিনে খালেক সাহেবকে ফিরে পাব আমি। সেই ভরসায়ই কয়েকদিন বাড়িতে থেকে একাই একটা গস্তিনৌকা নিয়ে মহিষখলার পথে পাড়ি দিলাম। আবার বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। এবার বাবা আর কিছু বললেন না। তাঁর চোখের সামনে দিয়েই পাড়ি দিলাম মহিষখলা। সেই একই পথ।

মহিষখলা পৌঁছে খালেক সাহেবকে পেলাম বটে–কিন্তু বাচ্চু-নুরল ইসলাম আর নীরুকে পাওয়া গেল না। আমি মহিষখলা থেকে চলে আসার পর খালেক সাহেব মহিষখলা আসেন। বাচ্চুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বললে খালেক সাহেব কেবল তাদেরকে ইয়ুথ ক্যাম্পেই জায়গা করে দেননি, তাঁরা যাতে খুব দ্রুত প্রশিক্ষণ নিতে পারে, এর ব্যবস্থাও করেন। ততদিনে বাচ্চুদের ওই দলটি প্রশিক্ষণ শেষ করে কর্নেল তাহেরের অধীনে যুদ্ধ করতে বাংলাদেশের ভেতরে চলে এসেছিল।

মহিষখলা পৌঁছেই আমি আমাদের তৎকালীন এমপি খালেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। একটি লম্বা আলোচনা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি জানালেন, আমাদেরকে যুদ্ধের প্রকৃতি বদলাতে হবে। আমরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করব। আমরা রাজনৈতিক যুদ্ধ করব

মহিষখলা পৌঁছেই আমি আমাদের তৎকালীন এমপি খালেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। একটি লম্বা আলোচনা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি জানালেন, আমাদেরকে যুদ্ধের প্রকৃতি বদলাতে হবে। আমরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করব। আমরা রাজনৈতিক যুদ্ধ করব। আমাদের প্রচুর ছেলে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছে; কিন্তু এদের প্রায় কেউ জানে না যে, কেন আমরা যুদ্ধ করছি। পাকিস্তান কেন গুড়িয়ে যাচ্ছে বা কেন বাংলাদেশের জন্ম হচ্ছে–এর রাজনৈতিক লড়াইটা কী, সেটি আমাদের জানা দরকার। তিনি আমাকে জানালেন যে, আমার থানার বোয়ালি গ্রামের আব্দুল মান্নান তালুকদার বিএলএফ-এর প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তাঁকে মুজিববাহিনীর থানা কমান্ডার করা হয়েছে। আমাকে এই থানার মুজিববাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে কাজ করতে হবে। আমি প্রশিক্ষণের কথা বললাম। তিনি জানালেন, মুজিববাহিনীর নেতারা রব ভাই-রাজ্জাক ভাই বা দাদা আমার সম্পর্কে জানেন এবং পাহাড়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য শেখার প্রশিক্ষণ নেওয়ার কোনো

প্রয়োজন নেই। তাঁরা তাঁকে জানিয়েছেন যে, আমার এখন প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করার সময় হাতে নেই। কার্যত মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আমি সিরাজ ভাইয়ের যে নির্দেশটি জানতাম তা হলো: একটি প্রলম্বিত রাজনৈতিক যুদ্ধ আমাদের করতে হবে। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই এ কথা বলেছিলেন যে, কেবল একটি মানচিত্র নয়, এই মানচিত্রে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই। কারা মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-মিত্র, সেটির ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ-সংগঠনগুলোর অনেক নেতাই বিশেষ করে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চান না। আমরা যেন তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকি। খন্দকার মোশতাক অনেক আগে থেকেই পুঁজিবাদের-আমেরিকার দালাল হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাজউদ্দীন সমাজতন্ত্রের পক্ষের লোক, সেটি আমরা জানতাম। আমি অবাক হয়েছিলাম এটি জেনে যে খালেকও মুজিববাহিনীর লোক।

খালিয়াজুরী মুক্তাঞ্চল বলে এখানে মুজিববাহিনী একটি নতুন মডেলের যুদ্ধ করবে। যেসব রাজনৈতিক বক্তব্য মান্নানকে শেখানো হয়েছে, খালেক সাহেব বললেন, সেগুলো আপনি আমাদেরকে শেখাতে পারেন। পঁচিশে মার্চের আগে যে বক্তব্য নিয়ে আপনারা একে সংগঠিত করেছেন, সেই আদর্শেই লড়াইটা করতে হবে। একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ আমাদের লক্ষ্য–সেই কথাটি বলতে খালেক সাহেব একটুও পিছপা হলেন না। আওয়ামী লীগের কোনো এমপি সমাজতন্ত্র চায় এবং সেই এমপি আমার এলাকার এমপি, সেটি আমার বেশ ভালোই লেগেছিল। আমাকে স্পষ্টতই বলা হলো, আমরা একটি রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেজন্য মুজিববাহিনী গড়ে তুলতে হবে। ভারতে নতুন করে আর প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো অবস্থা নেই। দেশের ভেতরে তরুণদেরকে আগে রাজনৈতিকভাবে মটিভেট করতে হবে এবং তাদেরকে দেশের ভেতরেই প্রশিক্ষণ দিতে হবে। হাতে একটি গ্রেনেড দিয়ে খালেক সাহেব ডিসেম্বরের ছয় তারিখে আমাকে আর মান্নানকে ছোটো একটি ডিঙিতে খালিয়াজুরী পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে এটিও জানানো হলো যে, খালিয়াজুরীর লিপসায় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি শিবির আছে, সেখানেই আমার প্রথম অবস্থান হবে। শুরুটা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মটিভেট করা দিয়েই হবে। মহিষখলা থেকে যাত্রা শুরু করেই আমি চমকে ওঠলাম। মাথার উপরে ভারতীয় জঙ্গিবিমান। কার্যত সেদিন ভারত সরাসরি বাংলাদেশের যুদ্ধে সশস্ত্রভাবে জড়িয়ে পড়ে। আমি আর মান্নান নিশ্চিত হই যে, আমাদের পরিকল্পিত যুদ্ধ বোধহয় শেষরেখায় পৌঁছেছে। লিপসার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর সবার মাঝেই দেখা গেল এক অনাবিল আনন্দ। মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই আনন্দিত। কারণটাও সবারই জানা। ভারত আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অর্থ পাকিস্তানকে খুব শীঘ্রই হারতে হবে। যুদ্ধ শেষ হবে, বাড়ি যাব এবং আবার সেই স্বাভাবিক জীবন সবারই হবে–এর চেয়ে খুশির খবর আর কী হতে পারে।

লিপসা বাজারের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের জীবন তেমন বিচিত্র কিছু ছিল না। ওখানে প্রবেশ করার ১০ দিনের মাঝে দেশ স্বাধীন হলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আমরা নিশ্চিত ছিলাম না যে আমরা এরপর কী করব। তখনও ডাকব্যবস্থা চালু হয়নি। এমন একসময়ে আমার গ্রামের বাড়ি থেকে ডাক এলো। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমার বাবা আমাকে বাড়ি আসার খবর পাঠান। তাঁর খবরের মূল মর্ম ছিল শাল্লার রাজাকাররা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। খবর শুনে আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু বাবার পাঠানো খবরের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি গ্রামে চলে আসি।

এসে শুনি শাল্লার রাজাকারদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে বাবার কাছে অনুরোধ করেছিলেন বাবার মামাতো ভাই আলী আকবর সাহেব। তিনি আবার আমার বন্ধু এবং মুক্তিযোদ্ধা কাশেমের দাদা ছিলেন। ওই রাজাকাররা ছিল তার কাছের আত্মীয়। তিনি জানালেন, যুদ্ধের সময় তারা সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে এবং পাকিস্তান টিকে থাকবেই–এই ভেবে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শায়েস্তা করার নামে 'দেশপ্রেমে' উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজাকার হয়।

আমি জানলাম, যুদ্ধের শেষ সময়ের আগে এমনকি নভেম্বরেও তাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল। তারা এতই পরাক্রমশালী ছিল যে ডিসেম্বর আসার আগেই তারা শাল্লা থানার সব হিন্দু গ্রাম পুড়িয়ে ফেলে। গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচার, লুটপাট এসব তো ছিলই। ফলে এই রাজাকাররা শাল্লার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার সাহস পাচ্ছিল না। তাদের ধারণা ছিল যে, শাল্লা থানার মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে পেলেই কচুকাটা করবে। তারা নিজেরা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সচেতন ছিল। সেজন্য ১৬ ডিসেম্বরের পর তারা কোনোমতে লুকিয়ে ছিল। এরই মাঝে নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে টের পেয়েছে যে আর বেশিদিন টিকে থাকা যাবে না।

তারা বাবার সহানুভূতি পাওয়ার আশা করেছিল এজন্য যে, আমার থানা খালিয়াজুরীতে তারা কোনো আক্রমণ করেনি। কোনো বাড়িঘর জ্বালায়নি বা কোনো লুটপাটও করেনি। এজন্য তারা ধারণা করেছিল যে, খালিয়াজুরীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে আইনের হাতে দেবে; কিন্তু জানে মেরে ফেলবে না। এই রাজাকার বাহিনীর দুই নেতার একজন ছিলেন শাল্লা থানার সুলতানপুরের শরাফত আলী চেয়ারম্যান এবং অন্যজন ছিলেন শ্যামারচরের আব্দুল খালেক। সরাফত চেয়ারম্যানের ছোটো ভাই আহাদ আমার স্কুলের সহপাঠী ছিল। খালেকের ভাতিজার সঙ্গে আমার ভাগনির বিয়ে হয়েছিল। একাত্তরের পর ভাগনিটা লজ্জায়-ঘৃণায় আত্মহত্যা করে। একাত্তরে তাদের সঙ্গে আমার কোনো কনফ্রন্টেশন হয়নি। ফলে তারা ভেবেছিল যে, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করলে জানে বেঁচে যাবে। তারা যে শাল্লা থানার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জীবন বাঁচাতে পারবে না, সেটি জেনেই আমাকে তারা আত্মসমর্পণের জন্য বাছাই করে। বিষয়টি নিয়ে আমি লিপসা ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আমার কাছে অনুরোধ ছিল সরাফত-খালেকরা আত্মসমর্পণ করার পর আমি যেন তাদেরকে লিপসা নিয়ে আসি এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ বেশ খুশি হয়েছিল এতগুলো রাজাকারের আত্মসমর্পণের খবরে। কেউ কেউ ভেবেছিল, এটি আবার একটা উটকো ঝামেলা। এতগুলো ঘাতককে ক্যাম্পে রেখে খাওয়ানো-পরানোর ঝামেলা পোহানোর কী দরকার। একটি পক্ষ ছিল সহজ সমাধানের দিকে। তারা প্রস্তাব করল–লিপসায় আনা যেতে পারে। তবে সেটি হতে পারে আমাদের অসমাপ্ত যুদ্ধটা সমাপ্ত করার জন্য। আমরা সবাই এদের একেকজনকে লক্ষ্য করে একটা করে গুলি করে পরীক্ষা করে দেখব হাতের নিশানা ঠিক আছে নাকি। এমতাবস্থায় আমি একাই বাড়ি আসার সিদ্ধান্ত নিই।

লিপসা থাকতেই আমার হাতে বাবার পাঠানো একটি টেলিগ্রাম পৌঁছেছিল। তাতে আফতাব লিখেছিল, কাম শার্প। একটি খামে ভরা চিঠিও ছিল। চিঠিটা সহপাঠী রোকসানা সুলতানার। জানতে চাইছে কেমন আছি–কবে ফিরব ঢাকায়। দেশ তো তখন স্বাধীন হয়ে গেছে। আমিও নিজে ভেবেছিলাম, যুদ্ধের সমাপ্তিতে লিপসাবাজারে বসে থেকে কী লাভ? তার চেয়ে আফতাব যখন ঢাকা যেতে বলেছে, তখন ঢাকায়ই যাই। ওখানে গিয়ে ছেঁড়া সুতোটা জোড়া দেওয়া হবে। মুক্তিযুদ্ধের যে নয় মাস আমি সিরাজুল আলম খান এবং তার শিষ্যদের কাছ থেকে

বিচ্ছিন্ন ছিলাম, সেটির সমাপ্তি হবে। নয় মাসে কী কী পরিবর্তন হয়েছে, সেটি জানার জন্য আমার আগ্রহ ছিল ব্যাপক। ফলে দ্রুত আমি বাড়ি চলে আসি।

বাড়ির পরিবেশটা তখন অনেকটাই বদলে গেছে। আমাদের ইউনিয়নের হিন্দু গ্রামগুলোর শরণার্থীরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। আমাদের আতঙ্কের গ্রামটা তখন উৎসবের গ্রামে পরিণত হয়েছে। মাত্র কদিন আগে পাশের থানার যে রাজাকাররা এই গ্রামটিকে বাঁচাবে কি না, সেটি ভাবত এই গ্রামের মানুষ, ছেলেমেয়েরা বেঁচে থাকবে কি না, সেটি যাদের ওপর নির্ভর করত, সেই রাজাকাররা জীবনের জন্য ছুটছে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর রাজাকাররা নানা স্থানে লুকিয়ে থেকে আত্মসমর্পণের পথ খুঁজছিল। তবে এতগুলো লোকের জন্য লুকিয়ে থাকা ভীষণ কঠিন কাজ ছিল। ওরা বারবার আমাদের গ্রামে প্রস্তাব দিচ্ছিল আত্মসমর্পণ করার জন্য। তারই আয়োজন হলো ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র তিনটি বাড়ি পরে কাশেমদের বাড়ি। সেই বাড়িতেই আত্মসমর্পণ হবে। শাল্লার ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধা কাশেম তাদের বাড়িতে এসেছিল। সেটি আসলে রাজাকারদের জন্য একটি সান্ত্বনা ছিল। কাশেম তখন শাল্লার একটি ছোটো গ্রুপের একজন কমান্ডার। সালেহ চৌধুরী পুরো শাল্লার কমান্ডার। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি দৈনিক বাংলায় কাজ করতেন। কাশেমদের কয়েকটি দলের নিয়ন্ত্রণ ছিল সুকুমার নামক শাল্লার গোবিন্দপুরের একজন মুক্তিযোদ্ধার হাতে। সুকুমার স্বাধীনতার পর ভারত চলে যায়। এই দলের জগৎজ্যোতি নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হন। অসাধারণ সাহসী জগৎজ্যোতি আমার মতোই আজমিরীগঞ্জের বিরাট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমাদের এক বছরের সিনিয়র ছিলেন তিনি। জলসুখা গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। সুকুমার জগৎজ্যোতির পর দলটির দায়িত্ব নেন।

রাজাকারদের পুরো দলটি একের পর এক অস্ত্র জমা দিল। ২৭ ডিসেম্বর সকালে তারা অস্ত্র জমা দেয়। কাশেমদের বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমি লাইন ধরা রাজাকারদের অস্ত্র নিচ্ছিলাম। আমার পাশেই ছিল কাশেম। রাজাকারদের বেশির ভাগ আমার চেনা। নানা কারণে আমাদের গ্রামে তাদের যাতায়াত ছিল। ওদের মুখে তখন হতাশার ছাপ। কারও মুখে হাসি নেই। সম্ভবত অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। আমি সবার অস্ত্র গ্রহণ করার পর জানালাম যে, এখনই তাদেরকে লিপসা নেওয়া হবে না। বরং দু-একদিন ওরা আমাদের গ্রামেরই নানাবাড়িতে থাকুক। আমি কাশেমকে উৎসাহিত করলাম যেন সে ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যায়। কাশেম রাজি হলো। ওরাও হয়তো কাশেমকে আমার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর রাতে তারা আমাদের গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে রাত কাটায়। ৩০ ডিসেম্বর তারা শাল্লা (ঘুঙ্গিয়ারগাঁও) যায়। ওই রাতেই মুক্তিযোদ্ধারা কাশেমকে না জানিয়ে খালেক চেয়ারম্যান ও সরাফত চেয়ারম্যানের লোকজনকে ভেরাডহর এলাকায় কুশিয়ারা নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। বয়সে ছোটো অনেককে সেখানে নেওয়া হয়নি। ১৬১ জনের মধ্যে ১০৮ জনকে পরে আর পাওয়া যায়নি। তারা হয় নিখোঁজ, না হয় নিহত। বাকিরা সেই ভয়ংকর সময়কে স্মরণ করে জীবনসংগ্রামে নেমে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে পলাতকদের কেউ কেউ যুদ্ধাপরাধের বিচারের অধীনে অভিযুক্ত হয়ে গ্রেফতারও হয়েছে।

লেখক: তথ্যপ্রযুক্তবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর সম্পাদক, বিজয় কিবোর্ড ও সফটওয়্যারের জনক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী

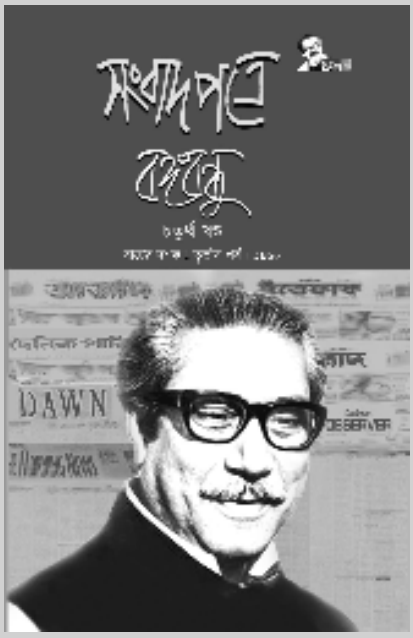

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

উপেন তরফদার বলতেন তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক

আবেদ খান

উপেন তরফদার সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। এই উপেন তরফদার ছিলেন আমার দুঃসময়ে কম্পাস। উপেন তরফদার যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমাদের দুজনের মধ্যকার বন্ধুত্বের সম্পর্কের একটুও ছেদ পড়েনি। উপেনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে আমার কখন, কীভাবে প্রথম দেখা হয়েছিল।

একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যালয় পাকিস্তানি বাহিনীর বিধ্বংসী আক্রমণের শিকার। ওই রাতে আমি সেখানেই ছিলাম। সেই তাণ্ডবলীলার ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজেকে রক্ষাও করি। ২৭ মার্চ সান্ধ্য আইন কিছুটা শিথিল হলে তিন ঘণ্টার জন্য আমি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বিভিন্ন জায়গায় সেই ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলাম আর সেই অগ্নিকুণ্ডের বলয় থেকে পাকিস্তানি সেনাদের রক্তচক্ষুকে আড়াল করে কোনোরকমে এঘাট-ওঘাট, এবাড়ি-সেবাড়ি করে, সারাক্ষণ মৃত্যুদূতের তাড়া খেয়ে, নৌকায় ভেসে ভেসে প্রায় দীর্ঘ এক মাস পর একসময় সীমান্ত অতিক্রম করি। আমার একটাই লক্ষ্য ছিল–যে করেই হোক আমি আকাশবাণীতে পৌঁছব এবং আমার কথাগুলো বলব। কারণ, বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার উপযুক্ত মাধ্যমটি ছিল বেতার। যাহোক, আজ মনে পড়ে সেসময়ের ভয়ানক অস্থির অবস্থার কথা। চারদিকে ট্রেসার বোমা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী, মানুষের আহাজারি–কেবল আতঙ্ক আর আতঙ্ক। আমাদেরকে পাকিস্তানি ঘাতক সেনারা, অবাঙালি ঘাতকরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরের আঞ্চলিক কমান্ডার থাকায় তাদের লক্ষ্যবস্তুও ছিলাম আমি। দেশের সব অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ এবং

ভারতীয় সেনা সদস্যদের সঙ্গে উপেন তরফদার

সংখ্যালঘুদের যেখানেই পাচ্ছে, সেখানেই শেষ করে দিচ্ছে পাকিস্তানি সেনারা। এভাবে ক্রমাগত বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, আবার সেখানে হামলা চালাচ্ছে, আবার পালাতে হচ্ছে। যেখানেই আমাদের চলাচল, আশ্রয়; সেখানেই ঘাতক সেনাদের ট্যাঙ্কের আনাগোনা, গুলিবর্ষণ, ধ্বংস-লীলা। দেশটাকে একটা শ্মশানে পরিণত করছে।

১৯৭১ সালের ১২ কিংবা ১৩ মে আমি কলকাতায় 'আকাশবাণী' খুঁজে খুঁজে বের করি এবং সেখানে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার উদ্দেশ্য ছিল একটাই–তা হলো, একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত সেই ভয়ংকর মৃত্যু, নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ, সেই অন্ধকার কাঁপানো মানুষের গগনবিদারী আহাজারির কথা সেখানে জানানো। আমি তখন দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ করি। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের বক্তব্যের চেয়ে একজন সাংবাদিকের বক্তব্য তাঁদের কাছে বেশিই গ্রহণযোগ্য এবং সত্য ভাষণ বলে বিবেচিত হবে–এই চিন্তা করে আমি আমার সাংবাদিক পরিচয়টি ব্যবহার করেই সেখানে কথা বলার সুযোগটি তৈরি করতে চেয়েছি। আমার মনে হচ্ছিল, আকাশবাণীই হচ্ছে একমাত্র জায়গা, যেখানে বললে পুরো পৃথিবী জানতে পারবে। ভারতের যে বেতার মাধ্যমটি আছে, সেটি আমাদের অতি নির্ভরযোগ্য জায়গা। বিশেষ করে কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে যে কথাবার্তাগুলো শুনেছি '৭১ নিয়ে, তাতে মনে হয়েছে যে এখানে কিছু বললে নিশ্চয় আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা বা আমার চাক্ষুষ যে ঘটনাগুলো, সেগুলো যদি আমি জানাতে পারি, তাহলে অন্তত পৃথিবীর কাছে পৌঁছে যাবে। আর একজন কর্মরত সাংবাদিক হিসাবে আমার জন্য এটা ছিল পেশাগত দায়িত্ব এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই যেন আমার সংযোগটি স্থাপন করতে পারছিলাম না। সম্পূর্ণ অচেনা জগৎ আমার কাছে। চেনাশোনা কেউ নেই। অথচ আমার কথাগুলো যে করেই হোক বলতেই হবে–এমন একটা ক্ষিপ্রতা তখন আমার মধ্যে কাজ করছিল। আমি একটা সাধারণ প্যান্ট এবং টি-শার্ট পরিহিত ছেলে। আকাশবাণীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর কড়াকড়ি ছিল জায়গাটিকে ঘিরে। সেখানে দেখি, একেকজন করে বেরিয়ে আসছেন। কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছেনও না। কিছু শুনছেনও না। আমি যে কিছু একটা বলতে যাব, ভেতরে সেরকম বলার সুযোগও আমি পাচ্ছিলাম না। এটা ছিল আমার প্রথম দিন। সেদিন আমি কিছু না করেই ফেরত চলে যাই। পরের দিন আবার সেখানে যাই। একটাই পরিকল্পনা–একাত্তরে পাকিস্তানি সেনারা বাংলাদেশে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়েছে, সেটা যেন আমি কোনো-না-কোনোভাবে তাদের জানাতে পারি। তখনও কিন্তু বাংলায় পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে আমরা কিছু জানতাম না বা পত্রপত্রিকায় যা কিছু বের হয়েছে, সেটাকে এভাবে প্রচার করা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে–এইটুকুই। এর বাইরে তখনও সেইভাবে কোনো কিছু প্রচারিত হতে পারেনি। অবশেষে তৃতীয় দিনে আমি দেখলাম হঠাৎ এক ভদ্রলোক, সুদর্শন। তাঁর হাতের মধ্যে একটি ক্যামেরা, মাইক এবং রেডিয়োর কিছু ধারণযন্ত্র নিয়ে আকাশবাণীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন, আমি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আগে বলুন আপনি কে?' তখন আমি তাঁকে গড়গড় করে সব বললাম, আমি একজন পেশাদার সাংবাদিক। দৈনিক ইত্তেফাকে আমি সাংবাদিকতা করি। দৈনিক ইত্তেফাকে একাত্তরের সেই ২৫ মার্চের রাতটায় আমি

সেখানে ছিলাম। পাকিস্তানি বাহিনী কামান দিয়ে ধ্বংস করেছে সবকিছু। আমি বাংলাদেশের সেই ধ্বংসস্তূপটা দেখেছি। এই জিনিসটা আমি আপনাদের মাধ্যমে প্রচার করতে চাই। পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের সঠিক চিত্রটি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে চাই। এই হলো উপেনদার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

তিনি তখন গুরুত্বটা উপলব্ধি করলেন এবং আমাকে বিশ্বাস করলেন। কিন্তু সেসময় একটা সতর্কতা ছিল যে আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করা যায়! কারণ, পাকিস্তানি চরেরা তো চারদিকেই সোচ্চার ছিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে ওই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'আপনি ভেতরে আসুন।' আমি অভ্যর্থনা কাউন্টারের সামনে অপেক্ষা করলাম এবং তিনি ভেতরে গেলেন আর আমার জন্য একটা পাস জোগাড় করে দিলেন। আমি ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র পেলাম! ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সময়গুলোয় যখন যেখানে রেডিয়োতে আকাশবাণী ধরা হতো, আকাশবাণীর বিভিন্ন সময়ের খবর ও অনুষ্ঠান শুনে শুনে কুশীলবদের কারও কারও নামও জেনেছিলাম। তার মধ্যেই উপেন তরফদার ও দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নাম দুটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। উপেনদা তখন 'সংবাদ পরিক্রমা' করতেন এবং দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেই 'সংবাদ পরিক্রমা' দুর্দান্তভাবে পাঠ করতেন। এই নাম দুটি আমার খুব পরিচিত ছিল। আমি যখন আকাশবাণীর ভেতরে ঢুকে পড়লাম, আমাকে উপেন তরফদার প্রথমেই সরল গুহ নামের একজন ভদ্রলোক, ওখানকার একজন বড়োকর্তা, তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে দেখিয়ে তাঁকে বললেন, 'ইনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, ওখানকার যুদ্ধ থেকে এসেছেন এবং কিছু কথা বলতে চান। আমার মনে হয় যে তাঁর কাছ থেকে বক্তব্য নেওয়া যেতে পারে।' যাহোক, সরল গুহ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে আমার একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও বাংলার প্রিয় শিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল অজিত কুমার গুহ। আর সরল গুহ তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র! সেই হিসাবে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হলো। তিনি আমাকে সোজা স্টুডিয়োতে নিয়ে গেলেন এবং উপেন তরফদারকে পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন, 'এর একটা সাক্ষাৎকার নাও, দেখি কী বলতে চায়।' তখনই আমার সুযোগটি এলো এবং সেখানে আমি পুরো বক্তব্যটি বললাম। একাত্তরের ২৫ মার্চ আমি কী কী দেখলাম, কীভাবে সংবাদমাধ্যমগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ২৬ মার্চ কী করে আমি বাড়ি পৌঁছলাম। ২৭ মার্চ কী করে আমি পুরো ঢাকা শহরটা সেই জগন্নাথ হল থেকে শুরু করে সমস্ত পুলিশ প্রশাসনের জায়গাগুলোর কোথায় কী অবস্থা আমি দেখে এসেছিলাম–সবকিছু আমি বললাম। তাঁরা খুব চমকিত হলেন এই কারণে যে, এই ব্যাপারে এত বিস্তারিত বিবরণ একজন কর্মরত সাংবাদিকের মুখ থেকে নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এখনো কেউ শোনেননি। আমি তাঁদের বললাম, আমি তো আসলে মুক্তিযুদ্ধই করতে চাই; কিন্তু শুধু এই জিনিসটা জানিয়ে দিতেই আপনাদের কাছে আসা। তারপর আমাকে পরের দিন যেতে বলা হলো। যথারীতি পরের দিন গেলাম এবং দেখলাম যে আমাকে দিল্লি কেন্দ্র থেকে ইন্টারভিউ করানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তাঁরা আমার ভাষণমতে আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন। একাত্তরের ২৫ মার্চের আগে কিছু সংগ্রামী মানুষকে নিয়ে আমার একটি ধারাবাহিক সেসময় দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। এরই কিছু কপি সেসময়ে তাঁদের অফিসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল ফাইলে জায়গা করে নিয়েছিল, সেখান থেকেই। যাহোক, বরুণ হালদার, যিনি কি না ইংরেজি সংবাদ পাঠ করতেন, তিনিও এখন প্রয়াত। তিনি আমাকে ইন্টারভিউ করলেন ইংরেজিতে। এটা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত হলো। সেই বক্তব্য সেসময় তুমুল আলোড়ন তৈরি করেছিল। আমি কলকাতায় বসেই শুনলাম আমার ইন্টারভিউ বারবার প্রচার করা হচ্ছে যে, একজন সাংবাদিক তিনি বাংলাদেশ থেকে এসে পূর্ব বাংলার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের কথা, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, এর বিস্তারিত বিবরণ ছিল আমার সেই বক্তব্যে। পরে সরল গুহ আমাকে বললেন, 'তুমি কোথায় থাকো?' আমি বললাম, 'আমি থাকি হাকিমপুর সীমান্তে। সেখানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এখনো শুরু হয়নি। সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছি। ওখানে আমি থাকছি এবং একই সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক কর্মী আমার সঙ্গে যারা আছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি এবং সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। উনি আমাকে বললেন, আমি যেন কোথাও না যাই এবং আবার আকাশবাণীতে আসি। পরে আবার আমি আকাশবাণীতে গেলাম এবং সরল গুহ আমাকে বললেন, "তুমি তো সুন্দর বাংলা বলো এবং লেখ, তুমি কি একটা 'কথিকা' লিখতে পারবে এবং সেটা পড়তে পারবে? তবে তোমাকে কিন্তু স্বনামে পড়তে হবে। স্বনামে পড়লে বাংলাদেশে তোমার আত্মীয়স্বজনের জীবননাশ বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে।" আমি বললাম, 'অবশ্যই আমি স্বনামেই পড়ব।' তখন সেটার নাম ঠিক হলো 'জবাব দাও'। তারপর আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে এই 'জবাব দাও' অনুষ্ঠান শুরু হলো এবং তারপর একসময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রমও শুরু হয়। সেখানে এমআর মুকুল অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

উপেন তরফদার ও আবেদ খান

যাহোক, এভাবেই আমাদের সূচনা এবং আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুরু হয় উপেন তরফদারের। উপেন তরফদার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতেন, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় আমার সঙ্গে কথা হতো। আর আস্তে আস্তে আকাশবাণীর বার্তা বিভাগের আমি একজন হয়ে গেলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে নয় যদিও। কিন্তু আমি যে ফিচারটা পড়তাম, বলতাম, আবৃত্তি করতাম, সেগুলো আমাকে ওখানে বেশ পরিচিতি এনে দিল। শেষ পর্যন্ত আমার আরও দুজন বন্ধু হলো। একজন প্রণবেশ সেন, যিনি ওখানে 'সংবাদ পরিক্রমা' লিখতেন। তিনি একজন অসাধারণ মেধাবী মানুষ এবং অসাধারণ লেখক। প্রণবেশ সেন আমাদের কামাল লোহানীর বন্ধু ছিলেন। সিরাজগঞ্জের মানুষ। উপেন তরফদার ছিলেন মানিকগঞ্জের। অর্থাৎ সবাই পূর্ব বাংলার। সরল গুহ, তিনিও ছিলেন কুমিল্লার। অর্থাৎ তাঁরা বাংলাদেশের মানুষ হওয়ায় ঘনিষ্ঠতার সুযোগটি শুরু হলো বেশি করে এবং আমি তাঁদেরই একজন হয়ে গেলাম। সেখানে দেখা পেলাম আরেকজনকে, তিনি হলেন পীযূষ

বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ি বরিশালে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো, ঘনিষ্ঠতা হলো। 'আপনি' থেকে সম্পর্কটা 'তুমি'তে এসে পড়ল। তারপর আমি যখন মুক্তিযুদ্ধে সংযুক্ত হলাম, তখন অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে আসতে হতো কেবল অনুষ্ঠানটি করার জন্য। যখন সীমান্ত থেকে আকাশবাণীতে আসতাম, আমার পায়ে থাকত জঙ্গল শু এবং আমার একটাই কাপড় ছিল। ওই অবস্থায় আমি সীমান্ত থেকে চলে আসতাম। বিনা পয়সায় ট্রেনে চলে আসতাম শিয়ালদায়। সেখান থেকে হেঁটে আকাশবাণীতে যেতাম। সেখানে প্রতিটি 'কথিকা'র জন্য আমাকে ১০ টাকা করে দেওয়া হতো। আমি দুটি কথিকা একসঙ্গে করে নিয়ে যেতাম এবং দুটির জন্য ২০ টাকা পেতাম, আবার সীমান্তে ফিরে যেতাম। এই ছিল আমার সময়কার আকাশবাণীর সঙ্গে সম্পর্ক। এর ভেতর দিয়েই উপেন তরফদার আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়ে গেলেন। পরবর্তী সময়ে উপেন তরফদারের সঙ্গে আমার বিভিন্ন সময় কথাবার্তা হয়েছে। উপেনদা আমার বাড়িতেও এসেছেন। আমিও উপেনদার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। প্রণবেশ সেনের সঙ্গে আমার প্রতিনিয়ত গল্প হয়েছে। আমাদের সবার গল্পের একটা জায়গা ছিল। আকাশবাণীর ছাদে আমরা গল্প, আড্ডা করতাম। দেব দুলাল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরের মধ্যে একজন হয়ে গিয়েছিলেন। উনি যখন ঢাকায় এলেন, সরাসরি আমার অফিসে চলে এসেছিলেন। তখন আমি যুগান্তরের সম্পাদক। যাহোক, একটা সময় তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর দৃষ্টিকে অন্ধকার গ্রাস করে। আসলে তাঁর মতো একটা স্বর্ণকণ্ঠ বোধহয় আমরা দ্বিতীয়টি পাইনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে। যাহোক, এই হলো উপেন তরফদার, দেব দুলাল, প্রণবেশ সেন, সরল গুহের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ভিত। আরেকজন ছিলেন দ্বিপেশচন্দ্র ভৌমিক। তিনি ছিলেন বার্তা সম্পাদক। তিনিও আসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনিগুলো, যুদ্ধকালীন তথ্য যা যা আমার কাছে থাকত, যেখানে যে তথ্য পেতাম, সেগুলোকে নিয়ে অনেক কথা হতো আমাদের। উপেনদার সঙ্গে যখনই কলকাতায় গিয়েছি, দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, তখনই তাঁর বন্ধুত্বের উষ্ণতা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। আমরা গল্প করতাম সেই '৭১ নিয়ে, কোথায় কী করছেন সেগুলো নিয়ে, তাঁর দূরদর্শনে তিনি যখন উচ্চপদে একটা দায়িত্ব পেলেন তা নিয়ে।

উপেন তরফদার আমার সেই জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন। আমার মনে আছে, আমি যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজনকে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলাম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, এই তিনজনার বাইরেও একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। যিনি লিখেছিলেন:

'তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?'

এই অন্নদাশঙ্কর রায়কে আমরা আজীবন সম্মাননা দিয়েছিলাম। সেখানেই উপেন তরফদার ও দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল। সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল প্রণবেশ সেনকেও। আজ মনে করে আনন্দিতবোধ করি, অন্তত আমার উদ্যোগেই এই মহতী কাজটি করতে পেরেছিল। জীবদ্দশায় অন্তত জীবনের এই দায়টি সম্পন্ন করতে পেরেছি। যাহোক, তিনি একবার বলেছিলেন, বিশেষ করে আমাকে নিয়ে একখানা বই লিখবেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়, তাঁর সঙ্গে আমার বিভিন্ন সময় ঘটা নানা ঘটনাবলি, মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং পরের দিনগুলোর কত স্মৃতি–সবকিছু নিয়েই তাঁর একটা বই আকারে ছাপানোর কথা ছিল। উপেন তরফদার চলে যাওয়ার পর এই কাজটির আর আশা রইল না। তিনি শুধু আমাকে আকাশবাণী কলকাতা সংক্রান্ত একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। আমার মনে পরে, তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে একটা বিষয় উল্লেখ করেছিলেন সেটা হলো, তাঁর সঙ্গে আমার একটা বাজি হয়ে গিয়েছিল। বাজি ধরেছিলেন সরল গুহ, দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন। বাজিটি ছিল এই যে, আমি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব কি পারব না, তা নিয়ে। উপেনদা বলেছিলেন, 'তুমি কোনোদিনও পাড়বে না। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমরাই দেখা করতে পারি না।' আমি বলেছিলাম, 'আমি দেখা করব এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হব।' পরে আমি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম সৌভাগ্যক্রমে। একদিন শিয়ালদা স্টেশন থেকে টেলিফোন করে তাঁকে বলেছিলাম, 'আমি মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক, বাংলাদেশ থেকে এসেছি, সেই হিসাবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' উনি বলেছিলেন, 'আমি তো সহজে দেখা করি না।' আমি বলেছিলাম, 'আমার সঙ্গে আপনার দেখা করতেই হবে। কারণ, আমি এর পরে যখন যুদ্ধে চলে যাব, তখন আমি যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরতেও পারি, না-ও পারি। কাজেই আমার এই শেষ সাধ আপনার সঙ্গে দেখা করা। কারণ আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি, আমি আপনাকে দেখতে চাই।' এ কথায় তিনি খুব বিচলিত এবং মোহিত হয়েছিলেন বোধহয়। তিনি আমাকে ঠিকানা দিলেন এবং তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। আমি বললাম, 'আমার কাছে তো যাওয়ার জন্য কোনো টাকা নেই।' উনি বললেন, 'তোমার গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দেব। তুমি চলে এসো।' এভাবে আমি যখন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম এবং কথাটি আকাশবাণীর সবাইকে বললাম, সেখানে আমার মর্যাদা শতগুণ বেড়ে গেল। পরবর্তী সময়ে সুবিধা ছিল এই সত্যজিৎ রায় যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রতিবছর আমি একবার করে তাঁর বাড়িতে যেতাম, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যেতাম। তিনি আমাকে প্রচণ্ড স্নেহ করতেন। তাঁর জন্য আমি প্রতিবার এক কার্টন করে সিগারেট নিয়ে যেতাম। তিনি অনেক খুশি হতেন। যাহোক, এ ব্যাপারে উপেনদা আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি অসাধ্য সাধন করেছো আবেদ ভাই!' শুধু তা-ই নয়, সত্যজিৎ রায় আমাকে একবার তাঁর একটি সিনেমা, সিনেমা হলে গিয়ে দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সিনেমাটির নাম ছিল 'সীমাবদ্ধ'। সেই সময় এই বিষয়টি আকাশবাণীতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমাকে একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে দেখা হতো। এমনকি আকাশবাণীর গেটে যে দায়িত্বে থাকত, সেও আমাকে দেখে চিনত যে আমি সেই ব্যক্তি, যিনি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরেছেন। আর আমি মনে করি, আমার সৌভাগ্যটির দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল এই উপেন তরফদারের জন্যই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপেনদা যিনি নিজেকে দাবি করতেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক হিসাবে। তাঁর 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' নামক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্কের কথা বলে গেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম আমার স্মৃতিতে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। নির্যাতিত-নিপীড়িত বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে একদিন আমি আবিষ্কার করলাম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ওপার বাংলার সংগ্রামী ভাই-বোনদের সঙ্গে আমি একজন সৈনিক হয়ে লড়াই করছি।'

আর কদিন পরই তাঁর প্রয়াণের এক বছর পূর্ণ হবে। আমি তাঁর জন্য আমার সব প্রার্থনা উজাড় করে দিলাম।

লেখক: চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও সম্পাদক, দৈনিক জাগরণ

স্মৃতিতে একাত্তর

সৈয়দ দীদার বখ্‌ত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতাযুদ্ধের ডাক সমগ্র দেশবাসীকে নতুন উদ্দীপনায় বিশেষ করে যুবসমাজকে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত করেছিল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্প্রসারিত হয়েছিল।

১ মার্চ ১৯৭১। ঢাকা স্টেডিয়ামে ব্রিটিশ-পাকিস্তানের জমজমাট ক্রিকেট খেলা চলছে। আমরা সদলবলে খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে গিয়েছি। খেলার মাঝখানেই খবর এলো তদানীন্তন পাকিস্তানের চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করেছেন। জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। ৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান সংসদ অধিবেশন ডেকেছেন। স্বাভাবিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হবেন প্রধানমন্ত্রী। সবকিছু ভণ্ডুল করে দিয়ে জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন ইয়াহিয়া খান। ১ মার্চের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা স্টেডিয়ামে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। কানায় কানায় পরিপূর্ণ স্টেডিয়াম মানুষের রণহুংকারে গর্জে উঠল। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল ঢাকা স্টেডিয়াম। বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় খেলা ক্রিকেট। সেই খেলা সঙ্গে সঙ্গেই ভণ্ডুল হয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রাস্তায় নেমে এলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক হোটেল পূর্বাণীতে নেতাদের নিয়ে মিটিংয়ে বসলেন। মিটিং চলাকালে হাজার হাজার মানুষ মিছিলসহকারে সেখানে উপস্থিত হয়। এসব মিছিলের মুখ্য স্লোগান ছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন

করো'। মিটিংয়ের পর বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন আগামী ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তিনি জনসভায় সিদ্ধান্ত জানাবেন। ইতোমধ্যে ছাত্রদের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এর ঢেউ লাগল। নতুন আঙ্গিকে স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতাসংগ্রামে রূপ নিল। এর পরপর মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানান। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছাত্র-জনতার এক বিশাল জনসভায়ও স্বাধীনতার ঘোষণার সনদসহ ১১ দফা দাবি উত্থাপন করে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ করল। এদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো দাবি করলেন পূর্ব পাকিস্তানে যেমন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তেমনই পশ্চিম পাকিস্তানে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনিও প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার। বিকল্প পথ হিসেবে ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রস্তাব করলেন তিনি। মোট কথা, রাজনৈতিক মীমাংসার সব পথ রুদ্ধ করে দেশকে এক ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিলেন ভুট্টো সাহেব। দেশের এই টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল ৭ মার্চ রেসকোর্স জনসভার দিকে। আমি রোজকার মতো সাহিত্য পত্রিকা 'সমকাল' অফিসে যাই। স্বনামধন্য কবি সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল'-এ আমি কাজ করি। দেশের স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক সবাই সমকাল অফিসে কবি সিকান্দার আবু জাফরের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ৭ মার্চের সকালে তদানীন্তন দৈনিক পাকিস্তানে কবি সিকান্দার আবু জাফরের বুদ্ধিজীবী মহলের চূড়ান্ত অভিব্যক্ত 'বাংলা ছাড়ো' কবিতা ছাপা হলো। সাংবাদিক, সাহিত্যিক হাসান হাফিজুর রহমান পরম সাহসিকতার পরিচয় দিলেন পত্রিকায় এই কবিতাটি ছেপে। সকালে বঙ্গবন্ধু এই কবিতাটি পড়েছিলেন। তাঁর অন্যতম বন্ধু সিকান্দার আবু জাফরকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন যে তাঁর আর কোনো সংশয় নেই যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহল তাঁর পাশে আছে। বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা সব বুদ্ধিজীবী মহলে এক নতুন উদ্যম-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে ৭ মার্চের সকালে এই কবিতাটি ছাপা হওয়ার কারণে বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হলো।

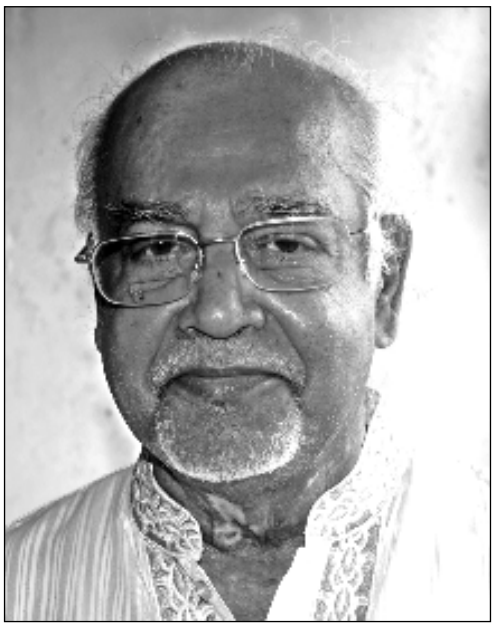

সৈয়দ দীদার বখ্‌ত

সকালে যথারীতি সমকাল অফিসে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সুসাহিত্যিক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সমকালে এলেন। দুজনে নানা বিষয় নিয়ে বিশেষ করে দেশের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করলাম। তারপর একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রেসকোর্স ময়দানে এসে উপস্থিত হলাম। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সাহিত্যাঙ্গনে এক দিকপাল এবং 'আলোকিত মানুষ' সৃষ্টির অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে আজ বাংলাদেশে বিবেচিত। আমরা দুজন রেসকোর্স ময়দানে এসে সভাস্থলে মঞ্চের ঠিক নিচেই বসলাম। হাজার হাজার মানুষ স্লোগানে স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে রেসকোর্স ময়দানে এসে জমায়েত হতে থাকল। স্লোগানের মুখ্য বক্তব্য 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। রেসকোর্স ময়দান লাখ লাখ মানুষে কানায় কানায় পরিপূর্ণ বিস্ফোরণোন্মুখ মানুষের মাঝে একটাই আকাঙ্ক্ষা–'দেশের স্বাধীনতা'।

৭ মার্চের ভাষণ সবাই জানেন। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে কয়েকটি বিষয় যেমন: 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর', এটা সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক বলেই আমার কাছে মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়, 'অসহযোগ আন্দোলনের ডাক'। তৃতীয়, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এটা চূড়ান্ত স্বাধীনতার ডাক বলে আমার মনে আর কোনো দ্বিধা ছিল না। এই মিটিংয়ের পর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। একটি ক্ষমতা হস্তান্তর কর অথবা সশস্ত্র যুদ্ধ। মাসজুড়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর প্রতিদিন খবরের কাগজজুড়ে প্রকাশিত হতে থাকল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়তে শুরু করল।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক অবহেলিত-বঞ্চিত জনপদ সাতক্ষীরা জেলার তালা থানায়ও যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে যুবসমাজ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়া শুরু করেছিল। ২৯ মার্চ তালার ডাক বাংলোতে উড়তে থাকা পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের ম্যাপখচিত পতাকা উড়ানো হয়েছিল। আমি সংগ্রাম পরিষদের সর্বসম্মতিতে অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ায় উপস্থিত কয়েক হাজার জনতার সামনে দেশের ভয়াবহ ভয়ংকর পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরোচিত গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিবরণ তুলে ধরলাম। দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় যুবসমাজ রণহুংকারে গর্জে উঠেছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল সেদিন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অখ্যাত অবহেলিত এই জনপদ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার জন্য জনগণকে সংগ্রামের আহ্বান করেছিলেন। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ম্যান্ডেট দিয়েছিল।

পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চের রাতে ভয়াবহ গণহত্যার ঘটনায় জনগণ নিজেদের সংগঠিত করে সেই ম্যান্ডেট কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সেনারা গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছে, আমাদের কাছে তা অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু সেদিন জাতীয় নেতারা বসে থাকেননি। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন জীবন দিয়ে হলেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। এর জন্য চাই একটি আইনি ব্যাখ্যা। সেই আইনি ছত্রছায়ায় তৈরি করার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করা হলো। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে ৬ সদস্যের একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করা হলো। এই বিপ্লবী সরকারের আরও আইনি আচ্ছাদনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মাটিতে শপথ পড়ানো এবং গার্ড অব অনার দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

শিলিগুড়ি থেকে আমরা বসিরহাটে ফিরে এলাম। এপ্রিলের শেষের দিকে ইটিন্ডা ঘাটে ড. কামাল সিদ্দিকী ও ড. তৌফিক-ই-ইলাহী

চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলো। দুজনই মিলিটারি পোশাকে সুসজ্জিত হাতে রাইফেল। কামাল সিদ্দিকী নড়াইল মহকুমার এসডিও ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জানলাম পাকিস্তানি সেনাদের কবল থেকে তিনি নড়াইল জেলা মুক্ত করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলেন। এরপরই যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি সেনারা নড়াইল অভিমুখে যাত্রা করলে সেখানে টিকে থাকা সম্ভব নয় বলেই তিনি সেখান থেকে চলে এসেছেন এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারে যোগদান করেছেন। ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীর বর্ণনা প্রায় একই রকম। দুজনই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। তাঁরা জানালেন অচিরেই বিপ্লবী সরকার সব জেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এবং অস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

আমরা বসিরহাট থেকে আবার ভোমরা বর্ডারে ফিরে আসি। ভোমরায় কামরুজ্জামান টুকুর সঙ্গে দেখা হলো। টুকু ছাত্রজীবনে আমাদের রাজনৈতিক সহকর্মী ছিল। টুকু এবং আমি দুজন মিলে বেশকিছু ছেলেকে নিয়ে একটি ক্যাম্প করি। এই সময় সংবাদ পাই আমার গ্রামের বাড়ি পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করবে। এই সংবাদে আমার মা স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। আমার বড়ো ভাই বেদার বখত্ তখন তালায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেওয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়ি গেছেন শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেও মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। আমি টুকুকে বললাম, আমিও গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। তুমি ক্যাম্প চালাও। আমি গ্রামে গিয়ে ছেলেদের এই ক্যাম্পে পাঠাব। তাদের ট্রেনিং, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করো।

এই সময় একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। ভোমরার অপর পারে খোঁজডাঙ্গা। খোঁজডাঙ্গায় থাকাকালীন আমাদের একটি ছেলে কিছুটা আহত হয়েছিল। তার চিকিৎসা দেওয়ার জন্য কোনো টাকাপয়সা আমাদের ছিল না। টুকু বলল, দীদার ভাই কিছু ব্যবস্থা করেন। আমি তখন কলকাতায় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য যাই। আমার বড়ো ভাই কামাল বখত্ এমএনএ, আবদুল আজিজ এমএনএ (মেম্বার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি)–দুজনই আওয়ামী লীগের বড়ো নেতা।

তাঁদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁরা সাহায্য করার মতো অবস্থায় নেই বলে জানালেন। আমি তখন কলকাতার বিধান ভবনে অবস্থানরত আমার ভাগনে শাহ হাদিউজ্জামান এমপিএ (মেম্বার প্রভিনশিয়াল অ্যাসেম্বলি)-এর সঙ্গে দেখা করি। সে সব শুনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওষুধপত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পায়ের কেডস কিনে দিল। সঙ্গে কিছু অর্থও খাওয়া-দাওয়ার জন্য দিল। ওষুধপত্র, কেডস এবং কিছু খাবার নিয়ে আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

যুদ্ধজয়, উদ্দীপ্ত মুক্তিযোদ্ধার

রাজাকার বাহিনী ধীরে ধীরে প্রতিটি থানায় তাদের ঘাঁটি করতে শুরু করেছে। আমরা ঠিক করলাম তালা থানায় রাজাকারদের ঘাঁটি গাড়তে দেওয়া হবে না। আমরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলাম। গ্রামের অভ্যন্তরে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিবাহিনীর মনোবলকে জোরদার করার কাজে নিয়োজিত করলাম। যে কোনো মূল্যে রাজাকার বাহিনীকে প্রতিহত করা হবে। পাশের থানা পাইকগাছা। সেখানে রাজাকাররা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছে। খবর পাচ্ছি তারা প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে বাড়িঘর লুট করছে। যারা পাকিস্তানি হানাদারদের বিরোধিতা করছে, তাদের ধরে এনে কপোতাক্ষ নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে।

পাইকগাছা থানার রাজাকারদের শক্ত ঘাঁটি কপিলমুনি। কপিলমুনি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম বর্ধিষ্ণু ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক স্থান। খবর পেলাম এই কপিলমুনি থেকে একটি রাজাকার দল তালা থানায় তাদের ঘাঁটি তৈরি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তালা সদর ইউনিয়নের কতিপয় শান্তি কমিটির নেতা কপিলমুনিতে রাজাকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়ে আসছে। কপিলমুনিতে নেছার শেখ পোস্ট অফিসে কর্মরত। তাঁর মাধ্যমে টেলিফোনে যোগাযোগ করে রাজাকারদের গতিবিধি জানতে থাকি। সেই মতো আমরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারব।

নেছার খবর দিল কপিলমুনি থেকে রাজাকারের একটি দল তালা যাচ্ছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর একটি দল তালা থানাকে বাইপাস করে মোবারকপুর নদীর পাড়ে অবস্থান নিই। অপেক্ষা করতে থাকি রাজাকারদের নৌবহরের। প্রায় আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর রাজাকারদের নৌবহর দেখা গেল। তারা আমাদের সামনে আসামাত্র আমরা গুলি ছুড়তে শুরু করলাম। রাজাকাররা ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া শুরু করল। ওদের কমান্ডার ছিল খালেক। সে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করা হলো। রাজাকারদের ২০/২৫ জন নদীর মধ্যেই সমাহিত হলো। বীরদর্পে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা অক্ষত অবস্থায় তেঁতুলিয়া ঘাঁটিতে ফিরে এলো। ওইদিন যুদ্ধে আমাদের দুটি অবস্থান ছিল। একটি আক্রমণ অবস্থান, দ্বিতীয়টি আধা কিমি. দূরে ১০/১৫ জন মুক্তিযোদ্ধার ব্যাকআপ অবস্থান।

প্রথম আক্রমণ অবস্থান যদি কোনো কারণে পিছু হটতে বাধ্য হয় তবে আধা কিমি. এলেই দ্বিতীয় দল তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। এটাই ছিল যুদ্ধের কৌশল। প্রথম আক্রমণেই জয়ী হয়ে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বীরদর্পে যখন তেঁতুলিয়ায় আমাদের বাড়িতে এলো, তখন আমার মা ছেলেদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) ফুলেল অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের আদর করে মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে বললেন, 'সোনার ছেলেরা তোমরা যুদ্ধজয় করে ফিরে এসেছ–তোমরা দেশের গৌরব, দেশ তোমাদের মনে রাখবে, শ্রদ্ধা করবে।' মায়ের সেই উক্তি এখনো আমার মনে জাগ্রত। মা বিজয়ী ছেলেদের খাবার ব্যবস্থা করছিলেন। ওদের পুকুর থেকে গোসল করে আসতে বললেন।

রাস্তায় দুজন গার্ড রেখে ছেলেরা যখন গোসল করছে, সেই সময় একটি গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সন্দেহ হলো হয়তো সেনাবাহিনীর গাড়ি। এর পরপরই গুলির আওয়াজ এবং টায়ার ফাটার বিকট আওয়াজ। গোসল বাদ দিয়ে তখন ছেলেরা যে যার রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে ছুটল অবস্থান নেওয়ার জন্য। আমাদের তেঁতুলিয়া বাড়ি থেকে ৪০/৪৫ গজ দূরে রাস্তায় তখন একটি বাস থেকে অবিরাম গুলি ছুড়ছে। গুলিবৃষ্টির মধ্যে আমাদের ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

বাসে করে সাতক্ষীরা মহকুমা সদর থেকে একটি পুলিশবাহিনী তালার যুদ্ধ সম্পর্কে সংবাদ পেয়ে মুক্তিবাহিনীকে হটানোর জন্য আসছিল। পথিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের শিকার হয় তারা।

> আমরা দুজন রেসকোর্স ময়দানে এসে সভাস্থলে মঞ্চের ঠিক নিচেই বসলাম। হাজার হাজার মানুষ স্লোগানে স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে রেসকোর্স ময়দানে এসে জমায়েত হতে থাকল। স্লোগানের মুখ্য বক্তব্য 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'

পুলিশবাহিনী বাস থেকে নেমে রাস্তার দুপাশের গর্তে পজিশন নিয়ে অনর্গল গুলি করে চলছে। এই অবস্থার জন্য মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে কিছুটা পিছু হটে গেলেও আবার তারা সংগঠিত হয়ে প্রতি-আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলো।

তেঁতুলিয়া গ্রাম তখন প্রকৃত অর্থে যুদ্ধক্ষেত্র। এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক কামেল দুজনকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঘুরে রাস্তার পূর্বপাশ থেকে আক্রমণ রচনা করল। প্রথম গুলি করে পুলিশবাহিনীর উদ্দেশে চিৎকার করে বলল–তোমরা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেছ। সারেন্ডার কর, নইলে মৃত্যু অনিবার্য।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি রাস্তার অপর পাশ থেকে ওদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে ওদের আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানালাম।

এরপর পুলিশবাহিনীর পেছন থেকে মারুফ হোসেন তুরান ও নুরুল ইসলামের কণ্ঠস্বর শুনলাম। ওরাও গুলি ছুড়ে যুদ্ধাবস্থায় পুলিশকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান করছে। পুলিশবাহিনী অবিরাম গুলি ছুড়েই চলছে। যখন তিনদিক থেকে তাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশ আসছে–উপায়ান্তর না দেখে তারা চিৎকার করে গুলি থামাতে বলল এবং আত্মসমর্পণ করার ঘোষণা দিল।

তখন তাদের মাথার উপর হাত তুলে লাইন ধরে সামনে গিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্রসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হলো। পুলিশবাহিনীর প্রায় ৩৫/৩৬ জন এভাবেই মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

পুলিশবাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন সাতক্ষীরা জেলার এসডিপিও (সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার)। তাদের সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমরা দখল করলাম। ওদের কর্ডন করে আমাদের বাড়ির পুকুরঘাটে বসিয়ে রাখলাম। এসডিপিও সাহেব কোহিনূর ভাই মুরুব্বি হিসেবে তাঁর কাছে আবেদন করল। তার আবেদন বিবেচনায় নিয়ে একটি চুক্তি হলো। চুক্তি অনুযায়ী সাতক্ষীরা পুলিশবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অবাধে চলাফেরায় কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। বরং তারা আগাম খবর পেলে মুক্তিবাহিনীর যাতায়াতে সাহায্য করবে। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সেদিন আমরা কোহিনূর ভাইয়ের অনুরোধে পুলিশ দলকে ছেড়ে দিয়েছিলাম কিছু গুলি রেখে। এসডিপিও সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অস্ত্র ও গুলি লাগলে সরবরাহ করবেন। এভাবেই সেদিন সাতক্ষীরা অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর অবাধ চলাচলের রুট হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

এই যুদ্ধের পর আমরা আন্দাজ করেছিলাম, সংবাদ পেয়েই পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের বিতাড়িত করতে প্রস্তুত হয়ে আসবে। আমাদের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হলো। পরদিনই যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিলিটারি গাড়িবহর আমাদের গ্রামে হানা দিল। এভাবেই একই দিনে দুটি ভয়ংকর যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়ী হওয়ায় নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে লিপ্ত হলো।

মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রত্যাঘাত শুরু

যেসব কাজ কঠিন এবং দুঃসাহসিক, তা প্রথম করতে গেলে একটু ভয় ভয় লাগে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু একবার সাহস করে এগিয়ে গেলে ভয় দূর হয়ে যায়। সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করলেই সেই দুঃসাহসিক কাজটি জয়লাভ করা সম্ভব। যত শক্ত ও কঠিন হোক না কেন, সাহসী মনোবল নিয়ে সেই কাজ অবশ্যই করা সম্ভব। সেটাই করে দেখাল আমাদের অকুতোভয় সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা।

প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তাদের সাহস গেল বেড়ে এবং যে কোনো শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। আমাদের সব থেকে বড়ো সমস্যা হলো অস্ত্রের স্বল্পতা। কীভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়, সেই চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কামেল প্রস্তাব দিল রাস্তায় যেসব পুলিশ অস্ত্র নিয়ে পাহারা দেয়, তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাদের ছেলেদের দেওয়া যায়। আমি তাঁকে বললাম যদি ওরা কোনো রকমে টের পায় তবে সমূহ বিপদ হবে– সেদিকে খেয়াল রাখবে। প্রথমে বাধা দিলেও কামেলের পরিকল্পনা শুনে মনে হলো এটা সম্ভব।

সেই মতো কামেল শুধু একজন সহযোদ্ধা নূরুলকে নিয়ে পাটকেলঘাটা ব্রিজে পাহারারত সেপাইদের অস্ত্র কেড়ে নিতে গেল। কপোতাক্ষ নদের উপর কুমিরা ও পাটকেলঘাটাকে সংযুক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে এই ব্রিজটি। দুপাশে দুজন দুজন করে পাহারা রেখেছিল। লোক চলাচল করলে তাদের সার্চ করে তবে ব্রিজ পার হতে দেওয়া হতো। কামেল তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাধারণ গ্রাম্যলোক হিসেবে ব্রিজ পার হওয়ার জন্য গেলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। সাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁরা পুলিশের কাছে এগিয়ে যায় এবং আচম্বিতে তাদের দিকে পিস্তল তাক করে রাইফেল কেড়ে নেয়। এরপর তাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিজের অপর পাড়ে পাহারারত দুজন পুলিশের কাছে যায় এবং তাদের রাইফেল দুটি কেড়ে নেয়।

মুক্তিবাহিনীর ৪/৫ জন যারা একটু দূরে অবস্থান করছিল তাঁদের ডেকে নিয়ে পাটকেলঘাটা ডাকবাংলোতে অবস্থানরত ১০/১২ জন পুলিশের ওপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। অসতর্ক পুলিশ দল অসহায়ভাবে তাদের সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে।

পুলিশদের বলা হলো তোমরা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ। তোমাদের মেরে ফেলা উচিত। কিন্তু না, আমরা হত্যাকারী নই। তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা বাঙালি তাই। আমাদের মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ দিচ্ছি। তোমরা এই রাতেই ভারতে চলে যাও, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দাও। অথবা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করো। একটা সুযোগ দেওয়া হোক। তারা অবশ্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবে বলে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিল। এভাবেই অস্ত্র সংগ্রহ করে শক্তি বৃদ্ধি করা শুরু করলাম আমরা।

শান্তি কমিটির দৌরাত্ম্য বেড়ে চলল। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বাড়ি থেকে তুলে এনে নির্যাতন শুরু করল অথবা রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে অত্যাচার করতে লাগল। রাজাকাররা নির্যাতন চালিয়ে তাঁদের নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলতে লাগল। অত্যাচারী শান্তি কমিটির নির্যাতনের খবর বিপ্লবী সরকারের কাছে গেলে তারা উপযুক্ত শাস্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন।

ইতোমধ্যে তালায় মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য সফলতার বর্ণনা দিয়ে আকাশবাণী থেকে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খবর প্রচার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মুকুল ভাই 'চরমপত্রে' মুক্তিবাহিনীর 'ক্যাচকি' মারের অসাধারণ বর্ণনা প্রচার করেছিলেন। সেখানে কামেলের দুর্দান্ত সাহসিকতার বর্ণনাও প্রচার করেছিলেন এমআর আক্তার মুকুল ভাই।

মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসতাম। রাজাকার ও শান্তি কমিটির কার্যকলাপ এবং তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলো। তালাবাজারে প্রাণকৃষ্ণের একটি চায়ের দোকান ছিল। চায়ের দোকানে যেসব আলাপ-আলোচনা হতো, তা প্রাণকৃষ্ণ রাতে আমাদের জানাত। রাজাকার বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য দশম শ্রেণির ছাত্র মীর আবুল কালাম আজাদকে কাজে লাগানো হলো।

তালাবাজারের প্রভাবশালী একজন সদস্য যার ভাই আর্মিতে কাজ করেন, তিনি শান্তি কমিটির সেক্রেটারি। তিনি তালায় আর্মি ঘাঁটি সৃষ্টি

করার জন্য যশোর ক্যান্টনমেন্টে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। ইতোমধ্যে বিপ্লবী সরকারের কাছ থেকে শান্তি কমিটির প্রতিক্রিয়াশীল দালাল সদস্যদের শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ এসেছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

তালায় মুক্তিযোদ্ধারা একটি টিম গঠন করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করল। তাদের শাস্তি কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি কমিটির সদস্যদের মাঝে ভয় ছড়িয়ে পড়ল। তারা আগের মতো নিঃশঙ্কচিত্তে সরকারের ছত্রছায়ায় মুক্তিবাহিনীর সহযোগীদের/সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করার সাহস হারিয়ে ফেলল। মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি অপারেশন ফলাও করে মুকুল ভাই 'চরমপত্রে' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যুদ্ধের ভয়ভীতি ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল এবং সাধারণ মানুষ সব ভয়ভীতির উর্ধ্বে উঠে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়াতে লাগল।

কপিলমুনি রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ

সশস্ত্রভাবে চলাচলের সময় যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, এর জন্য 'পাসওয়ার্ড' ঠিক করা হলো। এ সময়ে কপিলমুনিতে রাজাকারদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। তালায় ঘাঁটি না গাড়তে পেরে তারা বাহিনী নিয়ে তালা থানার অভ্যন্তরে বর্ধিষ্ণু পরিবার এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ এবং লুটপাট শুরু করেছে। খলিলনগরের নিজাম একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। সে সংবাদ দিল প্রায় প্রতিদিন রাজাকাররা এলাকায় ঢুকছে এবং লুটপাট করছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বাড়িঘর উচ্ছেদ করে তাঁদের বাড়ি দখল ও হত্যা করছে। নির্যাতন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এ সময় ঘোষনগরের মদনমোহন ঘোষালকে তারা নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যার পর নদীতে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে। সৈয়দ আব্দুর রব (সৈয়দ ইসার চাচা) এবং সৈয়দ কামাল বখত্ এমপি এবং আমাদের মামা তাঁরও একই পরিণতি হলো। এই ঘাঁটির পতন অতি জরুরি। ছালামের সঙ্গে পরামর্শ করে কপিলমুনি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিই আমরা।

> ইতোমধ্যে তালায় মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য সফলতার বর্ণনা দিয়ে আকাশবাণী থেকে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খবর প্রচার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মুকুল ভাই 'চরমপত্রে' মুক্তিবাহিনীর 'ক্যাচকি' মারের অসাধারণ বর্ণনা প্রচার করেছিলেন। সেখানে কামেলের দুর্দান্ত সাহসিকতার বর্ণনাও প্রচার করেছিলেন এমআর আক্তার মুকুল ভাই

এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদের আধুনিক অস্ত্রের প্রয়োজন। কামেলকে ভারতে ৯ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পাঠানো হলো। ভারত থেকে লেফটেন্যান্ট আরেফিনের নেতৃত্বে একটি মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট পাঠানো হলো কপিলমুনির রাজাকার ঘাঁটি উচ্ছেদের জন্য। যথাসময়ে লে. আরেফিন এবং কামেলের নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটির মুক্তিযোদ্ধারা যৌথভাবে কপিলমুনি রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করেন।

দিনব্যাপী এই আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। আমি ৮/১০ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ জেঠুয়াবাজারের অনতিদূরে ব্যাকআপ পজিশনে অবস্থান করছিলাম। পুরো দিন গোলাগুলি করেও কিন্তু কপিলমুনি রাজাকার ঘাঁটির পতন আমরা ঘটাতে সক্ষম হইনি। রাজাকারদের ঘাঁটি থেকে যে প্রতিরোধ করা হয়েছিল তা বিস্ময়কর। লে. আরেফিন বলল, এই রাজাকার ঘাঁটি অত্যন্ত সুরক্ষিত। এই ঘাঁটির পতন ঘটাতে হলে চারদিক থেকে আক্রমণের প্রয়োজন। এর জন্য চাই মর্টার এবং দূরপাল্লার এলএমজি। আরেফিন সাহেব ফিরে গিয়ে আরও মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন বলে আমাদের আশ্বস্ত করলেন।

আমরা কপিলমুনি ঘাঁটির পতন ঘটানোর জন্য এর পরদিন আবার আক্রমণ করব তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। জালালপুর জেঠুয়ার মাঝামাঝি স্থানে একটি এলএমজি পোস্ট পাহারায় রেখে এসেছিলাম। এর পরদিন খবর পেলাম পাক আর্মির একটি সেমিগানবোট কপিলমুনির উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। গানবোট দৃশ্যমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলএমজি থেকে গুলিবর্ষণ করা হলো। গানবোটের উপরে কয়েকজন পাক আর্মির সেপাই দাঁড়িয়েছিল। গুলিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তারা পড়ে গেল। আর তখনই গানবোট থেকে অবিরাম গুলি ছোড়া শুরু হলো।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জেঠুয়া জালালপুর শ্রীমন্তকাঠি এলাকায় গানবোট থেকে অবিরাম গুলি করে ক্ষান্ত হয়নি। অদূরবর্তী পাইকগাছা থেকে আরও সৈন্যবোঝাই লঞ্চবহর এসে নদী থেকে ডাঙায় উঠে জেঠুয়া জালালপুর শ্রীমন্তকাঠি এলাকার দোকানপাট, বাড়িঘর পোড়ানো শুরু করে এবং যাকে সামনে পেয়েছে তাঁকেই গুলি করে মেরেছে।

এর দুদিন পরেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একটি সাঁজোয়া নৌবহর তালা থানায় উপস্থিত হয়। এরপর আমাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য লে. আরেফিন ব্যবস্থা নেবেন বলে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে আমাদের সঙ্গে রেখে ভারতে চলে গেলেন। এই যুদ্ধের ফলে আমরা অনুভব করলাম আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান এবং শক্তি আরও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। একটি বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত হলাম, যতই অত্যাচার-নির্যাতন হোক না কেন, মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে অবিচলভাবে গ্রামবাসী আছেন এবং তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

রাজাকার বাহিনীতে যারা যোগ দিয়েছেন তারা গ্রামে ফেরার সাহস হারিয়েছেন। যতই দিন যাচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধারা নতুন উদ্দীপনায়, অনুপ্রেরণায় দেশকে মুক্ত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন। আমরা করব জয়, জয় আমাদের হবেই। সেদিন দূরে নয়। কপিলমুনি রাজাকার ঘাঁটি পতনের জন্য লে. আরেফিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়া সমন্বয় কমিটির একদল অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এই নিভৃত পল্লিতেও শুরু হলো আমার স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা। এই যুদ্ধের পথ ধরে দীর্ঘ নয়টি মাস কী দুরূহ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ কীভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, তার ইতিহাস যেমন বীরত্বব্যঞ্জক, তেমনই মর্মান্তিক। এই যুদ্ধের ময়দানে শহিদ হয়েছেন আমার ছোটো সহোদর কামেল বখত্ এবং বড়ো ভাই মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনার বেদার বখত্, সহযোদ্ধা শংকর, আজীজ, সুশীল, বক্কর, আবুলসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করেছে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা। অবশেষে জয়ী হয়েছে মুক্তিকামী মানুষ।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা; সাংবাদিক ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী

বারবার ফিরে যাই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোয়

আব্দুল কাইয়ুম

কখনো কোনো জটিল সমস্যায় পড়লে মনে মনে ফিরে যাই পাটন ক্যাম্পে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে প্রত্যন্ত সেই পাটন গ্রাম। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিল তিন-চারজনের একটি টিম। আমাদের বিশেষ গেরিলাবাহিনীর মূল নেতৃস্থানীয় কর্মী। তাঁদের একজন আমি। অনেক সময় মনে হয়, আমার সারাজীবনের চেয়েও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বেশি দামি। বেশি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সেই আগুনঝরা দিনগুলো আমাকে নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করে।

একই সঙ্গে অবধারিতভাবে চোখে ভেসে ওঠে একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠের সেই ঘোষণা, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা–একেবারে এক সুতোয় গাঁথা। তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু লিখতে হলে প্রথমেই শুরু করি সেই ৭ মার্চের কথা দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা আন্দোলন, উনসত্তরের ১১ দফার আন্দোলন, ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান, ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যা–কোনোটাই বিচ্ছিন্ন কিছু না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনের স্রোতধারা আমাদের নিয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধে। নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লাখ শহিদের আত্মদানে সিক্ত স্বাধীনতা আমরা ছিনিয়ে এনেছি।

আব্দুল কাইয়ুম

একাত্তরের মার্চেই আমরা বুঝে গিয়েছি যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ আসন্ন। কারণ পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির কোনো অধিকার মেনে নেবে না। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা। কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। প্রফেসর মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপের সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

ছাত্র-জনতাকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলাই ছিল আমাদের সব কাজের মূল লক্ষ্য। আমরা চিন্তা করি– যদি প্রয়োজন হয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রথমে একটা নিরাপদ পশ্চাদ্‌ভূমি বা 'সেফ রিয়ার' লাগবে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় লাগবে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম প্রয়োজনে ঢাকার কাছাকাছি আগরতলায় আমাদের সেফ রিয়ারের সন্ধানে যেতে হবে। তাই সেখানে যাওয়ার নিরাপদ রুট সম্পর্কে যোগাযোগ স্থাপনে আমাদের ছাত্র ও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কিছু কাজ শুরু করি।

মুক্তিযুদ্ধ একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা।

একাত্তরের মার্চের দিনগুলো ছিল অবিশ্বাস্য রকম অস্থির। কিন্তু মানুষের মধ্যে ছিল দৃঢ়প্রত্যয়। প্রতিটি মানুষ স্বাধিকার আদায়ে স্থির প্রতিজ্ঞ। ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে। শুরু হয় মিছিল। স্রোতের মতো মানুষ চলেছে পল্টন ময়দানের দিকে। হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক চলছিল। সবাই অধীর আগ্রহে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের অপেক্ষায়। এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি দিলেন। হরতাল, শোক দিবস ও ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা।

এরপর মানুষ আর থেমে থাকেনি। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মিছিল হতে থাকে। গভীর রাত পর্যন্ত চলত সেসব মিছিল। ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তান সরকার কারফিউ জারি করে। কিন্তু মিছিলে মিছিলে কারফিউ ভেসে যায়।

আমাদের বাসা ওয়ারীতে। ২ মার্চ গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। শুনি বঙ্গবন্ধুর নামে স্লোগান দিয়ে মিছিল বেরিয়ে পড়েছে। কে নেতৃত্ব দিচ্ছে, কেউ জানে না। স্লোগান ছিল, 'জাগো, জাগো, বাঙালি জাগো', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জয় বাংলা'। এসব স্লোগান শুনলে মুহূর্তে রক্ত গরম হয়ে উঠত। মিছিলটি আসছিল নারিন্দার দিক থেকে। যাচ্ছিল প্রেসিডেন্ট হাউসের দিকে (বর্তমানে বঙ্গভবন)। পথে পথে গভীর রাতের ঘুমভাঙা মানুষ মিছিলে যোগ দিচ্ছিল। আমিও মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। কিন্তু কোনো কারণে মিছিলের গতিপথ একটু ঘুরে যায়। হয়তো সামনে কোনো সেনা টহল জিপ ছিল। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য হয়তো মিছিল ফোল্ডার স্ট্রিট ধরে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বার্স্ট ফায়ারের শব্দ শুনি। জয়কালী মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোনায় রাস্তার মোড়ে একটি সামরিক যান থেকে পাকিস্তানি সেনারা মিছিলটিতে একেবারে সামনে থেকে গুলি করে। অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

পরদিন সকালে আমরা সেখানে যাই। রক্তচিহ্ন দেখতে পাই। এরপর বহুবছর নাম না-জানা শহিদদের স্মরণে সেখানে অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ ছিল। পরে একটি ছোটো স্মৃতিচিহ্ন সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে।

মার্চের সেই দিনগুলোয় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় এরকম অনেক মিছিল বের হতো। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে সেসব মিছিল বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো এগিয়ে যেত। কারফিউ ভেঙে। মেশিনগানের গুলির সামনে মানুষ বুক পেতে দিত। সেসময় পুরো শহর মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। ঢাকার বাইরেও অনেক শহরে এরকম মিছিল চলে। অগণিত শহিদের বুকের রক্তে পাড়া-মহল্লার বিভিন্ন সড়ক-মোড় রঞ্জিত হয়। সবাই ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অপেক্ষায় থাকে।

একাত্তরের ৭ মার্চ সকাল থেকে মানুষ রেসকোর্স ময়দানের দিকে আসতে শুরু করে। ঢাকার বাইরে থেকেও মানুষ আসে। দুপুরের আগেই মাঠ ভরে যায়। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি, ... তোমাদের যার যা আছে...'। এই কথাগুলোর মধ্যে তিনি স্বাধীনতাসংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। আর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নির্বিচারে গুলি ছোড়া ও হত্যার বিচার করতে হবে।

তাঁর পুরো ভাষণটি ছিল গণতন্ত্রের পরিসীমার মধ্যে; কিন্তু স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়ার আহ্বানে উদ্দীপ্ত। শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন।

২৫ মার্চ কালরাত্রির কথা মনে পড়লে আজও শিহরিত হই। সেদিন বিকালেই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাঙ্ক নামাবে। বিকালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের একটি সমাবেশ ছিল। প্রতিদিন বিকালে এ রকম সমাবেশ হতো। দুপুরে রাজপথে ডামি (কাঠের) রাইফেল নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত অনুশীলন হয়েছে। শত্রুর মোকাবিলার একটা প্রস্তুতি চলছিল। এর মধ্যে খবরটা আসে। আমরা সবাইকে বলি যার যার এলাকায় গিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে।

সন্ধ্যায় মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ (বর্তমানে সিপিবির সভাপতি) আমরা কয়েকজন হাতিরপুলের দিকে যাই। সেখানে দেখা হয় পঙ্কজ ভট্টাচার্য (সেসময় ন্যাপ নেতা), ওসমান গনি (প্রয়াত সিপিবি নেতা)-সহ আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে। আমরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে মিলে স্থানীয়ভাবে কিছু প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিই। যদিও আমরা তখনও বুঝতে পারিনি কী বিভীষিকাময় রাত অপেক্ষা করছে।

হাতিরপুলে যাওয়ার একটা কারণ ছিল। ওই এলাকার কাছেই পাকমোটরকে (বর্তমানে বাংলামোটর) কেন্দ্র করে কিছু প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা আমাদের ছিল। সেজন্যই সেখানে যাই। অবশ্য পরে দেখা গেল, পাকিস্তানি বাহিনী যে বীভৎস গণহত্যা শুরু করে, সেই তুলনায় আমাদের প্রস্তুতি ছিল একেবারেই নগণ্য। তাদের নৃশংস রূপটি দেখে আমরা দ্বিগুণ প্রতিরোধস্পৃহা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সেই সময় পাকিস্তানি বাহিনীর চোখের আড়ালে থেকে আমাদের নেতৃত্ব দিতেন প্রয়াত সিপিবি নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিকসহ সিপিবি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের মূল নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় টিম। মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রমুখ সিপিবি ও ন্যাপ নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে প্রস্তুতি চলছিল।

পাকমোটর মোড়ের সামান্য উত্তরে একটা কালভার্ট ছিল। যদি পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা আক্রমণ করতে আসে, তাহলে সেই কালভার্টটি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া এবং ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকের রাস্তা কেটে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনীর গতিরোধ করার একটা পরিকল্পনা আমাদের ছিল। সেটা মাথায় রেখে আমরা হাতিরপুলে গিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এ সময় কিছু তরুণ রাস্তায় সমবেত হয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে সবাইকে জানায় যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে রুখতে যার যার পাড়া-মহল্লায় স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

সেন্ট্রাল রোডে ছিল প্রয়াত শিল্পী কামরুল হাসানের বাসা। তিনি এগিয়ে আসেন। হাতিরপুল এলাকায় থাকতেন আওয়ামী লীগ নেতা কালু চৌধুরী। আমরা সবাই মিলে বৈঠকে বসি। ঠিক হয় পরীবাগের মোড়ে রাস্তা কেটে ফেলা হবে, যেন পাঞ্জাবি সেনারা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ট্যাঙ্ক-জিপ নিয়ে যেতে না পারে। কালভার্ট উড়িয়ে দেওয়ার বিস্ফোরক পাওয়া গেল না। তবে আমরা কিছু বোতলে পেট্রোল ও সিসার টুকরা ভরে মলোটভ ককটেল বানালাম। হাতিরপুলের পশ্চিম পাশের রাস্তাটি কেটে ফেলার পরিকল্পনাও হয়।

তখন রাত ১০টা হবে। কয়েকজন তরুণ শাবল নিয়ে পরীবাগের মোড়ে চলে যায়। আরেকটি দল যায় এলিফ্যান্ট রোডের দিকে। তারা রাস্তা কাটা শুরু করে। আমরা কয়েকজন হাতিরপুলের ঠিক মোড়ে একটা চারতলা বাড়ির ছাদে মলোটভ ককটেলগুলো সাজিয়ে রাখতে শুরু করি। আমাদের সেই তারুণ্যে উদ্ভাসিত চোখেমুখে তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারিকমিউনের 'স্ট্রিট ফাইটের' বিপ্লব! আমরা ভাবছি পাঞ্জাবি বাহিনীর ট্যাঙ্ক এলে ছাদ থেকে ককটেল ছুড়ে তাদের পরাস্ত করব। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব!

কিছুক্ষণ পর পরীবাগের দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। এর পরপরই সেই তরুণরা, যারা পরীবাগের রাস্তা কাটতে গিয়েছিল, চোখেমুখে ভয় নিয়ে ফিরে আসে। তারা জানায়, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যাওয়ার পথে রাস্তা খুঁড়তে দেখে একটি জিপ থেকে সেনারা গুলি করে দুই তরুণকে হত্যা করেছে। একের পর এক ট্যাঙ্ক আসছে দেখে ওরা ফিরে এসেছে। এর পরপরই থেমে থেমে মর্টার শেলিংয়ের শব্দ শুনি। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের উপর থেকে ট্রেসার বুলেট ছুড়তে দেখি। হোটেলের বিপরীত পাশের গলিতে ছিল দ্য পিপল পত্রিকার অফিস। পত্রিকাটি ছয় দফা-এগারো দফার সমর্থনে সোচ্চার ছিল। পাঞ্জাবি সেনারা কামানের কয়েকটি গোলা ছুড়ে পত্রিকা অফিসটি ভস্মীভূত করে। এর পেছনের বস্তিতে আগুন ধরে যায়। কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মারা যায়। দূর থেকে ভেসে আসে অজস্র গুলি ও মর্টার শেলিংয়ের শব্দ। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান শুরু হয়ে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকায় নীরবতা নেমে আসে। আমরা কয়েকজন হাতিরপুল মোড়ে আমাদের একজন বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নিই। কোলে-পিঠে বাচ্চা নিয়ে বস্তির গরিব মানুষ নিঃশব্দে হাতিরপুলের বিভিন্ন বাসায় আশ্রয় নেয়।

আমরা বুঝতে পারি যে মলোটভ ককটেলে কিছু হবে না, বরং আরও বিপদ ডেকে আনবে। যে ভবনের ছাদে ওই পেট্রোল বোমাগুলো রাখা হয়েছিল, সে বাসার লোকজনও চিন্তিত। তাদের অনুরোধে সেই ককটেলগুলো নিচে নামিয়ে এক বাসার উঠোনে গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দিয়ে রাখি। লোকজন রাস্তা থেকে সরে যায়। সবাই মনে মনে ঠিক করে ফেলি যে পাকিস্তানি বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য ভিন্ন কৌশলে অগ্রসর হতে হবে। বুঝতে পারি আমাদের এতদিনের অনুশীলনের ডামি রাইফেলের পরিবর্তে আসল রাইফেল হাতে নেওয়ার সময় এসেছে।

সারারাত গোলাগুলি চলতে থাকে। পরের দিন কারফিউ ছিল। বিকালে একটি ট্যাঙ্ক আসে। সেনারা নেমে নির্বিচারে গোলাগুলি করে কয়েকজনকে হত্যা করে। এর পরদিন সকালে কিছুক্ষণের জন্য কারফিউ উঠিয়ে নিলে আমরা বেরিয়ে পড়ি। ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল), জগন্নাথ হল ঘুরে শহিদ মিনারে যাই। সবখানে লাশ আর লাশ। আমরা জানতে পারি ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। শুরু হয় আমাদের প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে বিতাড়িত করতে হবে। নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে দখলদার সেই পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা বিজয় অর্জন করি।

মুক্তিযুদ্ধ করতে হলে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কথা আমি আগেই বলেছি। সেই অনুযায়ী আমরা প্রথমে যাই আগরতলায়। সেখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই-এর কিছু প্রস্তুতি ছিল। এরপর সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা বিশেষ গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলব। এজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের সহযোগিতায় আসামের এক দুর্গম এলাকায় আমাদের গেরিলাদের সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হয়। আমাদের একটি অংশ চলে যায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে মালদা, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে স্থাপিত আমাদের কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প পরিচালনার জন্য আমাদের কয়েকজনের ওপর দায়িত্ব পড়ে। আমাদের মূল হেডকোয়ার্টার ছিল কলকাতায়। সেখানে ন্যাপ-সিপিবি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলাবাহিনীর মূল নেতৃত্ব অবস্থান করতেন। আগরতলায় ছিল পূর্বাঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার হেডকোয়ার্টার।

আগেই বলেছি গঙ্গারামপুরে পাটন ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলাম আমি। আমাদের ক্যাম্পের মাত্র তিন-চার মাইল দূরেই সীমান্ত। প্রতিরাতেই গেরিলারা পাকিস্তানি বাহিনীর টহলের মধ্যেও কৌশলে বর্ডার পার হয়ে বাংলাদেশের ভেতরে যেতেন। ছোটোখাটো অপারেশন করতেন। আবার ফিরে আসতেন। তবে তাঁদের ছিল শুধু প্রাথমিক ট্রেনিং। আমাদের ক্যাম্পের পাশেই স্থাপিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প থেকে সেনা সদস্যদের সহযোগিতায় আমাদের ক্যাম্পের সদস্যদের কেউ কেউ ট্রেনিং নিতেন। তবে আমাদের এক মাসের আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং হতো আসামে। কয়েক মাস পরপর সেখানে আমরা ট্রেনিংয়ের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠাতাম। দেশের ভেতরে অপারেশনের জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ইনডাকশনের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মূলত ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় থেকে আমাদের ক্যাম্পে তরুণরা আসত। বলত দেশের ভেতর পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কথা। ওরা দ্রুত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠত। তবে তাদের আমরা প্রথমে বাছাই করতাম। বিশেষত রাজনৈতিক দিক থেকে ওদের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিয়মিত আলোচনা ক্লাসের ব্যবস্থা করতাম।

একদিন আমাদের ক্যাম্পে তিনজন তরুণ আসে। শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে তাদের অপারেশনের কথা বলে। সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামগুলোয় রাতে পাঞ্জাবি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনী টহল দিত। তারা জানত প্রতিরাতে সীমান্তবর্তী এলাকার ক্যাম্পগুলো থেকে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা এসে অপারেশন চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী টহল দেওয়ার সময় রাতে কাউকে দেখলে চ্যালেঞ্জ করে পাসওয়ার্ড

জানতে চাইত। কারণ, পাকিস্তানি বাহিনীর অন্য আরও কয়েকটি দল প্রতিরাতে ঘুরে ঘুরে টহল দিত। তাই সেইম-সাইড যেন না হয়, সেজন্য এ ব্যবস্থা। পাসওয়ার্ড প্রতিরাতে বদলানো হতো। সেই তিন গেরিলা বন্ধু কৌশলে একেক রাতের পাসওয়ার্ড জেনে নিত। এজন্য একটি বিশেষ চ্যানেল ওরা তৈরি করে নিয়েছিল। সেটা ছিল ওদের 'লিকআউট পাসওয়ার্ড লিংক'।

এক রাতে পাসওয়ার্ড ছিল 'আপনা আদমি'। এটা জানার পর তিন গেরিলা বন্ধু গভীর রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আস্তানার দিকে রওয়ানা হয়। কাছাকাছি যেতেই পাকিস্তানি বাহিনীর কয়েকজন সেপাই হুংকার দিয়ে ওঠে 'হ্যান্ডস আপ! কোন হ্যায়?' ওরা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় 'আপনা আদমি'! পাসওয়ার্ড শুনে যেই না সেপাইরা তাদের অস্ত্র নামায়, অমনি ওরা তিনজন ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্স্ট ফায়ারে পাকিস্তানি বাহিনীর অন্তত পাঁচজনকে সাবাড় করে ক্যাম্পে ফিরে আসে।

তাদের বুদ্ধিদীপ্ত অপারেশনের কথা গভীর রাত পর্যন্ত আমরা শুনেছিলাম। সেই রাতটি এখনো স্মরণীয় হয়ে আছে।

কিছুদিন পরপরই গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী এসে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিত, তরুণদের দেখলেই 'তুম মুক্তি হ্যায়' বলে ধরে নিয়ে যেত। অত্যাচার করে মেরে ফেলত। তাই পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশনের খবর গ্রামের লোকজন আগে থেকে জানতে পারলে মা-বাবারা সব তরুণকে আমাদের ক্যাম্পগুলোয় পাঠিয়ে দিতেন। তরুণরাও খুশি। বলত, জীবন দিতে হলে মুক্তিযুদ্ধে জীবন দেব, তবু পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে হার মানব না। এদের অনেকের বয়স ছিল কম। হয়তো ১৫–১৬ বছর। কিন্তু ওরা ট্রেনিং নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। এরকম একটি ঘটনার কথা আজও মনে পড়ে।

অক্টোবর, ১৯৭১। আমাদের ক্যাম্প থেকে বাছাই করে হাজারখানেক তরুণকে নিয়ে গিয়েছি শিলিগুড়ি। রেলস্টেশনের সামনে একটা খোলা চত্বর ছিল। সেখানে তাদের সারিবদ্ধ করে অ্যাটেনশন অবস্থায় রাখা হয়েছে। তারা যাবে আসামে সশস্ত্র ট্রেনিংয়ে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সাধারণভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নাম লিখে তাদের ট্রাকে উঠাচ্ছে। সবাইকে নিয়ে ট্রাকগুলো রওয়ানা দিয়েছে। হঠাৎ দেখি এক কিশোর দৌড়ে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রাকে ওঠার চেষ্টা করছে। অন্যরা তাকে নামিয়ে দিতে চাচ্ছে; কিন্তু সে নামবে না। তার বয়স পুরো ১৪ বছর হয়নি বলে সেনা সদস্যরা তাকে গেরিলা ট্রেনিংয়ে নিতে চাননি। সে যাবেই। কান্নাজুড়ে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো একটি আইন। ১৪ বছর না হলে তো যুদ্ধে যাওয়া যাবে না। আবার ওদিকে আরেক ঘটনা শুরু হয়ে গেছে। সেই কিশোরকে নিচ্ছে না বলে অন্য আরেকটি আর্মি ট্রাক থেকে দুজন তরুণ লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। ওরা বলছে ওরা তিন ভাই একসঙ্গে ট্রেনিংয়ে যাবে। সামরিক ট্রাকগুলোর সামনে ওরা বুক পেতে শুয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ওই কিশোর-তরুণদের আবেগের কাছে আমরা হার মানলাম। আমাদের বিশেষ অনুরোধে সেই কিশোরকেও গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য নেওয়া হলো।

হঠাৎ দেখি এক কিশোর দৌড়ে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রাকে ওঠার চেষ্টা করছে। অন্যরা তাকে নামিয়ে দিতে চাচ্ছে; কিন্তু সে নামবে না। তার বয়স পুরো ১৪ বছর হয়নি বলে সেনা সদস্যরা তাকে গেরিলা ট্রেনিংয়ে নিতে চাননি। সে যাবেই। কান্নাজুড়ে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো একটি আইন। ১৪ বছর না হলে তো যুদ্ধে যাওয়া যাবে না

এভাবেই বাংলাদেশের কিশোর-তরুণ থেকে শুরু করে সবাই নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেশের ভেতর যারা ছিলেন, তারাও যে যার অবস্থান থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। দখলদার বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। অগণিত নিরীহ মানুষকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। নারীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। পদে পদে প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি সেনারা শেষ পর্যন্ত পরাজয় মানতে বাধ্য হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় সম্পর্কে আমরা সব সময়ই আশাবাদী ছিলাম। একাত্তরের নভেম্বরের শেষদিকেই সীমান্ত এলাকায় আমরা বুঝতে পারি যে বিজয় আসন্ন। মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মিলে একের পর এক সফল অপারেশন চালাতে থাকে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী টিকতে পারে না। যৌথ বাহিনীর আক্রমণের মুখে পিছু হটতে থাকে। একের পর এক শহরে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর পতন ঘটতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের হত্যাযজ্ঞের দোসর রাজাকার-আলবদর বাহিনীর সদস্যরা আত্মসমর্পণ করতে থাকে। দেশের ভেতর মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন কাজ শুরু করে দেয়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর মিলিত যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্যকে বন্দি করা হয়। শুরু হয় সারাদেশে বিজয়োৎসব। বাঙালির জীবনে এত বড়ো আনন্দের দিন আর হয় না।

মাত্র নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাঙালি খালি হাতে যুদ্ধ শুরু করে এত অল্প সময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। সারাদেশের মানুষ যখন এক হয়ে বিদেশি দখলদার বাহিনীকে দেশ থেকে তাড়াতে চায়, তখন বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি ন্যায্য সংগ্রাম। সেজন্যই ভারত আমাদের সাহায্য করেছে। সাহায্য করেছে সেসময়ের অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। সেজন্যই আমরা খুব দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি।

স্বাধীনতাযুদ্ধে আমরা হারিয়েছি আমাদের স্বজনদের। বাংলাদেশে এমন কোনো পরিবার হয়তো পাওয়া যাবে না যাদের কোনো না কোনো একজন মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হননি। এই ডিসেম্বরে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অমর শহিদদের। একই সঙ্গে আমরা সবাই ভাগ করে নিই বিজয়ের আনন্দ।

প্রতিবছর ডিসেম্বরে আমি ফিরে যাই বঙ্গবন্ধুর কাছে। মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের সেই পাটন ক্যাম্পের স্মৃতির কাছে।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা; সহযোগী সম্পাদক, প্রথম আলো

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে অভিন্ন সত্তা হিসেবেই মনে করি

কামরুল ইসলাম খান

কলেজে পা দিয়েই আমি ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। ঐতিহ্যবাহী ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ দিয়েই আমার রাজনীতি শুরু। ১৯৬৬ সালে সাতক্ষীরা কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ার সময়ই ছাত্রলীগের মাধ্যমে স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করি। '৬৭ সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয়-দফা দিবস (৭ জুন) পালন করতে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সাতক্ষীরা শহরে আমরা মিছিল করি। সেখান থেকে অন্যদের সঙ্গে গ্রেফতার হই। এরপর স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামের আরও সামনের কাতারে চলে আসি। এরই ধারাবাহিকতায় উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করি। এ সময়েও গ্রেফতার হয়ে জেলে যাই।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেমন এগিয়ে চলি, তেমনই অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বিশেষত মাস্টারদা সূর্যসেনের জীবনসংগ্রামেও উদ্দীপনা পাই। '৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা সীমান্ত শহর সাতক্ষীরা এসে তাঁবু গাড়ত। আমাদের কলেজের পাশের মাঠে ওরা একবার ক্যাম্প করে। আমি কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে ওদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে মনস্থ করি। কলেজের প্রিন্সিপালের অনুমতি সাপেক্ষে ওরা প্রশিক্ষণ দিতে রাজি হয়। সপ্তাহ দুইয়ের প্রশিক্ষণে আমরা অনেক হালকা অস্ত্র চালানো শিখি, যা পরে যুদ্ধের সময় কাজে আসে।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর ছাত্রলীগের তৎকালীন সাতক্ষীরা মহকুমার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাই। সত্তরের নভেম্বরে এক ভয়াবহ সাইক্লোন দেশের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে। কয়েক সহকর্মীকে নিয়ে আমি সাতক্ষীরা কলেজের ছাত্রদের পক্ষে রিলিফ নিয়ে পটুয়াখালীর খেপুপাড়া,

ছোটো বাইজাদিয়া, বড়ো বাইজাদিয়া ও মহীপুর যাই এবং ত্রাণ বিতরণ করি।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেও ক্ষমতায় আসতে না পারায় নানা উদ্‌বেগ দেখা দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনতে হতে পারে–এ চিন্তাও দেখা দেয়। এপর্যায়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সাতক্ষীরায়ও আমরা মহকুমা শাখা গঠন করি। সাতক্ষীরা ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সাতক্ষীরা শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব পাই।

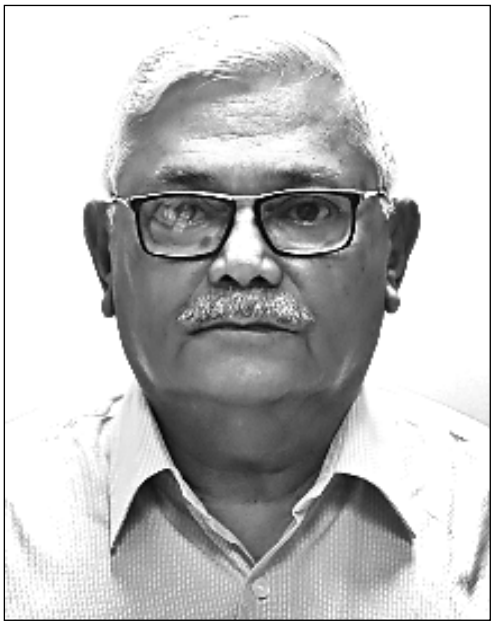

কামরুল ইসলাম খান

এ সময় আমরা ছাত্র-যুবাদের আরও বড়ো ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে থাকি। আমরা বা মু বা (বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী) ও মু স (মুক্তি সংঘ) ছদ্মনামে গোপনে তৎপরতা চালাতে থাকি। শহরে ব্যাপক পোস্টারিংয়ের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই।

৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক আমাদের আলোড়িত করে। সারা মহকুমায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শাখা করতে আমরা ইউনিয়নে ইউনিয়নে যাই। এরই মধ্যে আসে ২৩ মার্চ। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ দিনটিকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন দিবস হিসেবে নির্ধারণ করে। সে মোতাবেক সাতক্ষীরা শহরের পাকাপোলের মোড়ে আমিও প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওঠাই।

২৫ মার্চ বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাদের নিধনযজ্ঞের খবর আমরা পাই আকাশবাণী ও বিবিসি মারফত। তখন আমরা শ্যামনগর উপজেলার পাতাখালি নামক সুন্দরবন সংলগ্ন একটি এলাকায়। পাকিস্তান সরকার এর মধ্যে বেসামরিক নাগরিকদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আমরা সাতক্ষীরা ফেরার পথে অস্ত্র জমা দিতে আসা অনেককে নিবৃত করি। ২৫ মার্চের পর যশোর ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি-পাকিস্তানি সেনা লড়াই শুরু হয়ে যায়। একপর্যায়ে তা সেনানিবাসের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। সাতক্ষীরা শহরের পাকাপোলের মোড়ে পরিচ্ছদ বস্ত্রবিতানের পাশে ছিল কুড়ন ময়রার রেস্টুরেন্ট। আমরা কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী সেখানে বসতাম। ইপিআর ক্যাম্পের পাশে বাড়ি হওয়ার সুবাদে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় ছিল। সীমান্ত অঞ্চলের বিওপিতে পোস্টিংয়ে থাকা অনেক সুবেদার, হাবিলদার আমাদের ওখানে সেসময় আসেন। ওরা যশোরে যুদ্ধে যোগ দিতে আগ্রহ দেখালেন। আমরা দায়িত্ব নিলাম ওদের পাঠানোর। কয়েকটা বাস-ট্রাক জোগাড় করে আমরা ওদের সীমান্ত এলাকা থেকে আনার ব্যবস্থা করলাম। আমরা দুজন করে কর্মী একেক গাড়িতে দিলাম। বিভিন্ন বিওপিতে গিয়ে ওরা ইপিআরদের একত্রিত করে সাতক্ষীরা শহরের ক্যাম্পে জড়ো করল। বলাবাহুল্য, বিভিন্ন বিওপিতে অবাঙালি যারা ছিল, তাদের হত্যা করা হলো। তারপর ওদের সেনানিবাস এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম।

যশোরে যুদ্ধের বিস্তৃতির খবরে কলকাতা থেকে অনেক সাংবাদিক আসা শুরু করেন। হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার রিপোর্টার মানস ঘোষ (দীর্ঘদিন সম্পাদক থাকার পর ইতোমধ্যে তিনি অবসরে গেছেন) এক ফটোগ্রাফার ও এক সঙ্গী নিয়ে সাতক্ষীরা আসেন। বাড়িতে নিয়ে ওনাদের খাবার এবং জেলা পরিষদের ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করি। যশোর পাঠানোর কোনো গাড়ি না পেয়ে ওনাদের ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতে করে পাঠাই। এ সময় ভারত থেকে অনেক ত্রাণসামগ্রী আসতে শুরু করে। এগুলো গ্রহণ ও বি-লবণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় অপব্যবহার হতে থাকে। সাতক্ষীরার ভোমরা সীমান্তে জনশূন্য কাস্টমস অফিসে আমরা ত্রাণসামগ্রী গ্রহণের অফিস চালু করি। পরে একটি পিকআপ ভ্যান সংগ্রহ করে ত্রাণসামগ্রী যশোর অঞ্চলে পাঠাতে থাকি। এ অফিসই পরে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পরিণত হয়। খুলনা, যশোর ও বাগেরহাট অঞ্চল থেকে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী এখানে এসে আশ্রয় নেন। কয়েকজন আনসারের মাধ্যমে এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়। ভোমরায় ইপিআর ক্যাম্পও ছিল কাছাকাছি। পরে সবাই মিলে সাতক্ষীরায় বিভিন্ন অপারেশন চালাই।

এপ্রিলের প্রথমদিকে পাকিস্তানি সেনারা সাতক্ষীরা প্রবেশ করে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারা এ সময় সীমান্তের দিকে এগোতে থাকে। আমরা স্থান ত্যাগ করে ভারত সীমান্ত গোজাডাঙ্গায় ক্যাম্প করি। পরে ভারতের ইটিনডিয়ায় বড়ো আকারে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প করা হয়। এখানে ইপিআর, মুজাহিদ, ছাত্র-যুবকসহ খুলনা, বরিশাল, যশোর অঞ্চলের বহু মানুষ যোগ দেন। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা ভোমরা সীমান্তে বড়ো অভিযান চালায়। আমরা সম্মিলিতভাবে তাদের হামলা প্রতিহত করি। কয়েকদিনের ওই যুদ্ধে কয়েক শ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এক ক্যাপ্টেনকে (এজাজ আহমদ) হত্যা করে লাশ আমাদের ক্যাম্পে আনা হয়। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন ও এসপি মাহবুব ছিলেন এ সময়ে ক্যাম্পের নেতৃত্বে।

পাইকগাছার তৎকালীন আওয়ামী লীগের এমএনএ আব্দুল গফুরের শ্বশুরবাড়ি ছিল সাতক্ষীরার ব্রহ্মরাজপুর। অগ্নিঝরা মার্চে উনি কিছুদিন ওখানে ছিলেন। আমাদের একটা যোগাযোগ ছিল। ওনার পরামর্শে আমরা সেসময় নিজেদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকি। সেসময়ই উনি বলছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে উনি একটি গেরিলা দল গঠন করবেন। ইতোমধ্যে উনি বসিরহাটে উঠেছেন। আমরা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজে নেমে পড়ি। ভারতের টাকি শহরে গিয়ে আমরা নতুন ক্যাম্প চালু করি। ওখানেই দেখা হয় মেজর জলিলের সঙ্গে। উনি তখন ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডের দায়িত্বে। ওনার কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আমরা খুলনার দক্ষিণাঞ্চল যথা: কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা, শ্যামনগর, আশাশুনি প্রভৃতি অঞ্চলে মাঝেমধ্যেই অপারেশনে যেতে থাকি। এসব অপারেশনের লক্ষ্য ছিল প্রধানত শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার, খান সেনা।

একপর্যায়ে দেবহাটার খান সেনাদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় ক্যাপ্টেন শাহজাহানের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী। আমাদের অগ্রবর্তী দল বাংলাদেশের টাউন শ্রীপুরে আশ্রয় নিয়েছিল। খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানি সেনারা ওদের ঘিরে ফেলে। সেখানেই সংঘটিত হয় টাউন শ্রীপুর যুদ্ধ। ওখানে আমাদের অনেক যোদ্ধা প্রাণ হারান। আমার ভাইপো কাজল, ভাগনে

নাজমুল শহিদ হয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধা হাবলুর শরীরে ৫টি গুলি লাগে। তাকে ও অপর এক মুজাহিদ সদস্যকে আমি তারিক আনামকে (বর্তমানে নাট্যব্যক্তিত্ব) সঙ্গে নিয়ে সীমান্তের বদরতলা হাসপাতাল থেকে কলকাতার নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি করি। রাতে অপারেশন হয়। বেঁচেও যায়।

আগেই আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছিল বিএলএফ বা মুজিববাহিনীতে যোগদানের। টাউন শ্রীপুর যুদ্ধে আমাদের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আমরা মুজিববাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য বসিরহাট যাই। পরে কলকাতায় এসে তোফায়েল ভাইয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য শিলিগুড়ি হয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দর দিয়ে দিল্লি যাই। সেখান থেকে দেরাদুনের চাক্রাতা ক্যান্টনমেন্টের টাঙুয়া বিএলএফ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে দ্বিতীয় ব্যাচে যোগ দিই। প্রশিক্ষণ এক মাসের হলেও প্রবল বর্ষণে পাহাড়ধসে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আরও এক মাস ক্যাম্পে থাকতে হয়। পরে একই পথ ধরে কলকাতা ফিরে আমরা ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান নিই। সেখান থেকে তোফায়েল আহমেদের মাধ্যমে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আমার নেতৃত্বে সাতক্ষীরা টিম দেশে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে আমরা সাতক্ষীরার বেতোডাঙ্গায় আসি। এখান থেকেই খুলনা অঞ্চলে আমরা বড়ো বড়ো যুদ্ধে অংশ নিই। এর মধ্যে তালার যুদ্ধ, পাইকগাছার যুদ্ধ ও কপিলমনির যুদ্ধ অন্যতম। কপিলমনির যুদ্ধ কয়েকদিন পর্যন্ত চলে। এখানে প্রায় দুই হাজার রাজাকারকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়।

সাতক্ষীরা মুক্ত হওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য আমরা প্রশাসনের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করি। তৎকালীন এসডিও এবং এসডিপিও'র সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে সভা করে কার্যক্রম প্রণয়ন করা হতো। ইউনিয়ন পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদেরও নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে যুদ্ধের পর সাতক্ষীরায় তেমন ডাকাতি, রাহাজানি হয়নি। বঙ্গবন্ধু দেশে আসার পর অস্ত্রসমর্পণের আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা ঢাকায় এসে অস্ত্র জমা দিই।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে যেমন আমরা অস্ত্র জমা দিই, তেমনই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামে তিনিই ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের জেলে। তাঁকে মুক্ত করতে হলে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না–এটাই ছিল আমাদের সংকল্প। ছয়-দফার জন্য মিছিল করতে গিয়ে '৬৭ সালে যখন গ্রেফতার হই, সেসময় থেকেই বঙ্গবন্ধুকে নেতা হিসেবে দেখে এসেছি। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে অভিন্ন এক সত্তা হিসেবেই বিবেচনা করি। বলতে দ্বিধা নেই–বঙ্গবন্ধু না থাকলে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেত কি না সন্দেহ। তাঁর ঋণ শোধ হওয়ার নয়।

আমার সাংবাদিকতায় প্রবেশ কাকতালীয় নয়। ছাত্রলীগের রাজনীতি করার সময় থেকেই সাংবাদিকতার চর্চা শুরু করি। '৬৭ বা '৬৮ সালে সাপ্তাহিক বাংলার বাণীতে সংবাদদাতা হিসেবে কাজ শুরু। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক খবরাখবরের সঙ্গে অন্য খবরও পাঠাতাম। স্বাধীনতার পর দৈনিক গণকণ্ঠের সাতক্ষীরা সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করি। '৭৮ সালে দৈনিক আজাদে সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দিই। পরে সিনিয়র সাব-এডিটর, শিফট ইনচার্জ ও নিউজ এডিটরের দায়িত্ব পালন করি। ১৯৯২ সালে দৈনিক জনকণ্ঠে নিউজ এডিটর পদে যোগ দিই। পড়ে চিফ নিউজ এডিটর পদে উন্নীত হয়ে দায়িত্ব পালন করে আসছি।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক

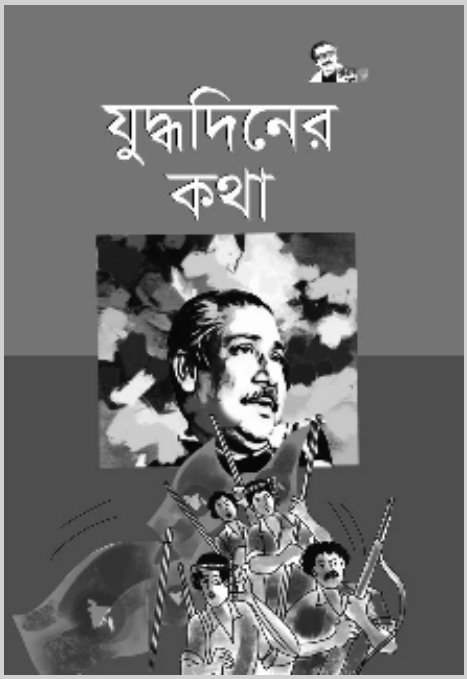

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বপ্ন ও সাহসের সেই দিনগুলো

অজয় দাশগুপ্ত

মিছিলের যাত্রা শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে। তারিখ ১ মার্চ, ১৯৭১। সময় মধ্যাহ্ন। এ অঙ্গন থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে যেসব মিছিল বের হতো, তাতে উপস্থিতি কেবলই ছাত্রছাত্রীদের। এর আগে মধুর ক্যান্টিন ছিল বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের পেছনের দিকটায়। ১৯৬৮ সালের জুলাইয়ের প্রথমদিকে ঠিক ১৮ বছর বয়সে বরিশালের গৈলা নামের গ্রাম থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসার পর থেকেই নতুন মধুর ক্যান্টিন ও কলা ভবনের অঙ্গন পরিচিত। সবার জন্য তা উন্মুক্ত। আন্দোলন যখন ব্যাপকতা লাভ করে, তখন ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দলে দলে ছাত্রছাত্রী আসে মধুর ক্যান্টিনে কিংবা বটতলায়। তারপর রাজপথে। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম দিনে আমরা বসে রয়েছি মধুদার ক্যান্টিনে। তিনি চায়ের ব্যবস্থা করছেন ছাত্রনেতাদের জন্য। একজন ছাত্র দুপুর ১টা ৬ মিনিটে এসে ক্ষোভের সঙ্গেই বলল, 'ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছে।' সে নিজেই রেডিয়োতে শুনেছে। যেন এজন্যই সবার অপেক্ষা। ক্যান্টিনে উপস্থিত শ দুয়েক ছাত্রছাত্রী মুহূর্তে স্লোগানে মুখর হয়ে উঠল। কোনো বক্তৃতা নেই। মিছিল চলল কলা ভবনের দিকে। 'পাকিস্তানে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো'– এই স্লোগানই বেশি ধ্বনিত হচ্ছিল। 'জিন্না মিয়ার পাকিস্তান আজিমপুরের গোরস্তান', 'ইয়াহিয়া-ভুট্টো ভাই ভাই এক রশিতে ফাঁসি চাই'–এমনই আরও কত স্লোগান। এতদিনের পরিচিত স্লোগানের চেয়ে যা একেবারেই ভিন্ন। একটি মিছিল বের করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। 'এপসু' নামেও এ সংগঠনের পরিচিতি। এদিন তাদের মিছিল থেকে কারও কারও কণ্ঠে শোনা গেল 'জয় বাংলা' ধ্বনি।

অজয় দাশগুপ্ত

১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলোয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান দিতে শুরু করে। মধুর ক্যান্টিনে সে সময় মাঝেমধ্যে সব ছাত্র সংগঠনের যৌথ কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হতো। এ ধরনের একটি সভায়ই জয় বাংলা ধ্বনি প্রথম প্রকাশ্যে উচ্চারিত হতে শুনি এবং স্লোগান অবিশ্বাস্য দ্রুততায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

জয় বাংলা ধ্বনি তোলা হয়েছে সচেতনভাবে এবং এর পেছনে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন কাজ করেছিল, সন্দেহ নেই। সে সময়ে ছয়-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিটিই মূলত সামনে আসে। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন, ছয়-দফা হচ্ছে সেতু, যা পার হয়ে যেতে হবে স্বাধীনতার পথে।

একাত্তরের ১ মার্চ সব সীমানা মুছে যেতে থাকে। সব বাঙালি এক হয়ে যায় একটি মহৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। মধুর ক্যান্টিন থেকে বের হওয়া ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলটি কলাভবন হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের বাসভবনের পাশ দিয়ে ফুলার রোড ধরে শহিদ মিনারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখা গেল রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয়–এমন অনেক ছাত্রছাত্রী শামিল হয়ে গেছে। রাজপথ থেকে শামিল অছাত্ররাও। নানা বয়সের নানা পেশার মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষকরা। শামিল হয়েছে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিতরাও। ক্রমে তাদের সংখ্যাই বেশি হয়ে গেল এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকল।

একাত্তরের ১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন থেকে বের হওয়া মিছিলটি শেষ পর্যন্ত মিশে যায় বায়তুল মোকাররম-পল্টন-মতিঝিলের পূর্বাণী হোটেল এলাকায়। গোটা রাজপথ লোকে লোকারণ্য। পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে সভা করছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছাত্র-জনতা তাঁর কাছ থেকেই নির্দেশনা পেতে চায়। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তিনি।

স্বতঃস্ফূর্ত জনতার অংশগ্রহণ বলতে যা বোঝায়, সেদিন সেটাই ঘটেছিল। কত মিছিল যে কত দিক থেকে এসেছে, কেউ তাদের সংগঠিত করে আনেনি। সাধারণত বড়ো জনসভা বা মিছিলে যেভাবে ট্রাক-বাসে করে লোক সমাগম ঘটানো হয়, ১ মার্চ দুপুরে এর প্রয়োজন পড়েনি। পল্টনের স্টেডিয়ামে সেদিন একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ ছিল। গ্যালারির দর্শকরাও নেমে আসে রাজপথে। স্বাধীনতার মিছিলে শরিক থাকতে পারা যে জীবনে পরম পাওয়া। খেলাধুলাই যাদের ধ্যানজ্ঞান, তাঁদের অনেকে জীবনে প্রথমবারের মতো রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। কেউ কেউ তো খেলার মাঠ থেকে সরাসরি রণাঙ্গনে চলে গেল।

একই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রকম্পিত হয়েছিল শতসহস্র শহর-বন্দর-গ্রাম। এসবে কত মানুষ অংশ নিয়েছিল, কেউ হিসাব রাখেনি। সংবাদপত্রেও প্রকাশ হয়নি বেশির ভাগ মিছিল-সমাবেশের খবর। ১ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের বিষয়ে বেতারে মাত্র কয়েকটি শব্দের ঘোষণার পর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে যত মানুষ রাজপথে নেমে এসেছে, তা গিনেস বুক রেকর্ডের পাতায়ও স্থান পেতে পারে। এমন দিনের জন্য বাংলাদেশের জনগণ প্রস্তুত হয়েই ছিল। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির অবদান ছিল অনন্যসাধারণ। বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তাঁরা চেয়েছে এবং এর প্রেক্ষাপট তৈরি করার জন্য দিনের পর দিন নিরলস কাজ করেছে।

কত লোক এসেছিল একাত্তরের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স নামে পরিচিত সুবিশাল ময়দানে? বঙ্গবন্ধু সেই পড়ন্ত বিকেলে দেশের অন্য সব নেতার তুলনায় নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। তিনি লিখিত ভাষণ দেননি। ভাষণে যেসব শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন, এর বিশ্লেষণ চলছে দশকের পর দশক এবং আরও বহুকাল চলতে থাকবে। তিনি বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আরও বললেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি, আমার সহকর্মীরা যদি না থাকে...।' এমন পরিস্থিতিতেও জনতার কী করণীয়, সেটা বলে দিলেন।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য লাখ লাখ মানুষের দলে ছিলাম আমিও।

২৫ মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যার নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য কুখ্যাত অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পর নবজাত বাংলাদেশের মানুষ করণীয় নির্ধারণে মুহূর্ত সময় নেয়নি। তারা অস্ত্র তুলে নেয়, প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে প্রতিষ্ঠা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। তাদেরই আয়োজনে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানায় শুরু আমার সামরিক ট্রেনিং। এখানে পৌঁছাতে হয়েছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী অধ্যুষিত মৃত্যুপুরী অতিক্রম করে। কিন্তু মাতৃভূমিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র হয়ে উঠব–এ স্বপ্নপূরণ হওয়ায় সব যন্ত্রণা-কষ্ট ভুলে যাই। সেখানে প্রায় ১৭ শ মুক্তিযোদ্ধা পৌঁছে গেছে। শেষরাতে বাঁশি বাজল হাতমুখ ধোয়া ও ল্যাট্রিনে যাওয়ার জন্য। ঠিক ৬টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে ফল-ইনের নির্দেশ। ল্যাট্রিন মানে ছেঁড়া-ফুটা চটে ঢাকা একটি বড়ো গর্তে দুই টুকরা গাছের ডাল ফেলা। আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া মগে পানি নিয়ে সবাই ছুটছে ল্যাট্রিনের দিকে। সেখানেও লাইন। নোংরা পরিবেশের কারণে দাঁড়িয়ে থাকাও চরম অস্বস্তির। একসময়ে আমি চটের ঘের দেওয়া কাঁচা ল্যাট্রিনে ছোটো মগে জল নিয়ে প্রবেশের সুযোগ পেলাম। ওই অপরিচ্ছন্ন মগটি নিয়েই দাঁড়িয়ে যাই চায়ের লাইনে। লিকার চায়ের সঙ্গে মিলল এক টুকরো পাউরুটি। ওখানে অবস্থানকালে প্রতিদিন এটাই করতে বাধ্য হয়েছি। তবে এ জীবন তো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্বাভাবিক নয়। জীবনের সব প্রয়োজন মিটিয়ে সবকিছুর সুব্যবস্থা করে কে কোথায় স্বাধীনতা সংগ্রামী হতে পেরেছে?

একাত্তরের ছাত্র-তরুণরা কমান্ড মানতে এবং এজন্য যে কোনো কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত, তার প্রমাণ মিলল একটু পরেই। আমরা কয়েকজন কমান্ডারকে অনুসরণ করে জলাভূমি ও পাহাড়ি পথ ধরে ছুটে চললাম মাইল তিনেক দূরে ট্রেনিং সেন্টারে। পরের তিন সপ্তাহ এ পথে রোজ যাওয়া-আসা।

দুপুরে একই পথে ফিরে আসি খাবার খেতে। বিকালে একই স্থানে যেতে হতো ট্রেনিংয়ের জন্য। ভারতীয় সিপাহিদের একটি বিস্ময়

ছিল–একবার শুনেই আমি কী করে সেটা মনে রেখে অন্যদের বোঝাতে পারি।

আমাদের এসএলআর, লাইট মেশিনগান ও স্টেনগান চালানোর ট্রেনিং দেওয়া হলো। বিস্ফোরক ব্যবহারও জানলাম। বিস্ফোরকে সেতু, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রেললাইন– এসব ধ্বংস করার কৌশল শেখানো হয়। লাইট মেশিনগান ট্রেনিংয়ের একটি অংশ ছিল খোলা ও জোড়া লাগানো। হিন্দিতে বলা হতো খোলনা ও জোড়না। আমি বেশ দ্রুতই সব ধরনের অস্ত্র চালনা শিখে যাই। লাইট মেশিনগান খোলা ও জোড়া লাগানোর পরীক্ষায় প্রথম হই।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়ি। আমাদের প্রশিক্ষক ভারতীয় সেনাদের প্রশ্ন–এত লেখাপড়া জানা যুবক কেন ট্রেনিংয়ে এসেছে? এত বিপুলসংখ্যক বাঙালি অস্ত্র হাতে পাওয়ার জন্য দেশ ছেড়ে অন্য দেশে এসেছে–এটাও তাদের কাছে অভাবিত বিষয় ছিল।

ট্রেনিং চলে ২১ দিন। শেষদিন ওস্তাদদের বলি, স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে স্বাগত জানাতে চাই খুব দ্রুত।

জীবনে আনন্দের সময় এসেছে অনেক। তবে পালাটানার জঙ্গলের দিনগুলো কখনো ভোলার নয়।

পালাটানা থেকে পাঠানো হলো মেলাঘরে। এক সকালে দেখা খালেদ মোশাররফের সঙ্গে। তিনি তখন 'কে ফোর্সের' অধিনায়ক। প্রথমদিকে ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখানোয় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হই। আমায় বললেন, 'তোমাকে দেখে চেনা মনে হয়। তোমাকে সেনা অফিসার পদে ট্রেনিং নিতে হবে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমার এ পরিচয় তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে এটাই আমার প্রথম দেখা ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা বেশির ভাগ যুদ্ধের আগে একে অপরকে চিনত না। কিন্তু মহৎ লক্ষ্য তাঁদের একত্র করেছিল।

স্বপ্নপূরণ!

মেলাঘর থেকে পাঠানো হয় পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে অবস্থিত বাগুনদিয়া ক্যাম্পে। কয়েকদিন ধরেই বলা হচ্ছিল বড়ো ধরনের মিলিটারি অপারেশনে আমাদের একটি মুক্তিবাহিনীর দলকে পাঠানো হবে সাতক্ষীরা সীমান্তের অনেক ভেতরে। নভেম্বরের শুরুতে এক সকালে কমান্ডার বললেন, বাংলাদেশ যেতে হবে আজই। শতাধিক লোকের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হলো অস্ত্র। কেউ থ্রি নট থ্রি রাইফেল, কেউ এসএলআর, কেউ স্টেনগান। মর্টারও ছিল।

এক অদ্ভুত শিহরণ আমার দেহমনে। ভয় কোথায় উড়ে গেছে। যুদ্ধ আগেও করেছি। কিন্তু সেদিনের অভিযান যে ভিন্ন কিছু, সেটা শুরু থেকেই মনে হচ্ছিল। আমাদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে দেওয়া হলো। নৌকায় ইছামতি নদী পার হয়ে হেঁটে গেলাম কয়েক মাইল। গভীর রাতে ডাক পড়ল। কোথায় যাব, কীভাবে যাব–এ সম্পর্কে কিছু বলা হলো না। শুধু একটি বাক্য–'যার যার কমান্ডারকে ফলো করবে।'

কতক্ষণ অন্ধকারে হেঁটেছি, বোঝা গেল বলা যাবে না। ভোরের দিকে আমাকে বলা হলো একটি শ্মশানের মঠের আড়ালে পজিশন নিতে। কমান্ডার আমার হাতে থাকা থ্রি নট থ্রি রাইফেলটি সরিয়ে নিয়ে তুলে দিলেন এসএলআর। ভারতে তৈরি এ অস্ত্র সেমি-অটোমেটিক। তখনও সকাল হয়নি; কিন্তু আলো কেবলই আলো আমার চোখের সামনে। এ আলো জীবনের, এ আলো স্বাধীনতার। এ আলো মুক্তির। এ আলো পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, মা-বাবার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার বার্তা নিয়ে এলো। তাকিয়ে দেখি ছোটো একটি নদীর ঠিক অপর তীরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙ্কার। বাইরে টহল দিচ্ছে কয়েকজন আর্মি। আমাকে ছোট্ট করে অর্ডার দেওয়া হলো, 'ফায়ার!' এমন মধুর শব্দ জীবনে বেশি শুনিনি। আমার মতো আরও অনেকেই সে মুহূর্তে পেয়েছিল একই কমান্ড।

১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যারা হাজির হতে পেরেছেন, তাঁদের জন্য গর্ব হয়। তবে বিজয়ের দিনে নিজের বাড়িতে থাকতে পারাও যে বিরল সৌভাগ্যের!

স্বাধীন দেশে গৈলার নারী-পুরুষের কাছে সমাদর পাই। সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত ও রেণুকা দাশগুপ্তার তিন পুত্র দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে। মায়ের নতুন সম্মান–'মুক্তিযোদ্ধার মা'।

বিজয়ের আনন্দ পূর্ণতা পেল আশীষদাকে পেয়ে। সে বাড়ি ফিরে এলো মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি দলের সঙ্গে, ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়।

আমরা মুক্তির আনন্দে ঘুরে বেড়াই। একদিন গেলাম ২৫ মাইল দূরের বরিশাল শহরে। বেশির ভাগ পথ হেঁটে। সার্কিট হাউসে মুক্তিযুদ্ধের জেলা কমান্ডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কয়েকদিন পর বরিশাল জেলার কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে একত্র করা হয় রহমতপুরের ক্যাডেট কলেজে। সেখানে থাকা ও খাওয়ার চরম অব্যবস্থাপনা। হাজার হাজার মুক্তিবাহিনীর সদস্য। আরও আছে মুজিব বাহিনী। এতজনের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা সহজ কাজ নয়। স্নানের পানি নেই। বিছানা নেই।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার তাগিদ ছিল। কমান্ডার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাব শুনে দোয়া করে বললেন, সারাজীবন যেন ন্যায় ও সত্যের পথে থাকি। বললেন, জীবনের সবচেয়ে বড়ো অর্জন হয়ে গেছে। এই বয়সেই মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন, শত্রুকে পরাজিত করেছেন। এখন যা কিছু অর্জন করবেন, তা কেবল নতুন পালক হয়ে থাকবে।

একদল মুক্তিযোদ্ধাসহ এলাকায় ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে কিছু কাজ করলাম। কয়েকটি রাস্তা ও ভাঙা সেতু মেরামত করে দেওয়া হলো।

একদিন ঢাকা বেতারের খবরে শুনতে পেলাম–৮ ফেব্রুয়ারি খুলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যে ক্যাম্পাস ছেড়েছি ১ মার্চ, সেখানে ফিরে যাব এক বছর যেতে না যেতেই। চেনা পরিবেশ। কিন্তু ইতোমধ্যে পরিস্থিতি আমূল পালটে গেছে। আমি যাব স্বাধীন দেশের রাজধানীতে।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া তাঁর ভাষণ শুনলাম গৈলার বাড়িতে বসে, বাংলাদেশ বেতারে। এমন দিনে ঢাকায় থাকতে না পারায় দুঃখ ছিল। এই রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চ তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। দেশের মানুষ তাঁর আহ্বানে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। এ ময়দানেই ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিল। আবার তিনি ফিরে এলেন এ ময়দানে।

আমাদের হাতে থাকা অস্ত্র জমা দিলাম ৩০ জানুয়ারি। গৈলা স্কুল মাঠে আমরা একত্র হয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি নিক্ষেপ করলাম। এলাকার অনেক লোক আমাদের অভিনন্দন জানাল। তারপর চললাম টরকির কাছে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে। তিন ভাই–আশীষ, অজয় ও অসীম একসঙ্গে অস্ত্র জমা দিচ্ছে–এমন বিরল ঘটনার জন্য কমান্ডার অভিনন্দন জানালেন। অস্ত্র রেখে প্রাপ্তি স্লিপ দিলেন। প্রত্যেকে পেলাম ৫০ টাকা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য অর্থভাবনা দূর হলো। যুদ্ধকালে এটা আমার দ্বিতীয় উপার্জন। পালাটানায় ট্রেনিংয়ের শেষদিনে দেওয়া হয়েছিল ২১ টাকা। তাহলে কী দাঁড়াল? আমি একাত্তরে বেতনভাতা হিসেবে সর্বমোট হাতে পেলাম ৭১ টাকা। একাত্তরের জন্য ৭১ টাকা! কাকতালীয়! এটাকে কি পারিশ্রমিক বলব? বেতন বলব? মুক্তির সংগ্রামে যারা জীবনবাজি রেখে শামিল হয়েছিলেন, তাঁদের অবদান কি টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা চলে?

৮ ফেব্রুয়ারি সকালেই যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে। ২৫ মার্চ জেনোসাইডের এপিসেন্টার এই ছাত্রাবাস। হলের শহিদ মিনারটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথমদিন স্বাধীনতাসংগ্রামের সূচনাকেন্দ্র কলা ভবনের বটতলায় ছিল ছাত্র সমাবেশ। বটতলার বটগাছটি নেই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ গাছটি প্রবল আক্রোশে কেটে ফেলেছে। তারা ভেবেছে, বটগাছ না থাকলে ছাত্র আন্দোলনও থাকবে না। একটি বটগাছ পাকিস্তানের 'প্রবল ক্ষমতাধর' সামরিক জান্তার দুশমন! বিশ্বে এমন নজির মিলবে কি?

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিতদের সঙ্গে আবার দেখা। কে কোথায় ছিল, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তা জানাচ্ছে পরস্পরকে। কার্জন হলে রসায়ন বিভাগে গেলাম। শিক্ষকরা দেখে খুশি। সহপাঠী ছাত্রছাত্রীরা আমি যে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নেব, সেটা ধরে নিয়েছিলেন। শুরু হলো নতুন জীবন। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেওয়ার কারণে জগন্নাথ হল এবং বাইরে সমাদর পাই। চারদিকে তখন যুদ্ধের অনেক নায়ক। সংবাদপত্রে যুদ্ধের অনেক স্মরণীয় ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে। দেশবাসী জানতে পারছে ৯ মাসের অবিস্মরণীয় দিনগুলোর নায়কদের কথা। অতুলন সাহসে যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার-আলবদরদের পরাভূত করেছে, তাঁরা সারাদেশে বরণীয় হয়ে উঠেছেন। আরেক দল থেকে যাচ্ছে পাদপ্রদীপের আড়ালে। তাঁদের কৃতিত্ব অনেক; কিন্তু নিজেদের জাহির করার আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, তাদের অপরাধের কথাও প্রকাশ পাচ্ছে। বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিতভাবে ও নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করেছে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের তত্ত্বাবধানে গঠিত আলবদর বাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচিত শিক্ষক, বরেণ্য সাংবাদিক ও খ্যাতিমান চিকিৎসকদের তারা হত্যা করেছে। একাত্তরে বিপুলসংখ্যক নারী নিগৃহীত হয়েছে। এর শিকার যারা, তাঁদের জন্য পরিবারে অশেষ যন্ত্রণা ছিল, সমাজ করেছে আহাজারি। মুক্তিযুদ্ধের জন্যই তো তাঁদের এত বড়ো আত্মত্যাগ। অথচ যুদ্ধ জয় হতে না হতেই তাঁরা হয়ে পড়ল ইতিহাসের অলিখিত উপাখ্যানের চরিত্র। অনেক অনেক বছর পর কেবল একজন, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী সাহস করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'আমি একাত্তরে ধর্ষিতা হয়েছি। এটা প্রতিরোধ করতে পারিনি, তা বড়ো ব্যর্থতা। কিন্তু আমিও প্রাণপণে লড়েছি পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোসর আলবদর ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্র আমাকে নিয়ে গর্ব কর, সমাজ ও পরিবার আমাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত কর।' আমরা কি তা করতে পেরেছি?

আত্মপ্রচারে আমার আগ্রহ ছিল না। তারুণ্যে যে সচেতনতা, মনোবল ও সক্রিয়তা দেখানো দরকার ছিল, ঠিক সেটাই করেছি একাত্তরে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি যা করেছি, এর বিনিময়ে রাষ্ট্র বা সমাজের কাছে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করি না। বাবা ও মা এবং ভাইবোনদেরও দেখেছি একই মনোভাব পোষণ করে। আমার স্ত্রী এবং সন্তানরাও ব্যতিক্রম নয়। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে শাহবাগ এলাকায় তারুণ্যের বিস্ফোরণ দেখেছি। প্রায় প্রতিদিন স্ত্রী কৃষ্ণা ও মেয়ে শাওলিকে নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছি। ছেলে সৌরকে ভিডিয়োতে দেখিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্ম ধারণ করছে! এ যে কত আনন্দের।

প্রিয়জন হারালে যে কারও কষ্ট হয়। একাত্তরে এ কষ্ট লাখ লাখ পরিবারের। তাঁদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠছে সাভারে। স্থানীয়ভাবেও অনেক এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর আয়োজন হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে নির্মিত জগন্নাথ হলের শহিদ মিনারটি পাকিস্তানি সেনারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। একাত্তরে জগন্নাথ হলে নিহতদের প্রায় সবার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁদের স্মরণে কিছু করতেই হবে–এ ভাবনা শুরু হয়। একদিন মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডো হিসেবে অসীম সাহসে লড়া বিধান বিশ্বাস প্রস্তাব করলেন: 'আমরা সবাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত বিক্রি করব। এ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা দিয়ে ভাষা আন্দোলনের শহিদ মিনার পুনর্নির্মাণ করব। একাত্তরের শহিদদের স্মরণে গড়ে তুলব স্মৃতিসৌধ।'

প্রস্তাবটি আমাদের পছন্দ হলো। প্রকৌশলী আলমগীর কবির শহিদ মিনার ও মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের স্মৃতিসৌধের নকশা করে দিলেন। জগন্নাথ হলের ছাত্র ও আবাসিক শিক্ষকদের রক্ত বিক্রি করে অর্থ মিলল। রক্ত দেওয়ার আগে রক্তদাতার ওজন নেওয়া হয়। আমার ওজন তখন ১০০ পাউন্ডের কম। হালকা-পাতলা গড়ন। চিকিৎসক কিছুতেই রক্ত নেবেন না। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের সমবেত অনুরোধে একপর্যায়ে মত বদলান। মেডিকেল কলেজের বন্ধু রুহুল আমীন বলল, অজয় দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে। ও যে শক্তসামর্থ্য, আর কী প্রমাণ দিতে হবে? দেশের জন্য যারা রক্ত দিয়েছে, তাঁদের স্মরণে রাখতে আমাদের অনেকের রক্তে গড়ে উঠল নতুন শহিদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ। জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এ কাজ পরিচালনা করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি। শহিদদের স্মরণ করায় এর চেয়ে ভালো আয়োজন আর কী-ই বা হতে পারে।

> এক সকালে দেখা খালেদ মোশাররফের সঙ্গে। তিনি তখন 'কে ফোর্সের' অধিনায়ক। প্রথমদিকে ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখানোয় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হই

প্রাণের শেষ আছে। একাত্তরে যারা অস্ত্র হাতে লড়েছেন কিংবা কোনো না কোনোভাবে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন, তাঁরাও একে একে বিদায় নেবেন। আমাদের জীবনের এ গৌরবের সময়ের শেষ জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে কে বেঁচে থাকবেন, কে জানে। সবার প্রতি প্রণতি জানানোর বিরল সৌভাগ্য নিয়ে একদিন তাঁরও জীবনাবসান ঘটবে। তারপর আমরা সবাই হয়ে যাব ইতিহাস। বই বা সংবাদপত্রের পাতা ঘেঁটে জানতে হবে আমাদের কথা।

তখন কেউ হয়তো বলবে, আমরা আকাশের তারা হয়ে জ্বলজ্বল করছি, ফুটছি নানা রঙের ফুল হয়ে। কেউ বলবে, আমরা মিশে আছি বাংলার সবুজ প্রান্তর আর ধূলিকণার সঙ্গে। কেউ বা বলবে, অসংখ্য নদ-নদী আর বঙ্গোপসাগরের ঊর্মিমালা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আছড়ে পড়ছে কূলে কূলে।

মানুষের পুনর্জন্ম হয় কি না, জানা নেই। যদি হয়, ফের একাত্তরের গৌরবের সময়টা ফিরে পেতে চাই।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও গবেষক

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিজয়োল্লাস

আবু মুসা হাসান

সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি মাত্র ৮১টি আসনে জয়লাভ করলেও নির্লজ্জের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়। ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হলেও তা বানচাল করার জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিলেন। ওই সময় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আয়োজন করা হয়েছিল ৭ মার্চের জনসভা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য সবাই ছুটে এসেছিল রমনা রেসকোর্স মাঠে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। মনে আছে, পাকিস্তানি এজেন্টরা প্রচার করছিল জনসভাস্থলে আকাশ থেকে মেশিনগানের গুলি ছোড়া হবে, বোমা নিক্ষেপ করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু কেউ এসব প্রোপাগান্ডায় কর্ণপাত করেনি। ঢাকা শহর এবং আশপাশের জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসেছে। আমরা আজিমপুর নতুন পল্টন লাইনের বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য রওয়ানা দিলাম। মিছিল যতই অগ্রসর হচ্ছিল, মিছিলের কলেবরও তত বড়ো হচ্ছিল। চারদিক থেকেই গগনবিদারী স্লোগান দিয়ে মিছিল আসছিল। সবার হাতেই কিছু না কিছু ছিল। তবে অধিকাংশের হাতেই ছিল বাঁশের লাঠি। আমাদের মিছিলের সামনে যারা ছিলাম, তাঁদের হাতে ছিল

বর্শাফলক। পথে দেখা হয়েছিল জিঞ্জিরা থেকে আগত একটি মিছিলের সঙ্গে। তাঁদের হাতে ছিল নৌকার বৈঠা। রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে আক্ষরিক অর্থেই রেসকোর্স ময়দানটি একটি জনসমুদ্রের রূপ ধারণ করে। বঙ্গবন্ধু যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন প্রতিটি মুহূর্তেই মনে হয়েছে আমি যেন একটি জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে ভাসছিলাম।

আবু মুসা হাসান

এদিকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দেশবাসী অসহযোগ আন্দোলনে যেভাবে সাড়া দিয়েছিল, এর আর কোনো দ্বিতীয় নজির নেই। ওই সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি অফিস-আদালত, ব্যাংক-বিমা–সবকিছুই চলছিল তাঁর নির্দেশে। অন্যদিকে সর্বত্র চলছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে চলছিল আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ। ছাত্রলীগও একইভাবে আয়োজন করেছিল প্রশিক্ষণের। ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর্সের (ইউওটিসি) ছাত্র ক্যাডেটরা ডামি রাইফেল দিয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের ব্যাপকসংখ্যক ছাত্রী কর্মীরাও প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিল। আমার মনে আছে, প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমরা ডামি রাইফেল নিয়ে ঢাকার রাজপথে মিছিল করে মহড়া দিয়েছিলাম। মোট কথা, চারদিকে সাজ সাজ রব চলছিল। সবাই প্রস্তুত মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য, স্বাধীনতার জন্য। অসহযোগ আন্দোলন চলার সময় পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং তার দোসর জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নাম করে একদিকে কালক্ষেপণ করছিল এবং অন্যদিকে বাঙালি জাতির ওপর নারকীয় হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী অতর্কিত শুরু করল বাঙালি নিধনযজ্ঞ। তবে মুক্তিপাগল বীর বাঙালি এই নারকীয় বীভৎস হামলায় ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে গড়ে তুলল প্রতিরোধ। তাই ২৫ মার্চ শুধু কালরাত্রি নয়, পাকিস্তানি হায়েনাদের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধের রাতও বটে।

আমার দেখা সেই প্রতিরোধের বর্ণনা এখানে তুলে ধরছি। ২৫ মার্চ রাতে আজিমপুর নতুন পল্টন লাইনে আমরা কয়েকজন বন্ধু শাহীনের বাসায় আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ শাহীনের বড়ো ভাই সালেহ এসে বললেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা হামলা শুরু করতে যাচ্ছে, আর তোরা এখনো বসে আছিস। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের নতুন পল্টন লাইন এলাকাটা হচ্ছে নিউমার্কেট সংলগ্ন তৎকালীন ইপিআর বা পিলখানার পাশে (বর্তমানে বিজিবি)। ইপিআর-এর গেট থেকে নিউমার্কেট পর্যন্ত রাস্তার দুধারে সারি সারি বড়ো বড়ো গাছ ছিল। ইপিআর গেটে এসে দেখলাম, শত শত মানুষ কুড়াল নিয়ে রাস্তার দুপাশের গাছ কেটে ব্যারিকেড দেওয়ার কাজে লেগে পড়েছে। আরও একটু এগিয়ে দেখলাম, আর্ট কলেজের হোস্টেলের পাশে অবস্থিত সেই সময়কার সিএন্ডবি-এর কম্পাউন্ড থেকে লোকজন একটি পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড ভারী মেশিনকে টেনে নিয়ে আসছে। রাস্তার ওপর মেশিনটিকে এনে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে আক্ষরিক অর্থেই ওই প্রকাণ্ড ভারী মেশিনটি উলটিয়ে কয়েকটি গাছের তৈরি একটি ব্যারিকেডের উপর ফেলল। শত শত পিঁপড়া একজোট হয়ে যেমন ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যায়, ওই দৃশ্যটা তেমনই ছিল।

আরও একটু এগিয়ে আমরা নিউমার্কেটের মোড়ে পৌঁছার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় হামলা শুরু হয়ে গেল। প্রথমে মিরপুর রোড দিয়ে একটি মিলিটারি কনভয় আসতে দেখলাম। হলুদ হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়িগুলো এগিয়ে আসতে লাগল। এর আগে আমরা ওই ধরনের হেডলাইট ঢাকা শহরে দেখিনি। এই অত্যাধুনিক সামরিক যানগুলো পূর্ব পাকিস্তানে আনা হয়েছিল বাঙালি নিধনের জন্য। হঠাৎ ঢাকা শহরজুড়ে শুরু হলো প্রচণ্ড গোলাগুলি। আমরা কয়েক বন্ধু দেওয়াল টপকে আজিমপুর কলোনিতে আশ্রয় নিলাম। সারারাত বাইরে কাটিয়ে ভোরে বাসায় ফিরে দেখি ইপিআর-এর এক জওয়ান আমাদের ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওই জওয়ান আমাকে জানালেন যে, ব্যারাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাকিস্তানিদের হামলার শিকার হয়ে তাঁদের অনেকেই নিহত হয়েছেন। যারা সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের হাতিয়ার নিয়ে ব্যারাক থেকে পালিয়ে চলে এসেছেন এবং আমাদের পাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা তাঁদের নিয়ে আসা থ্রি নট থ্রি রাইফেলগুলো একটি বাড়িতে জড়ো করলাম। ২৬ মার্চ আমাদের পাড়ার খসরু ভাই (প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা এবং পরবর্তীকালে 'ওরা এগার জন' ছবির নায়ক কামরুল আলম খান খসরু) এসে রাইফেলগুলো নিয়ে গেলেন।

২৭ মার্চ কারফিউ প্রত্যাহার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মহল্লাটা ফাঁকা হয়ে গেল। ইপিআর-এর পাশে থাকাটা কেউই নিরাপদ মনে করল না। কারণ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা সৈন্যদের অনেককেই ইপিআর ব্যারাকেই জড়ো করা হয়েছিল।

আমার বড়ো ভাই সাংবাদিক এনএম হারুন তখন ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সিতে (অধুনাবিলুপ্ত এনা) কর্মরত ছিলেন। কাজ শেষে রাতে আর বাসায় ফিরে আসেননি। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর মেজো ভাই গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। তাই আমাকেই মা-বাবা এবং দুই বোনকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়ে পড়তে হলো। ছুটলাম অজানার উদ্দেশে। হাজার হাজার মানুষের মিছিলে শামিল হয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম জিঞ্জিরায়। দেখা পেয়ে গেলাম আমাদের পাড়ার রেশন দোকানের মালিক আমার এক আত্মীয়ের পরিবারের সঙ্গে। সবাই মিলে কয়েক রাত কাটালাম এক জিঞ্জিরাবাসীর বাড়িতে। সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও তাঁরা যে আন্তরিকতা দেখিয়েছিল, তা ভোলার নয়।

এদিকে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যা এবং অগ্নিসংযোগে বাঙালির প্রতিরোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ-যুদ্ধ। আর্মি, ইপিআর এবং পুলিশের বাঙালি সদস্যরা জনতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশব্যাপী এই প্রতিরোধ-যুদ্ধে শামিল হন। জিঞ্জিরায়ও সংঘবদ্ধ হতে থাকলেন প্রতিরোধ-যোদ্ধারা এবং তাঁরা ওই সময় ঢাকা শহরে কয়েকটি অপারেশনও চালিয়েছিলেন। কয়েকদিন জিঞ্জিরায় থাকার পর আমরা নৌপথে মুন্সীগঞ্জ হয়ে নবীনগর গিয়ে পৌঁছলাম। নবীনগর থেকে আমরা চলে গেলাম নিজ গ্রাম কসবা থানার রাইতলায়।

গ্রামে গিয়েও দেখলাম বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য যুবসমাজ প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাদের কসবা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া তখনও মুক্ত এলাকা। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যাতে আসতে না পারে, সেজন্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকরা জনগণের সহায়তায় কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে রেখেছে। এদিকে ঢাকার ছাত্র ইউনিয়নের বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি ছটফট করছি। ভাবছি কীভাবে কী করা যায়।

কয়েকদিন পর আখাউড়ার নিকটবর্তী গঙ্গাসাগরে মামার বাড়িতে গেলাম। মামার বাড়ি গিয়ে আমার খালাতো ভাই মহিউদ্দিন আহমেদকে পেয়ে গেলাম। দেখলাম, আওয়ামী লীগের সক্রিয় নেতা মামা গোলাম রফিক ইতোমধ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ট্রেনিংয়ের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের স্লিপ দিয়ে আগরতলায় পাঠানো শুরু করেছেন। মহিউদ্দিন এবং আমাকেও পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য মামাকে বললাম। মামা বললেন, পাঠাতে পারি; কিন্তু এর আগে তোমাদের দুজনকেই যার যার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। আমরা দুজনই যার যার মায়ের কাছে ছুটে এলাম। অনুমতি নিয়ে আবার পরদিন মামার বাড়ি ফিরে গেলাম। এর দু-একদিন পরই পাকিস্তানি সেনাদের হাতে গঙ্গাসাগরের পতন ঘটল। আমরা সবাই আগরতলা সীমান্তের কাছাকাছি নানার গ্রামের বাড়ি টনকীতে চলে গেলাম। তবে সঙ্গে করে নিতে পারলাম না বড়ো মামা গোলাম সফিককে। মামার বাড়িতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর লাগানো আগুনে বড়ো মামা পুড়ে মারা গেলেন। পরদিনই আমরা আগরতলায় চলে গেলাম। মনে আছে, ওই দিনটা ছিল পহেলা বৈশাখ।

মামারা বড়ো হয়েছেন আগরতলায়। ভারত বিভক্ত হওয়ার আগে নানা আগরতলা রাজবাড়ীর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ওই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সচিন শিংসহ রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা প্রায় সবাই ছিলেন নানার ছাত্র এবং মামার সুপরিচিত। আগরতলায় পৌঁছে আমরা বটতলায় সিপিএম দলীয় এমপি বীরেন দত্তের ভাই ধীরেন দত্তের বাসায় উঠলাম। আগরতলা থাকাকালে এই বটতলাতেই নানার বাড়ি ছিল।

এদিকে আগরতলায় পৌঁছার পরই আমার প্রচণ্ড জ্বর হয়। কিছুতেই জ্বর কমছিল না। তাই ধীরেন দত্ত অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আমাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড জ্বরে কাতর হলেও হাসপাতালের চিকিৎসক এবং সেবিকাদের কাছ থেকে যে সেবা-যত্ন পেয়েছি, তা ভোলার নয়। আমার খাবারের ডায়েট ছিল পাউরুটি ও দুধ। কিন্তু ওয়ার্ডের ম্যাট্রন সিস্টারদের বলতেন, 'জয় বাংলাকে' দুধ-রুটির সঙ্গে ভাত-মাংসও দিবি।

এদিকে মহিউদ্দিন আগরতলায় তাঁর দলবল পেয়ে আমাকে না জানিয়েই চলে গেল বিএলএফ-এর ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। ছাত্রলীগের কর্মীদের জন্য দেরাদুনে এই বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হাসপাতালে থাকাকালেই একদিন আমার বেডের পাশে হাউমাউ করে কান্নার শব্দ। দেখি বড়ো আপা জাহান আরা রউফ। তিনি ছিলেন চারুকলা কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক। দুলাভাই আব্দুর রউফ কর্মরত ছিলেন এজি অফিসে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর বড়ো আপারা গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পতন ঘটার পর বড়ো আপারা আগরতলায় চলে গিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই আমাকে পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। বড়ো আপা জানালেন যে, তাঁরা আগরতলার ক্র্যাফট হোস্টেল ক্যাম্পে ঠাঁই পেয়েছেন। আরও জানালেন, এই ক্যাম্পেই কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ এবং ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা আছেন। তাই হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে ক্র্যাফট হোস্টেলে গিয়ে উঠলাম। দলীয় ক্যাম্পে গিয়ে কমরেডদের পেয়ে ভরসা পেলাম। এই ক্যাম্পেই একটি কক্ষে বড়ো আপারা থাকায় বাড়তি সুবিধাও ছিল। ক্যাম্পে ক্ষিধে পেলে বড়ো আপাদের খাবারে ভাগ বসাতাম। কিন্তু ট্রেনিং বা অস্ত্রপ্রাপ্তির কোনো বন্দোবস্ত তখনও হয়নি দেখে হতাশ হলাম।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার আমাদের মতো বামপন্থিদের আশ্রয় দিলেও ট্রেনিং ও অস্ত্র দিতে অনীহা প্রকাশ করছিল। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন আদায় করার জন্য এবং একই সঙ্গে সিপিআই (সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি)-এর নেতাদের দেনদরবারের ফলে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করল। আমাদের ক্যাম্পগুলোয় আমার মতো অনেকেই ট্রেনিংয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু খুবই সীমিত সুযোগ থাকায় অনেকের পক্ষেই দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও ট্রেনিংয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

ট্রেনিংয়ের দীর্ঘ অপেক্ষার কথা বিবেচনা নেতাদের, বিশেষ করে প্রয়াত সাইফউদ্দিন মানিকের পরামর্শে কিছুদিনের জন্য গ্রামের বাড়ি চলে এলাম। গ্রামে এসে দেখি, পাকিস্তানি দস্যুদের হামলার আশঙ্কায় আমার চাচা আর দাদি ছাড়া সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। মা-বাবা চলে গেছেন কয়েক মাইল দূরে কালসার গ্রামে ফুপুর বাড়ি। আমিও ফুপুর বাড়িতে চলে গেলাম। কিছুদিন পরে পার্শ্ববর্তী মেহেরী গ্রামের বাজারে আমার সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল নবীনগরের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী শওকতের সঙ্গে। শওকত জানাল, ভৈরবের একটি মুক্তিযোদ্ধা দলের সঙ্গে সে আগরতলা যাচ্ছে। ওই দলটি যাচ্ছিল গোলাবারুদ আনার জন্য। আমি মুহূর্তের মধ্যে ওদের সঙ্গে আগরতলা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। শওকতের মাধ্যমে কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করে আমার আগরতলা যাওয়ার বিষয়টি পাকাপোক্ত করে নিলাম। ভদ্রলোকের নাম যতটুকু মনে পড়ে হান্নান সাহেব। তিনি ভৈরব কলেজের কমার্সের অধ্যাপক ছিলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নৌকায় রওয়ানা দেবেন বলে কমান্ডার জানালেন। আমি আম্মা, ফুপু এবং বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার জন্য চলে এলাম। ফুপু এবং ভাবি (ফুপাতো ভাই প্রয়াত হেফজুল বারীর স্ত্রী) আমাকে নিবৃত করার জন্য চেষ্টা চালালেন। ভাবি কাপড়ের থলের ব্যাগ থেকে আমার কাপড়চোপড় বের করে বিলম্ব ঘটাচ্ছিলেন। আম্মা ওদের ব্যর্থ চেষ্টা না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু এবার ফুপু বললেন, একটু দুধভাত খেয়ে যেতে হবে। দুধভাত খেয়ে গেলে তোর কোনো বালাই-মুসিবত হবে না। ফুপুর হাতে মাখানো দুধভাত খেয়ে দ্রুত খালের পাশে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকাটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। পড়ন্ত বেলায় মেঘলা দিনে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সেখানে এক যুবক জাল দিয়ে মাছ ধরছিল। আমি তাকে আমার অপেক্ষার কারণ বলার পর সে জানালো যে মনে হয় একটা 'মুক্তির' নৌকা চলে গেছে, দুই মাঝি নৌকাটি চালাচ্ছিল। তখন আমার আমার মাথায় বাজ পড়ল। এবার বাড়ি ফিরে গেলে আমার আর আগরতলায় যাওয়াই হবে না। যেভাবে হোক, আমাকে আগরতলায় যেতে হবে। কমান্ডার আমাকে বলেছিলেন যে তারা আমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী নিমবাড়ী গ্রামের স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সূদন মিয়ার মাধ্যমে আগরতলায় যাবেন। খালের পাড়ে অসহায়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। সরাসরি সূদনের বাড়িতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা, ফুপুর গ্রাম থেকে কিছুদূর হেঁটে হাঁটু ও কোমরসমান পানি ভেঙে চারগাছ বাজারের কাছে জঙ্গাইলের সড়ক নামে একটি উঁচু রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। ওই রাস্তা থেকে আমাদের গ্রামটি আধা মাইল দূরে আর সূদন মিয়ার নীমবাড়ী গ্রামটি আমাদের

পাশের গ্রাম শ্যামবাড়ীর লাগোয়া। আমাদের এলাকার গ্রামগুলো নিচু এলাকায় অবস্থিত। চারদিকে পানি থইথই করছে। নৌকা ছাড়া যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বেশ দূরে একজন নৌকা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে আমার চাচার পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করলাম আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ওই ভদ্রলোক দয়া করে আমাকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। চাচা ও দাদির সঙ্গে দু-একটি কথা বলে আমি আমাদের পাশের বাড়ির এক ভাতিজাকে নিয়ে নৌকা করে সূদনের বাড়ির দিকে ছুটলাম। আমাদের নৌকাটি সূদনের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা থেকে টর্চ জ্বালিয়ে হল্ট-হল্ট বলে একজন হুংকার দিয়ে উঠল। আমি আমার পরিচয় দেওয়ার পর কমান্ডার তো অবাক। বললেন, আমি তো মনে করেছিলাম তুমি বোধহয় আমাদের সঙ্গে যাবে না।

একটু পরে উঠানে এসে ওই সূদন বললেন, 'আইজ রাইতে ক্লিয়ারেন্স নেই, যাওন যাইব না। আপনাদেরকে অন্য কোনো জায়গায় থাকতে হইব, কাইল ক্লিয়ারেন্স পাইলে পার কইরা দিমু।' অর্থাৎ, পাকিস্তানি বাহিনীর যে কমান্ডার কালভার্টের পাহারার দায়িত্বে রয়েছে তার সঙ্গে সূদনের বোঝাপড়া হয়নি। রাতে ২০-২২ জনের এই দলবল নিয়ে কোথায় গিয়ে উঠবেন, তা নিয়ে কমান্ডার চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লে আমি তাঁকে বললাম, আমাদের বাড়িতে চলুন, কোনো সমস্যা হবে না। আমার চাচা ডাক্তার ময়না মিয়া এই এলাকার আওয়ামী লীগ নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক। আপনারা গেলে বরং চাচা খুশিই হবেন। এখানে উল্লেখ করা যায়, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল ঢাকার বন্দিদশা থেকে পালিয়ে ফিরোজ মিয়ার সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়ি এসে উঠেছিলেন। কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে থাকার পর শেখ জামালের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে চাচা নিজেই তাঁকে আগরতলা নিয়ে গিয়েছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের দলটিকে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পর চাচা তড়িঘড়ি করে রাতের খাওয়ার আয়োজন করলেন। দাদি রান্না করে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ালেন। আমাদের বাড়িতে তিনদিন থাকার পর ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেল এবং রাজাকার কর্তৃক পাহারারত কালভার্টের নিচ দিয়ে পার হয়ে আমরা নিরাপদে আগরতলায় গিয়ে পৌঁছলাম।

কিছুদিন অপেক্ষা করার পর ট্রেনিংয়ে যাওয়ার সুযোগও এসে গেল। আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল আসামের তেজপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্পে। ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের ব্যাচে আমরা মোট ৪০০ জন ছিলাম। আমাদের দলনেতা ছিলেন প্রয়াত ইঞ্জিনিয়ার মর্তুজা খান। আমাদের চেয়ে বয়স অনেক বেশি ছিল। ট্রেনিংয়ের প্রথমদিনের একটি ঘটনা আজও আমার মনে পড়ে। প্রথমেই আমাদেরকে দৌড় দিয়ে একটি বিশাল মাঠ চক্কর দিতে বলা হলো। তারপর কমান্ড এলো লিডারের সঙ্গে পিটি শুরু করার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে মর্তুজা ভাইয়ের দম ফুরিয়ে এসেছে, কমান্ডের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে অবশ্য ওইদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা থাকতাম সারি সারি ব্যারাকের মধ্যে। রাতে চলত গল্পগুজব। আমার পাশের বেডেই ছিল গোপাল সাহা নামে কুলিয়ারচরের ছাত্র ইউনিয়নের এক কর্মী। গোপাল তাঁর প্রেমিকাকে দেশে ফেলে এসেছিল। প্রতিরাতেই গোপাল তাঁর প্রেমিকার স্মরণে একটি স্বরচিত গান গাইত আর অঝোরে কাঁদত। তাঁর গানের একটি চরণ ছিল, 'হায়রে সাধের সাধনা, তুমি রইলা কলকাতায় আর আমি আছি আগরতলায়।'

ট্রেনিং ক্যাম্পে আরেকটি মজার ঘটনা মনে পড়ছে। জয়দেবপুরের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী মানবকুমার গোস্বামী মানিক মহাবিপাকে পড়েছিল থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি ছোড়ার প্র্যাকটিস করতে গিয়ে। এক চোখ বন্ধ করে নিশানা তাক করতে হয়; কিন্তু মানিক এক চোখ বন্ধ করতে পারত না। এক চোখ বন্ধ করতে গেলে তার দুচোখই বন্ধ হয়ে যেত। ভারতীয় আর্মির ইনস্ট্রাক্টর ধমক দিয়ে হিন্দিতে বলত, 'তুম কিয়া মরদ হায়, লারকিকো কাভি আঁখ নেই মারা।'

ট্রেনিং ক্যাম্পের আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়লে গা এখনো শিউরে ওঠে। ক্যাম্পের পাশে বয়ে যাওয়া একটি সরু নদীতে আমাদের গোসল করতে হতো। ওই নদীর পানিতে ছিল বড়ো বড়ো জোঁক। আমরা লাফ দিয়ে জোঁকে গিজগিজ করা পানিতে নেমে কোনো রকমে একটা ডুব দিয়ে উঠে আসতাম।

ট্রেনিং ক্যাম্পের আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়লে গা এখনো শিউরে ওঠে। ক্যাম্পের পাশে বয়ে যাওয়া একটি সরু নদীতে আমাদের গোসল করতে হতো। ওই নদীর পানিতে ছিল বড়ো বড়ো জোঁক। আমরা লাফ দিয়ে জোঁকে গিজগিজ করা পানিতে নেমে কোনো রকমে একটা ডুব দিয়ে উঠে আসতাম

ছোটো অস্ত্রের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর এলএমজি, মর্টার ইত্যাদির প্রাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদেরকে ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো। বাইরেই দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হতো; কিন্তু পিপাসা মেটানোর মতো প্রয়োজনীয় পানি জুটত না। ভাত খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা গাছ থেকে বড়ো বড়ো টসটসে পাকা আমলকি পেড়ে পানির বিকল্প হিসেবে চালিয়ে দিতাম। এই হাত না ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাসটি আমার দীর্ঘদিন রয়ে গিয়েছিল।

ট্রেনিং পেতে আমাদের যেমন বিলম্ব হয়েছিল, তেমনই ট্রেনিংয়ের পর অস্ত্র নিয়ে দেশে ঢুকতে গিয়েও সমস্যায় পড়েছিলাম। ওই সময় মুক্তিযোদ্ধারা প্রবেশ করতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ দিচ্ছিলেন। দেশে প্রবেশ করতে গিয়ে চৌদ্দগ্রামের বেতিয়ারায় ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ গেরিলা বাহিনীর একদল কমরেড পাকিস্তানি সৈন্যদের অ্যাম্বুশে পড়ে প্রাণ হারাল। অবশেষে আমরা দেশে প্রবেশ করতে সক্ষম হলাম। আমরা নৌকায় করে ধীরে ধীরে ঢাকামুখী এগোতে লাগলাম। তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, হো চি মিনের ভিয়েতনামের মডেলে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলাযুদ্ধ করার যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলাম, সেই সুযোগ আর থাকছে না। আমরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লাম। আমাদের গ্রুপের অবস্থান ছিল মুন্সীগঞ্জে। আমাদের স্কোয়াড লিডার ছিলেন মাহবুব জামান। মাহবুব ভাই স্বাধীনতার পর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুন্সীগঞ্জে যখন আমরা অবস্থান করছিলাম, তখন দখলদার পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ করার জন্য ভারতীয় জেনারেল মানিক শাহ-এর ফরমান বারবার বেতারে প্রচারিত হতে লাগল। ১৬ ডিসেম্বর নিয়াজি দলবল নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ করার পর বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাদদেশে ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ গেরিলা বাহিনীর একটি গ্রুপের বিজয়োল্লাস। ছবিতে (ডানদিক থেকে দ্বিতীয়) সহযোদ্ধাদের সঙ্গে লেখক আবু মুসা হাসান (সাদা ট্রাউজার পরিহিত)। ছবিটি ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর সকালে তুলেছিলেন প্রয়াত ফটোসাংবাদিক রশীদ তালুকদার

হানাদারমুক্ত হলো। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা মুন্সীগঞ্জবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়োৎসব করলাম। পরদিন ভোরেই আমরা নারায়ণগঞ্জ হয়ে একটি পিকআপে ঢাকায় চলে এলাম। ঢাকায় এসে আমরা নামলাম কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে। শহিদ মিনারের করুণ পরিণতি দেখে আমরা রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়লাম। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার। তাদের আক্রোশ ছিল এই কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এবং একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলার বটগাছটির ওপর। আইয়ুব-ইয়াহিয়াবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই বটতলা। তাই পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী শহিদ মিনার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এবং বটতলার বটগাছটি উপড়ে ফেলে দিয়েছিল। ১৭ ডিসেম্বর মিনারবিহীন বিধ্বস্ত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাদদেশে রাইফেল উঁচিয়ে বিজয়োল্লাস করেছিলাম, দেশ গড়ার শপথ নিয়েছিলাম। দীর্ঘমেয়াদি গেরিলাযুদ্ধ করে দেশমাতৃকাকে জঞ্জালমুক্ত করতে না পারার অতৃপ্তি থেকে গেলেও শত্রুমুক্ত স্বাধীন দেশে নিশ্বাস নিতে পারায় আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সময় লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে গিয়েছিলাম। কখনো ভাবিনি যে, আবার ক্যাম্পাসে ফিরে যেতে হবে, আবার পড়াশোনা করতে হবে। কিন্তু অগত্যা ফিরে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে পড়াশোনার চেয়ে ছাত্ররাজনীতিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে বের হলাম।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, বর্তমানে লন্ডনের সত্যবাণী অনলাইন নিউজ পোর্টালের উপদেষ্টা সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক জনমতের স্পেশাল করেসপনডেন্ট

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধ এবং আমি

শাহজাহান সরদার

১৯৭১ সালে আমি কলেজছাত্র। থাকতাম বনানী। সরকারি তিতুমীর কলেজের ছাত্রাবাসে। স্কুলজীবন থেকেই ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। কলেজে এসে তা নতুন মাত্রা লাভ করে। আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠি। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সরকারি তিতুমীর কলেজের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গেও ছিলাম। সে সময়কার প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচিতে অংশ নিই। উত্তাল মার্চের শুরুর দিনগুলোয় আমি ঢাকায়ই অবস্থান করতাম। সে সময় ঢাকায় হরতাল, বিক্ষোভ সমাবেশ। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ তিতুমীর কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমাবেশে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম পাশে থেকে আমার কলেজের ছাত্ররা ও আমি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছি। শুনেছি তাঁর মুখ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা। সেদিনের সমাবেশ শেষে হেঁটে হেঁটে বনানী হোস্টেলে পৌঁছতে রাত ৮টা বেজেছিল। এরপরও ১৫ মার্চ পর্যন্ত বনানী, মহাখালী, গুলশান এলাকায় এবং কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছি। তখন রাজধানী ঢাকা ছিল থমথমে। রাস্তায় ব্যারিকেড। বনানী-গুলশান তখন ছিল প্রায় ফাঁকা। গুলিস্তান থেকে বিআরটিসি বাস চলাচল করত বনানী কাঁচাবাজার পর্যন্ত। ১৫ মার্চ বিকালে মিছিল করে হোস্টেলে ফেরার পথে বনানী মোড়ে চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলাম। চায়ের দোকান মানে একটি টঙের মতো দোকান। এ সময় দেখি আমার চাচাতো ভাই রশিদ সরদার (প্রয়াত ইউপি চেয়াম্যান) বাস থেকে নামছেন। উনি নামতেই আমি এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'তুমি এখনো ঢাকায়। বাড়ির সবাই চিন্তায় অস্থির। রউফ আগেই চলে গেছে।' রউফ মানে আমার আরেক

শাহজাহান সরদার

চাচাতো ভাই তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র (বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের সাবেক পরিচালক ডা. আব্দুর রউফ সরদার)। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, কাপড়, জামা এত ময়লা কেন? এক্ষুনি বাড়ি চলো, ঢাকার অবস্থা খারাপ। আসলে মিছিলের কারণে প্যান্ট, শার্ট ধুলোয় ময়লা হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে খেয়াল ছিল না। আমি বললাম আজ না। কাল যাব। তাঁকে আশ্বস্ত করার পর বাসস্ট্যান্ড থেকেই তিনি বিদায় নিলেন। আমি হোস্টেলে এসে দেখি খুব বেশি ছাত্র নেই। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য ও নেতারা ছাড়া অন্যরা তেমন নেই। আমি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে পরদিন সকালে রওয়ানা দিয়ে ৪০ মাইল দূরে নিজ বাড়ি নরসিংদীর মনোহরদীতে পৌঁছাই রাত ১১টায়। হোস্টেল থেকে বের হয়েই দেখি গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ডে হাজারও মানুষ। সবাই দেশে ফিরছে। বাড়ি ফেরার এ কাহিনি অনেক দীর্ঘ। তবে রাস্তায় দেখি দলে দলে মানুষ। কেউ হেঁটে, কেউ বাসে, কেউ রিকশায়।

আমাদের বাড়ি রাস্তার পাশে, তখন কাঁচা রাস্তা ছিল। শুধু রিকশা চলাচল করে। পরদিন সকালে উঠেই দেখি রাস্তায় অসংখ্য মানুষ। ঢাকাসহ বাইরের কর্মস্থল থেকে দেশে ফিরছে। সবার মনেই অজানা এক শঙ্কা। এভাবেই এলো ২৫ মার্চের কালরাত্রি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালির ওপর। আমরা নিয়মিত তখন বিবিসির ও আকাশবাণীর খবর শুনি। ২৬ মার্চ সকালে জানতে পারি পিলখানা বিডিআর-এর ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলার বিবরণ। প্রতিরোধের খবরও পাই। এরপর চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের সংবাদ নিজ কানে শুনি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলার পর থেকে যে যেভাবে পারছে ঢাকা ছাড়ছে। রাস্তা দিয়ে লোক আসা আরও বাড়তে থাকে। অনেকেই টাকাপয়সা, কাপড়চোপড় নিয়ে আসতে পারেননি। আমরা এলাকার ছাত্র-যুবকরা মিলে ফান্ড গঠন করে অসহায়দের সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকি। রাস্তায় পালাক্রমে ডিউটি করে পানি ও শুকনো খাবার সরবরাহ করি। এরই মধ্যে পার্টি থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ডাক এলো। আমি মা-বাবার একমাত্র পুত্রসন্তান। বাবা তখন অসুস্থ। মা সব সময় চোখে চোখে রাখেন। এরই মধ্যে ঠিক করি মুক্তিযুদ্ধে যাব। ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করব; কিন্তু যাব কী করে? মাকে বলে যাওয়া সম্ভব নয়, ফাঁকি দিয়ে যেতে হবে। আমি সিদ্ধান্তে অটল। গোপনে গোপনে তৈরি হতে থাকি। আলোচনা হয় আমার নিকটাত্মীয় কামাল হায়দারের সঙ্গে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। পরে ন্যাপ থেকে সংসদ সদস্য হন। ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য যখন সিদ্ধান্ত নিই, তখন হাতে টাকা ছিল না। বাড়ির গোলাঘর থেকে গোপনে ধান বিক্রি করে কিছু টাকা সংগ্রহ করলাম। সিদ্ধান্ত হলো, ২৪ এপ্রিল রওয়ানা দেব। মাকে জানাব না। তা-ই হলো। কথামতো সেদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্যান্ট কাগজে গুঁজে লুঙ্গি ও শার্ট পরে রওয়ানা দিই। কেউ যেন জানতে না পারে, সেজন্য রিকশায় না উঠে কিছুটা পথ পাটখেতের ভেতর দিয়ে এসে মূল রাস্তা না ধরে গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে শিবপুরে পৌঁছি দুই ঘণ্টায়। সেখান থেকে বাসে নরসিংদীর ভেলানগর। কামাল হায়দারও এখানে এলেন। এটি হাবিবুল্লাহ বাহার ও শহীদুল্লাহ বাহারের বাড়ি। বড়ো ভাই ন্যাপ নেতা, ছোটো ভাই ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। এখানে আরও একজন এলেন, নারায়ণগঞ্জ বারের উকিল আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট ওয়াজউদ্দিন। রাতে তাঁদের বাসায় থাকি। হাবিবুল্লাহ বাহার ও শহীদুল্লাহ বাহারের বাবা বেঁচে নেই। বৃদ্ধ মা ও ছোটো বোন শুধু বাসায়। ২৫ এপ্রিল সকালে দুই ভাই মা ও বোনের কাছ থেকে বিদায় নেন। আমরা নরসিংদীর লঞ্চঘাট থেকে লঞ্চে চড়ে দেড় ঘণ্টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পৌঁছি। নবীনগর থেকে রিকশায় উঠি। কিছুদূর গিয়েই থামতে হয়, সামনে পাকিস্তানি বাহিনী টহল দিচ্ছে। তখন ঢাকা-সিলেট সড়ক হয়নি। মাটির কাজ চলছিল। এরই মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর টহল। ঘণ্টা দুয়েক সতর্ক অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এক গ্রামে প্রবেশ করি। তখন পড়ন্ত বিকেল। এ গ্রামের পরই সীমান্ত। সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাদের সতর্ক প্রহরা। গ্রামে পরিচয় হলো এক যুবকের সঙ্গে। তিনি বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন করেন। আমাদের সীমান্ত পার হতে সহায়তা করবেন বলে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে তিনি চলে যান বাইরে। বলেন, রাতে পার করে দেবেন। সন্ধ্যায় এসে জানালেন, ভোরে যেতে হবে। এখন সম্ভব নয়। তাঁর সঙ্গে নাকি কার আলাপ হয়েছে। জনপ্রতি এক শ টাকা দিতে হবে। সকালে পার করে দেবেন। আমরা কিছুটা ভীত হলাম। মনে শঙ্কা, ধরা পড়তে যাচ্ছি না তো। যাই হোক, আমরা পাঁচজন এক শ টাকা করে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। ভোরে ঠিকই আমাদের সীমান্ত পার করে দিলেন তিনি। ত্রিপুরার সীমান্তে পৌঁছে কিছুটা হেঁটে আমরা একটি মুড়ির টিনের মতো বাস দেখতে পাই। বাসে তিলপরিমাণ স্থান নেই। তাই উঠতে পারিনি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আরেকটি বাস এলে কোনো রকম উঠে বাদুড়ঝোলা হয়ে আমরা আগরতলা পৌঁছি। ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ছিল আগরতলার ক্র্যাফট হোস্টেলে। সেখানে গিয়ে অনেকের সাক্ষাৎ পেলাম। হোস্টেলে স্থান ছিল না। তাই ত্রিপুরার তৎকালীন পরিত্যক্ত রাজবাড়ীতে আমাদের থাকার স্থান হলো।

দুদিন আগরতলা অবস্থানের পর একটি কার্গো বিমানে করে আমাদের আগরতলা থেকে নিয়ে যাওয়া হলো আসাম বিমানবন্দরে। সেখান থেকে ট্রাকে করে তেজপুর ক্যান্টনমেন্টে। সেখানে আমাদের ট্রেনিং সেন্টার। এক মাসের ট্রেনিং। জীবনে প্রথম অস্ত্র ধরেছি। থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে শুরু। প্রথম দিন গুলি ছুড়তে গিয়ে বুকের পাঁজরে বেশ আঘাত পেয়েছিলাম। পরে এলএমজি, এসএমজি ও স্নাইপারের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করি। আমাদের এ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা মরহুম ওসমান গনি এবং উপ-অধিনায়ক ছিলেন বর্তমানে সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। আর প্রশিক্ষণকালে আমার গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন বর্তমানে কমিউনিস্ট নেতা ও ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ আলী। আমরা এ

বাহিনীর প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী ছিলাম। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে আমার নম্বর ছিল ৮৮। প্রশিক্ষণকালে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, সব কাহিনিই দীর্ঘ। তবে একটি কাহিনি তুলে ধরছি।

গোসল করার জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আমাদের জন্য কোনো টিউবওয়েল বা পুকুর ছিল না। পাশে ছিল এক পাহাড়ি ঝরনাঘেরা নদী। এ নদীটিকে জোঁকের ঝরনা বললেই চলে। এ নদীতে গোসলের ব্যবস্থা। আমরা গোসল করতে নদীতে নামার আগে ১০-১২ হাত দূর থেকে দৌড়ে ঝাঁপ দিয়ে আবার একই স্পিডে উঠে আসতাম। তবু শরীরে জোঁক লেগে থাকত। যেগুলো পরে হাত দিয়ে ফেলতে হতো। এ এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। তেজপুরে এক মাস প্রশিক্ষণ শেষে ট্রেনে করে আবার আগরতলার উদ্দেশে যাত্রা। ট্রেনে তিনদিনের পথ। খাবার শুধু পরোটা ও ডিম। সীমান্তে তখন কড়া প্রহরা। পার হওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের রাখা হলো ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকা বাইকোরায়। নিজেরাই জঙ্গল সাফ করে ঘর তৈরি, তাঁবু খাটিয়ে এখানে প্রায় ১৫ দিন অবস্থান করি। পরে এলাকাভিত্তিক টিম করে সীমান্ত পার হয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা হয়। তখন বর্ষাকাল। সীমান্ত পার হয়ে নৌকা করে আমরা রওয়ানা দিই। উঁচু ধানখেতের ভেতর দিয়ে নৌকা যাতে দেখা না যায়, সে ব্যবস্থা। এরই মধ্যে একদিন পাকিস্তানি বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে এক গ্রামের মাঠে চারদিকে পানির মধ্যে একটি স্কুলে চিড়া-মুড়ি খেয়ে দুদিন অবস্থান করতে হয়। তিনদিন পর এক রাতে নরসিংদীর রায়পুরা এসে পৌঁছি। রায়পুরায় একদিন থেকে বেলাবো হয়ে পরে মনোহরদীর পীরপুর গ্রামে এসে পৌঁছি। সেটা জুলাই মাস। মনোহরদী আমার থানা হলেও পীরপুর এলাকা অপরিচিত। আমাদের কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ফওজুল আকবর। বর্তমানে দেশের অন্যতম বৃহৎ নির্মাণ সংস্থা জিবিবি লিমিটেডের চেয়ারম্যান। দুবছর আগে তিনি মারা যান। একসময় ইউকসুর ভিপি ও ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ছিলেন। পীর-পুর কয়েকদিন থেকে পুরো কোম্পানি নিয়ে আমাদের নিজ এলাকায় আসি। বাড়ি ফিরে এলে এলাকায় প্রায় সব লোকই আমাদের দেখতে আসেন। মা আমাকে দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে ঘরে উঠান। আমরা ২০ জনের একটি দল পীরপুর থেকে আমাদের এলাকায় এসেছি। এই এলাকায় শিবপুর আর নরসিংদীর বর্ডার। আমার গ্রাম মনোহরদীর নোয়াদিয়া। পাশে বৈলাব, বাড়িগাঁও, সাতপাড়া, শিবপুর থানা। এই চার গ্রামে কামাল ভাই এবং আমি তাদের থাকার ব্যবস্থা করি। এদের অধিকাংশই শহুরে পরিবেশে মানুষ হলেও গ্রামের মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেছেন। পরদিন থেকেই শুরু হয় আমাদের অপারেশন পরিকল্পনা। মনোহরদী, শিবপুর, কাপাসিয়া ও গাজীপুর পর্যন্ত আমাদের দল বিভিন্ন সময়ে অপারেশন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে সফলতা অর্জন করে। এ এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বেশ তৎপর ছিল। আমরা হানাদার বাহিনীর গতিরোধ করতে অনেক ব্রিজ, কালভার্ট গ্রেনেড মেরে ধ্বংস করি। তখন নির্মাণাধীন ঢাকা-সিলেট হাইওয়ের আশপাশে ছোটো ছোটো কয়েকটি অপারেশনেও অংশ নিই। মনোহরদী থানা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে আমরা কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাকে হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হই। একজনের মৃত্যুও হয়। এছাড়া আমরা আমাদের আওতাভুক্ত এলাকাকে রাজাকারমুক্ত করি। এতে সাধারণ মানুষের জীবন নির্বিঘ্ন হয়। আমাদের এলাকায় বিএলএফসহ তৎকালীন ভাসানী ন্যাপের আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে (পরবর্তী সময়ে বিএনপি মহাসচিব ও মন্ত্রী) একটি দলও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করি। যে কারণে আমাদের এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারেনি। আমাদের একটি গ্রুপ ১৪ ডিসেম্বর কাপাসিয়া দিয়ে গাজীপুর হয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়। গাজীপুর মোড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে তারা সম্মুখযুদ্ধ মোকাবিলা করে ঢাকায় এসে পৌঁছে।

আমি ঢাকায় ফিরি ১৭ ডিসেম্বর। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের একদিন পর। সে এক দীর্ঘ কাহিনি, আজ নয়। আমাদের কমান্ডের ক্যাম্প ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স এনেক্স ভবনে। বর্তমান পরিসংখ্যান ভবনে। সেখানে কিছুদিন থেকে তিতুমীর কলেজের হোস্টেলে ফিরে দেখি লন্ডভন্ড অবস্থা। পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করে কয়েকজন ছাত্রকে। এর মধ্যে কলেজের ভিপি সিরাজউদদৌলাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। সিরাজ ভাই সরকারি তিতুমীর কলেজের তৎকালীন ভিপি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি ছিলেন। তাঁর নামেই কলেজের ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে সিরাজ ছাত্রাবাস। হোস্টেল ও কলেজে বেশ কয়েকজন পুরোনো বন্ধুকে আর খুঁজে পাইনি। মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা শহিদ হয়েছেন।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সম্পাদক, বাংলাদেশ জার্নাল

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আকাশবাণী কলকাতা এবং রেডিয়ো কার্টুন

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

রেডিয়ো কার্টুন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়েছিল একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলোর সঙ্গে। কলকাতা বেতারে সকালের স্থানীয় সংবাদের পর রবীন্দ্রসংগীত শুরুর আগে, তখন অনিয়মিতভাবে সম্প্রচারিত হতো দেড় থেকে দুই মিনিট সময়সীমার এই অনুষ্ঠান। কখনো আরও কম সময়সীমার। একদিনের এই রেডিয়ো কার্টুন তো অপূর্ব ব্যঞ্জনায় বাঙ্ময় হয়ে উঠল মাত্র ৪৫ সেকেন্ডের নীরবতার মধ্যে দিয়েই। সে প্রসঙ্গ পরে। তার আগে উত্থাপন করি একটি ঐতিহাসিক দিনের কথা।

১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। রোববার অর্থাৎ অফিস ছুটির দিন। তবে নিয়মমতো শিফট ডিউটিতে আমরা কজন মাত্র রয়েছি আকাশবাণী ভবনে ট্রান্সমিশন চালনার কাজে। বেলা ১১টার আশপাশ। সেই সময়টায় অফ ট্রান্সমিশন। গভীর ঔৎসুক্যে আমরা দাঁড়িয়ে ত্রিতলের পূর্বমুখী অলিন্দে। সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শেষ হয়েছে। সূর্যের অভয় হাসি নীল আকাশে। ডিউটি রুমে বার্তা এসে গিয়েছে দমদম বিমানবন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পৌঁছানোর পাঁচ মিনিট পরেই ঢাকা থেকে এসে পৌঁছে গিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধুকে আজ অপরাহ্নে সংবর্ধনা জানানো হবে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড ময়দানে। দুই প্রধানমন্ত্রী এখন রাজভবন অভিমুখে। না, মোটরযানে নয়। মিনিটখানেকের অপেক্ষাতেই দেখি, অদূরে মোহনবাগান ফুটবল মাঠে অবতরণ ঘটল একটি হেলিকপ্টারের। ওখান থেকে মোটরযানে রাজভবনে আসবেন তাঁরা।

যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, সামনেই রাজপথে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রস্তরমূর্তি। একই মোটরযানে দুই প্রধানমন্ত্রী। নামলেন এখানেই। এগিয়ে গিয়ে সেই মূর্তির পাদপীঠে নতমস্তকে পুষ্পস্তবক নিবেদন করলেন একে একে দুজনেই। তারপর গাড়িতে উঠে অদূরে আবার অবতরণ। চারদিকে সুনিয়ন্ত্রিত বিপুল জনতার উল্লাসধ্বনির মাঝে এবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি। তারপর হাত তুলে বিপুল জনতাকে অভিবাদন জানিয়ে চললেন রাজভবনে।

বিকেলে ব্রিগেড গ্রাউন্ডে আগ্রহ-বিশ্বাসে দেদীপ্যমান জনারণ্য। বর্ণাঢ্য পরিবেশে মঞ্চের উপরে এলেন শ্রীমতি গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু। শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা জানিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমরা ভারতবাসী এমন বিশেষ কিছুই করিনি যাতে করে কোনো প্রশংসার দাবি করতে পারি। আমরা শুধু সুষ্ঠুভাবে আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছি মাত্র। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আমরা। তার জন্যই যুদ্ধ করেছি। এই দুই দেশের আদর্শ এক, অটুট থাকবে দুদেশের মৈত্রী, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বন্ধুত্ব আর সহযোগিতা। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় ভারতের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সুর বাজতে থাকে। তিনি বলেন, ভারত আর বাংলাদেশের এই মৈত্রী সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে নবযুগের সূচনা করবে। তাঁর ভাষণের মাঝে বারবার তিনি তাঁর সেই সব দেশবাসীর কথা স্মরণ করেন, যাদের বহুমূল্য রক্তক্ষরিত হয়েছে এই স্বাধীনতা অর্জনে। বলেন সেই সব নরনারীর কথা, যাদের প্রাণ অথবা প্রাণের অধিক সম্পদ বলি দিতে হয়েছে নরপশুদের অত্যাচারে। তিনি বলেন, কলকাতাকে তিনি ভালোবাসেন, কলকাতাবাসীও ভালোবাসেন তাঁকে। এবং এই শহরেরই কলকাতা বেতারের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে। এই কলকাতা বেতার বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষকে অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত এবং সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশেষ করে এই কেন্দ্রের 'সংবাদ পরিক্রমা' এবং 'রেডিয়ো কার্টুন'।

নবপ্রজন্মের কাছে রেডিয়ো কার্টুনের মর্মবাণী পৌঁছে দিতে হলে পিছু ফিরে একবার আমাদের তাকাতেই হবে সেই রক্তঝরা দিনগুলোর দিকে। এই ঘটনাপ্রবাহের ভাঁজে ভাঁজেই রয়েছে 'সংবাদ পরিক্রমা' এবং 'রেডিয়ো কার্টুন' সম্প্রচারের উপাদান ও উপকরণ

অবশ্য সেই সময় কলকাতা বেতারের সব বিভাগই ছিল বাংলাদেশময়। 'সংবাদ পরিক্রমা' এবং 'রেডিয়ো কার্টুন'-এর সুবাদে ভারত সরকার ১৯৭২-এর প্রজাতন্ত্র দিবসে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করলেন সংবাদ পরিক্রমার ভাষ্যকার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ১৯৭৩-এ 'রেডিয়ো কার্টুনিস্ট' দিলীপকুমার সেনগুপ্তকে।

বাংলা ভাষায় 'ভাষ্যকার' শব্দটির ব্যবহারিক প্রয়োগে অস্পষ্টতা রয়েছে যথেষ্ট। যিনি লেখেন, তিনিও ভাষ্যকার; পড়েন যিনি, তিনিও। সংবাদ পরিক্রমায় তখন নাম ঘোষিত হতো না কারও। পরিচিত কণ্ঠ দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঠিতব্য বিষয়গুলো আত্তীকরণ এবং অনবদ্য বাচনশৈলী একীভূত করে দিল 'ভাষ্যকার' শব্দটির দ্বিবিধ অর্থ। লেখক প্রণবেশ সেন থেকে গেলেন আড়ালেই। রেডিয়ো কার্টুনের ক্ষেত্রে সূচনা থেকেই কার্টুনিস্টের নাম ঘোষিত হওয়ায় তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা রইল না শ্রোতাদের। রেডিয়ো কার্টুনের সম্প্রচার শুরু হয় মুক্তিসংগ্রামের একেবারে শেষ পর্যায়ে, চলে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পরও আরও কিছুদিন। তবে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, ছাড়া ছাড়াভাবে। এমন অনিয়মিতভাবে প্রচারিত হয়েও শ্রোতৃমনে কেন এত আলোড়ন তুলেছিল এই রেডিয়ো কার্টুন, দু-একটি নমুনা তুলে ধরলেই তা অনুধাবন করা যাবে। সেই উদাহরণগুলোয় আসছি পরে।

তার আগে একটা বড়ো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, তা হলো–এ যুগের সঙ্গে সেই যুগের বিশ্বভুবনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পার্থক্য। এখন প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে তখনকার সেই সমীকরণ। সেই সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পরিক্রমণ অনেকটাই বিভাজিত ছিল বিপরীত মেরুর দুই মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়াকে কেন্দ্র করে। সেই মানচিত্র আজ অপসৃত। ছিন্নভিন্ন সোভিয়েত এখন ডানা ভাঙা পাখি। আমেরিকার ছড়ি ঘোরানোর কৌশল হয়েছে তীক্ষ্ণতর। এদিকে ইদানীং চীন-ভারত মৈত্রী পুনঃস্থাপনের প্রয়াস নতুন করে শুরু হয়েছে বটে, তবে 'হিন্দি-চীনি ভাই ভাই' স্লোগান চূর্ণবিচূর্ণ করে ১৯৬২তে সহসা চীনের ভারত আক্রমণ যে স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছিল নেহরুজির ভারতের, সম্প্রীতির নবসৌধ নির্মাণের পথে এখনো উঁকিঝুঁকি মারছে অপ্রীতিকর সেই অভিজ্ঞতার সন্দিহান কাঁটা। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলোয় পাকিস্তানের প্রশ্রয়দাত্রী ছিল চীন। চীনের ভারতবিদ্বেষ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছিল যে আমেরিকা, তারই কোলে আশৈশব লালিত-পালিত পাকিস্তান। স্বভাবতই তাই ভারতের নির্ভরতা থেকেছে সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর।

১৯৪৭-এ জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এই দুই প্রান্তে অবিরাম সংঘাত। ভৌগোলিক ব্যবধান হাজার হাজার মাইল, মৌলিক ব্যবধান তারও বেশি–জীবনচর্চায়, সংস্কৃতিতে। পূর্ব পাকিস্তানের হৃদয়ে জন্মাবধি ধিকিধিকি আগুন জ্বলেছে পশ্চিম পাকিস্তানের অহমিকায়, খবরদারিত্বে, বিদ্বেষে এবং তাচ্ছিল্যে। কলকাতা বেতারের সংবাদ পরিক্রমায় ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই সেই সব ঘটনার পরম্পরা আভাসিত হয়েছে প্রণবেশ সেনের কলমে। শুধু তা-ই নয়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করতে হলেও সেই প্রণবেশ সেনেরই দ্বারস্থ হতে হয় আমাদের। ঋণ স্বীকার করতে হয় তাঁর ভাষ্য ও ভাষার।

নবপ্রজন্মের কাছে রেডিয়ো কার্টুনের মর্মবাণী পৌঁছে দিতে হলে পিছু ফিরে একবার আমাদের তাকাতেই হবে সেই রক্তঝরা দিনগুলোর দিকে। এই ঘটনাপ্রবাহের ভাঁজে ভাঁজেই রয়েছে 'সংবাদ পরিক্রমা' এবং 'রেডিয়ো কার্টুন' সম্প্রচারের উপাদান ও উপকরণ।

পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যকামিতা, নিষ্ঠুর শোষণ ও সামরিক শাসন রুখতে ষাটের দশকেই স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন তুলে ধরেন শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব পাকিস্তানেও যখন বাংলা-উর্দুর মিলিজুলি জবান তৈরির ফতোয়া জারি হলো আইয়ুব খানের নির্দেশে, বেতারে বন্ধ করে দেওয়া হলো রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার–তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠল পূর্ব বাংলার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী মহলের পক্ষ থেকে। উনসত্তরে উঁকি দিল বায়ান্নর মুখ। জনরোষ

থামাতে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যে মামলায় বন্দি করে রাখা মুজিবুরকে মুক্তি দিতে হলো ২৩ ফেব্রুয়ারি। সংবর্ধনা জানাল তাঁকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, অভিহিত করা হলো 'বঙ্গবন্ধু' নামে। ধ্বনিত হলো 'জয় বাংলা' স্লোগান এবং গীত হলো রবীন্দ্রসংগীত–'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমতা অর্পণ করলেন আইয়ুব খান ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ। দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখে অবশেষে পাকিস্তানে নির্বাচন হলো ১৯৭০-এ ৭ ডিসেম্বর। জাতীয় সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ। কিন্তু অধিবেশন ডাকা নিয়ে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যোগসাজশে টালবাহানা চালাতে লাগলেন ইয়াহিয়া খান। ভুট্টোর উসকানিতে ৩০ জানুয়ারি একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হলো লাহোরে। ২ ফেব্রুয়ারি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করা হলো সেটি। পরদিনই ভারত তার আকাশসীমার উপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দিল। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের অসামরিক মন্ত্রিপরিষদ বরখাস্ত করলেন ২২ ফেব্রুয়ারি। জাতীয় অধিবেশন স্থগিত রাখা হলো ১ মার্চ। ২ মার্চ থেকেই শুরু হয়ে গেল আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলন। ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে নিযুক্ত করলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল।

৭ মার্চ ঢাকার রমনা ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উন্মুক্ত জনসভায় ঘোষণা করলেন–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সেই ভাষণ প্রচার করা হলো পরদিন ৮ মার্চ। ২৩ মার্চ পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে শেখ মুজিবের নির্দেশে তোলা হলো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

২৫ মার্চ ১৯৭১। ইয়াহিয়া খান দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনলেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলো পুলিশ লাইন, ছাত্রদের হোস্টেল, অধ্যাপকের কোয়ার্টার, বুদ্ধিজীবীদের বাড়িঘর, মন্দির-মসজিদ, সংবাদপত্রের অফিস। আক্রান্ত হলো শহর, আক্রান্ত হলো গ্রাম। ২৬ মার্চ এক গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে জানানো হলো শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং স্বীকৃতিদানের আবেদন জানিয়েছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অধিবেশনে সংগীতানুষ্ঠান চলাকালীন তা থামিয়ে আমাদের সহকর্মী গৌরী ঘোষ ঘোষণা করলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।' এরপরই সোচ্চারিত হলো যন্ত্রসংগীতের নিবদ্ধ সুর–'চল্ চল্ চল্/ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...।'

২৭ মার্চ দিল্লিতে সংসদ সদস্যদের উদ্‌বেগের ভাগীদার হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের ঘটনাবলি সম্পর্কে জানালেন।

১২ এপ্রিল গঠিত হলো স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার। ইতোমধ্যে মুজিবুরকে বন্দি করা হয়েছে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালি কারাগারে। তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে রেখে সৈয়দ নজরুল ইসলাম হলেন উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন ঘটল স্বাধীন বাংলাদেশের। যে অনুষ্ঠান শুরু হলো 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি দিয়ে। সারা প্রান্তর মুখরিত হলো 'জয় বাংলা' আর 'জয় মুজিব' ধ্বনিতে। ১৯৭১-এর মার্চ থেকে এই স্বাধীনতার ঘোষণা কার্যকর বলে গণ্য হলো।

বাংলাদেশের প্রতি আগেই আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন দিল্লির দুই পাকিস্তানি কূটনীতিক। এবার আনুগত্য ঘোষণা করলেন কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার। এখানকার পাকিস্তানি হাইকমিশন রূপান্তরিত হলো বাংলাদেশ মিশনে। কলকাতা বেতারের সংবাদ বিচিত্রায় সেদিন এই ঘটনার বিবরণীসহ সংযোজিত হলো মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের অংশবিশেষ। তারপরই শোনানো হলো অংশুমান রায়ের কণ্ঠে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা সেই গান–'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি–বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।' শ্রোতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে প্রথম শুনলেন এই গান। যে গানটি কদিন আগেই দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণদাস রোডের বাড়িতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী কামরুল হাসানের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে টেপরেকর্ডারে তুলে এনেছিলেন সংবাদ বিচিত্রার প্রযোজক উপেন তরফদার। টেবিল বাজিয়ে সংগত করেছিলেন দিনেন চৌধুরী আর অশোক রায়। কলকাতা বেতার থেকেই গানটি পৌঁছল জনতার দরবারে। দাবানলের মতো এই গান ছড়িয়ে পড়ল দুই বাংলার সর্বত্র। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে মৃত সঞ্জীবনীর কাজ করল এই গানটি।

২৫ মে চালু হলো, স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সেই বেতার কেন্দ্রই তখন মুজিবনগর। আকাশবাণী আর বাংলাদেশ বেতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে চলল অন্যায়-অত্যাচার আর অমানবিকতার বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের সপক্ষে। প্রকাশিত হলো জয় বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। মুদ্রিত হতে থাকল বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের তথ্যনিষ্ঠ চিত্ররূপ।

পূর্ববঙ্গ থেকে পিলপিল করে শরণার্থীরা আসতে শুরু করল ভারতে। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, এছাড়া ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম ও অন্যান্য রাজ্যেও। এদের পুনর্বাসন এদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে ছিল একটি চ্যালেঞ্জ, যা ছিল পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের লড়াই–এই অভূতপূর্ব শরণার্থী সমাগমের ফলে তা হয়ে দাঁড়াল ভারতের সমস্যা। এই সমস্যার রাজনৈতিক ও মানবিক সমাধানের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সারাদুনিয়ার কাছে। এদের প্রত্যাবর্তনের জন্য কী ব্যবস্থা পাকিস্তান সরকার নিচ্ছে, শ্রীমতি গান্ধী এর কৈফিয়ত তলব করলেন নেপথ্যের নাটের গুরু জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে। আকাশবাণী হয়ে উঠল মুক্তিকামী, গণতন্ত্রপ্রেমী এবং অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর–যা বিশেষভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সংবাদে, সংবাদ বিচিত্রায়, সংবাদ পরিক্রমায় এবং রেডিয়ো কার্টুনে।

৩ ডিসেম্বর রাতে দিল্লি থেকে জাতির উদ্দেশে প্রচারিত হলো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একটি সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণ–'আজ বিকেল সাড়ে ৫টার পর আমাদের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। দেশকে যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই।'

পুরোদমে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। ভারতীয় মিগের পরাক্রমে ধরাশায়ী হলো পাকিস্তানের স্যাবর জেটগুলো। শত্রুমুক্ত হলো বাংলাদেশের আকাশ। ভারতীয় নৌবাহিনী বিধ্বস্ত করল চট্টগ্রাম, চালনা, কক্সবাজার এবং চাঁদপুর বন্দর। স্তব্ধ হলো পাকিস্তানের রণতরির আনাগোনা এবং সেই সঙ্গে তাদের পালানোর পথ।

৬ ডিসেম্বর লোকসভার অধিবেশনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সদস্যদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কলকাতা বেতারে সংগীতানুষ্ঠান থামিয়ে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন সেই স্বীকৃতিদানের সংবাদ, যেখানে যত ভারতবাসী, যত বাঙালি–আনন্দে উদ্‌বেলিত সবাই।

গঠিত হলো বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর এক যৌথ কমান্ড। সেই কমান্ডের প্রধান হলেন আমাদের ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি ইন-সি জগজিৎ সিং অরোরা। লড়াই পৌঁছে গেল বাংলাদেশের গভীরে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন সপ্তম নৌবহরকে নির্দেশ দিলেন বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যেতে। তা প্রতিহত করার শক্তি ধরে ভারত–শ্রীমতি গান্ধীর এই দৃপ্ত ঘোষণায় থমকে গেল সপ্তম নৌবহরের অগ্রসর ও আগ্রাসন।

যৌথ কমান্ডের জওয়ানরা সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলায় পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যান্টনমেন্টগুলো হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের রসদে পড়ল টান।

১৪ ডিসেম্বর সকালে যৌথ বাহিনী পৌঁছে গেল সাভারে। মুক্তিকামী মানুষের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে অভিষিক্ত হলো তাঁরা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ আকাশবাণীর মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনীকে সতর্ক করলেন– 'ভারতীয় বাহিনী চতুর্দিক থেকে তোমাদের ঘিরে ফেলেছে। নিশ্চিহ্ন এখন তোমাদের বিমানবাহিনী। চট্টগ্রাম, চালনা ও মোংলা বন্দরগুলোও অবরুদ্ধ। তোমাদের ভাগ্যও এখন তোমাদের বিরুদ্ধে। মুক্তিকামী ও অন্যান্য স্বাধীনতাসংগ্রামী সংগঠনগুলো তাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়বদ্ধ। এখন তোমাদের একমাত্র পথ আগুয়ান ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসর্মপণ করা।'

১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলেন। দুপুরে ইস্টার্ন কমান্ডের মেজর জেনারেল জ্যাকব আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে ঢাকা রওয়ানা হলেন। এর কিছু পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা এয়ার মার্শাল দেওয়ান, ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণান ও মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকারকে নিয়ে পৌঁছলেন ঢাকায়।

বিকেল চারটে কুড়ি। বুড়িগঙ্গার তীর। ঢাকার রেসকোর্স ময়দান প্রত্যক্ষ করল এক ঐতিহাসিক দৃশ্য। বিজয়ী ও পরাজিত বাহিনীর নায়করা এলেন এগিয়ে। স্বাক্ষরিত হলো ইনস্ট্রুমেন্ট অব সারেন্ডার। সেই দলিলে স্বাক্ষর দিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেল নিয়াজি এবং যৌথ কমান্ডের জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

প্রায় একই সময়ে দিল্লিতে লোকসভার সদস্যদের উল্লাসধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন, 'ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী। জয়োৎসবের এই শুভ মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের লক্ষ্য ছিল সীমাবদ্ধ–সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে বাংলাদেশ ও তার মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করা এবং আমাদের দেশ আক্রমণে বাধা দেওয়া। ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও থাকবে না বাংলাদেশে। আমাদের আশা এই যে, নতুন জাতির সন্ধিক্ষণে এই নতুন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ন্যায্য স্থান গ্রহণ করে বাংলাদেশকে শান্তি, প্রগতি ও ঐশ্বর্যের পথে চালিত করবেন। তাঁদের জন্য আমাদের শুভকামনা রইল।'

বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক এই প্রেক্ষাপটই প্রতিষ্ঠিত করেছিল কলকাতা বেতারের সেই সময়ের নানা অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য। নিয়মিত এবং অধিক সংখ্যায় প্রচারিত না হয়েও রেডিয়ো কার্টুনগুলো এভাবেই পূরণ করেছিল সময়ের দাবি; জয় করেছিল জনতার হৃদয়। প্রত্যাশার বীজ থেকে অভীষ্টের মহিরুহ হয়ে ওঠার পেছনে সংশয় ও সংকল্পের যে দোলাচল, শিকড়কে সেখানে দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পারে আত্মবিশ্বাসের বারিসিঞ্চন-জাত এই ধরনেরই অনুষ্ঠান। যখন তা রচনা করে সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প, তখন রূপক অর্থেই শুধু নয়, এই অনুভব সত্য হয়ে ওঠে বাস্তবেও। এই যুগলবন্দির সাযুজ্য তেমনভাবে প্রতিফলিত হতে না পারার কারণেই কি পরবর্তীকালে আর তেমনভাবে দেখা মিলল না রেডিয়ো কার্টুনের? প্রয়াস কিন্তু চলেছিল, ফলপ্রসূ হয়নি তা।

আবার ফিরে আসি সেই দিনগুলোর কথায়। তার আগে উল্লেখ করি রেডিয়ো কার্টুনের সংলাপ ও সংগীতে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের নাম। সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিমলভূষণ, আরতি মৈত্র, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা গঙ্গোপাধ্যায়, জগন্নাথ বসু, অমলেন্দু হালদার, পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ এবং এমনকি এই অধমও। কারও নাম অনুক্ত থেকে যাওয়ার দায়ভার অবশ্যই বয়সজনিত বিস্মৃতির। তবে বেশ মনে আছে 'যবে বিবাহে চলিলা বিরোচন' গানটি ছিল বিমলভূষণের। 'চিনি-মাসি' হয়েছিলেন আরতি মৈত্র। নানা চরিত্রে এমনই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রেরই কয়েকজন ঘরের লোক।

নিয়মিত এবং অধিক সংখ্যায় প্রচারিত না হয়েও রেডিয়ো কার্টুনগুলো এভাবেই পূরণ করেছিল সময়ের দাবি; জয় করেছিল জনতার হৃদয়। প্রত্যাশার বীজ থেকে অভীষ্টের মহিরুহ হয়ে ওঠার পেছনে সংশয় ও সংকল্পের যে দোলাচল, শিকড়কে সেখানে দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পারে আত্মবিশ্বাসের বারিসিঞ্চন-জাত এই ধরনেরই অনুষ্ঠান

আগেই জানিয়েছি কয়েকটি নমুনা দেব সেই সময়ের রেডিয়ো কার্টুনের। তবে সে প্রসঙ্গে আসার আগে বিশেষভাবে বিবৃতি করতে চাই স্বতন্ত্র ধরনের একটি রেডিয়ো কার্টুনের কথা, কারণ কাগজের পৃষ্ঠায় মিলবে না তার সন্ধান।

কেন এবং কীভাবে এসেছিল এই কার্টুনটির ভাবনা? একটু খুলেই বলতে হয় তা হলে। এটি সম্প্রচারের আগের দিনই শ্রীমতি গান্ধী সারাদুনিয়ার কাছে তুলে ধরেছেন ভারতে বিপুলসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থী আগমনজনিত সমস্যার কথা। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনার নৃশংসতম নারকীয় অভিযানের শিকার তাঁরা। কেউ কেউ আহত, কেউ কেউ সর্বস্ব খোয়ানো, কেউ কেউ স্বজন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। কেউ কেউ অপুষ্টিতে এবং অসুস্থতায় ভুগছে। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। চোখের সামনে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে কিংবা নিজের মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার দেখে একেবারে মূক হয়ে গিয়েছেন। যে কোনোরকম অত্যাচার করতে সক্ষম ওই পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ভারতের সাধ্য সীমিত। ছিল না পূর্বপ্রস্তুতিও। কিন্তু খোলা ছিল সীমান্ত এবং মনের দরজা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদলোভী জুলফিকার আলী ভুট্টো তার নিজের দেশেরই এই দুর্গত মানুষগুলোর জন্য কোন আশ্বাসের বাণী শোনাতে চান, করতে চান কী পদক্ষেপ–সোচ্চার সেই জবাবদিহিই চেয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

এই ঘটনার পরদিনই সকালের শিফটে ডিউটি আমার আকাশবাণীতে। দিল্লির বাংলা সংবাদের পর ওভারনাইটের সহকর্মীকে বিশ্রাম দিয়ে দুই নম্বর স্টুডিয়োতে বসেছি কলকাতা 'ক'-এর ট্রান্সমিশনে। কিউশিটের পাতায় দেখি, সকালের স্থানীয় সংবাদ এবং রবীন্দ্রসংগীতের টাইপ করা নির্ঘন্টের মধ্যবর্তী স্থানে কালির আঁচড়ে লেখা: রেডিয়ো কার্টুন। ডিউরেশন এক মিনিট। আগেই বলেছি, রেডিয়ো কার্টুন প্রত্যহ সম্প্রচারিত হতো না, দু-চারদিনের বিরতি দিয়ে তা প্রচারিত হতো। রেডিয়ো কার্টুন সম্প্রচার তালিকায় আছে কি না, সেটা বুঝে নিতে হতো সেদিনের কিউশিটে চোখ বুলিয়ে। আলাদা টেপ থাকত তার। কিন্তু সেদিন কোনো টেপই দেওয়া নেই রেডিয়ো কার্টুনের। শুধু রবীন্দ্রসংগীতের টেপবক্সটিতে পৃথক একটা কাগজে লেখা রয়েছে ওইদিনের রেডিয়ো কার্টুনের ঘোষণার বয়ানটি এবং সেখানে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, ডিউটি অফিসার এবং অ্যানাউন্সার অন ডিউটি যেন কন্ট্রোলরুমকে আগেভাগে জানিয়ে রাখেন প্রকৃত ব্যাপারটি কী ঘটবে, যাতে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিলার না বাজিয়ে বসেন।

এক নম্বর স্টুডিয়ো থেকে স্থানীয় সংবাদ শেষ হতেই দুই নম্বর স্টুডিয়োতে আমার বুথে জ্বলে উঠল লাল আলো। রবীন্দ্রসংগীতের আগেই রেডিয়ো কার্টুন। শুধুই একটি ঘোষণা–'আকাশবাণী কলকাতা। রেডিয়ো কার্টুন।' ... তারপর ৪৫ সেকেন্ড পজ। নির্ধারিত সময়ের সেই পজ শেষ হতেই সমাপ্তির ঘোষণা–'ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কৈফিয়ত তলবের জবাবে রাওয়ালপিন্ডি থেকে এই নৈঃশব্দ্য রেকর্ড করে আনা হয়েছে।'

অনেক কথাই বলা হয়ে গেল কোনো কথা না বলে। বেতারের মতো একটি শ্রুতিমাধ্যমে এমন নিঃশব্দ নীরবতা উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে শ্রোতাদের কাছে আর কখনো এতখানি মুখরতায় কেউ পৌঁছে দিতে পেরেছ কি না, জানি না।

এবার তো আগ্রহ জাগছে অন্যান্য রেডিয়ো কার্টুনগুলো কেমন ছিল তার নমুনা পেতে? কয়েকটি উদাহরণ দিই।

ঘোষক	সংবাদে প্রকাশ প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেছেন, 'আমি এক ডুবন্ত জাহাজকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছি।' (সমুদ্রে জাহাজ ডুবছে। হুড়মুড় করে জলে পড়ছে। চ্যাঁচামেচি।)– 'এটা আমার লাইফবেল্ট। আমি দেব না। প্রথমে বৃদ্ধ আর পঙ্গু লোকদের, পরে জায়গা থাকলে ছোটো ছোটো শিশু আর মহিলাদের সঙ্গে করে লাইফবোটে উঠুন। তাড়াতাড়ি। এক মিনিট দেরি নয়। সঙ্গে কিছু নিতে দেব না। না–'
কমান্ডার	গোড়াতেই ভুল হয়েছিল, গুলহাসান। এই জাহাজটার ডিজাইনটাই–
লে. জেনারেল গুলহাসান স্যার,	ডিজাইনটা ছিল ব্রিটিশের। কিন্তু ওদের দেওয়া প্যাসেঞ্জার-জাহাজটাকে আমরাই যুদ্ধ-জাহাজ বানিয়ে তুলেছিলাম। প্যাসেঞ্জারদের সুখ-সুবিধার কথা ভাববার দরকার বোধ করিনি।
কমান্ডার	এখন বলো, লোক কীভাবে কমানো যায়?
লে. জেনারেল	পুপ ডেকে কৎলে আম করে পনেরো-কুড়ি লাখ লোক তো সব শেষ করলাম। এক কোটি ভাগিয়ে দিলাম। কিন্তু পিছনের দিকটা তো ডুবেই গেল!
কমান্ডার	না, না, ডুবে গেলেও ডুবে যায়নি। শুনুন, আপনি আরও লোক কমান!
লে. জেনারেল	ঠিক। ওই পাশের প্রতিবেশী সিন্ধুদেশের অধিবাসীদের সাবাড় করে দিই?
কমান্ডার	জেনারেল গুলহাসান, সিন্ধ আমার প্রদেশ। ভুলে যেও না যেন তুমি এই পাকিস্তানের মহামহিম প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছ...
লে. জেনারেল	অ্যালাউ মি টু কারেক্ট ইউ, স্যার। নট পাকিস্তান বাট 'মিনি'-স্তান।
কমান্ডার	নো। এইটাই আসল পাকিস্তান ছিল এবং এখনো আছে। আপনি ভার কমান!
লে. জেনারেল	তবে ফোকসেল থেকে জেটিসন করি? পাখতুনরা তো যেতে চাইছেই। (দুটো লোক ছুটে এসেছে বোঝা যাবে তাদের কণ্ঠস্বরে।)
দুজনে	আরও জল।
প্রথমজন	উঠে আসছে, স্যার।
দ্বিতীয়জন	হু-হু করে!
কমান্ডার	ডোন্ট ইউ ওআরি। ডুবতে দাও। এটা ছিল প্যাসেঞ্জার শিপ, আমাদের হাতে পড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফ্রিগেট, এখন ডুবে গিয়ে হয়ে ওঠবে সাবমেরিন। তখন আমেরিকার কার্গো এসে টোঁ করে মিডল ইস্টে নিয়ে ভিড়িয়ে দেবে। কী?

লেখক: ভারতীয় গণমাধ্যমকর্মী

মুক্তিযুদ্ধের বছর ১৯৭১

নিজামউদ্দিন আহমদ

দিনটি ১৯৭১ সালের ৫ জুলাই। চট্টগ্রাম শহরের হাজারী লেনে আমাদের শেল্টার হিসেবে ব্যবহৃত আধপোড়া বাড়িটিতে এক সহযোগীর জন্য আমরা তিন তরুণ অপেক্ষা করছিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। হঠাৎ 'হ্যান্ডস আপ' শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠি। কয়েকজন বাঙালি যুবক ও পাকিস্তানি সৈন্য রিভলবার ও চাইনিজ রাইফেল তাক করে আমাদের ওপর চড়াও হয়। দ্রুত তল্লাশি চালিয়ে তারা একটি রিভলবার ও দুটি গ্রেনেড উদ্ধার করে শেল্টারের একটি কক্ষ থেকে। পিঠের উপর দুই হাত বেঁধে নিয়ে আমাদের তিনজনকে তারা তুলে নেয় একটি উইলি জিপে। আরও একটি জিপে অন্যরা আমাদের ফলো করে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে দ্রুত জিপ চালিয়ে পাঁচ মিনিটে তারা আমাদের নিয়ে পৌঁছে যায় কুখ্যাত গুডস হিলে। পাহাড়ের উপর অবস্থিত ওই বাড়ির মালিক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধের সময় সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পৈতৃক বাড়িটি স্থানীয় লোকজনের কাছে 'টর্চার সেল' হিসেবেই পরিচিত ছিল। জিপ থেকে আমাদের নামানোর পর সাদা পোশাকধারী এক যুবক চিৎকার দিয়ে বলে উঠল 'মিশন সাকসেসফুল, মিশন সাকসেসফুল'।

আমাদের উপস্থিত করা হলো টুপি-পাঞ্জাবি-পাজামা পরা ফজলুল কাদের চৌধুরীর সম্মুখে এবং বলা হলো, আমরা দুষ্কৃতকারী ভারতীয় এজেন্ট। তার সম্মুখে টেবিলে রাখা হলো রিভলবার ও গ্রেনেড দুটি। তিনি খুব রেগে গেলেন। চিৎকার দিয়ে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, "শালা, তোরা মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিস? তোরা 'জয় বাংলা, জয় বাংলা' বলছিস। আর হিন্দুরা ধুতির গোছা

নাড়ছে...।" তিনি তেড়ে এসে আমাকে শার্টের কলার চেপে ধরে কিল-ঘুসি মারতে থাকেন। তিনি ক্ষান্ত হতেই অন্যরা এসে আমাদের তিনজনকে তিনটি পৃথক কক্ষে নিয়ে যায়। একসময় পাকিস্তানের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পার্লামেন্টের স্পিকার থাকার সুবাদে ফজলুল কাদের চৌধুরীর একটি ন্যূনতম ভাবমূর্তি এদেশে ছিল। আমাকে কিল-ঘুসি মারার সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করায় তার সেই ভাবমূর্তি আমার সামনে খানখান হয়ে ভেঙে যায়। আমি তাকে তখন শ্রদ্ধার বদলে ঘৃণা করতে শুরু করি।

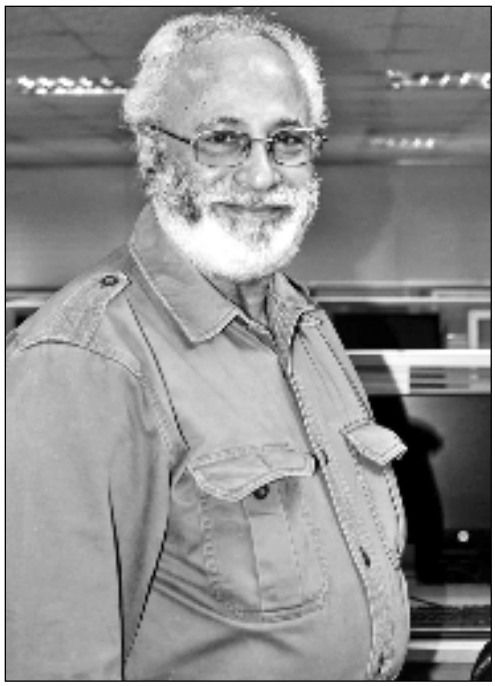

নিজামউদ্দিন আহমদ

পিঠের উপর হাত বাঁধা অবস্থায় আমাকে চার-পাঁচজন মিলে রাবার মোড়ানো লাঠি দিয়ে একসঙ্গে আঘাত করতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। তারা জানতে চায় আমাদের দলে আর কে কে আছে। আমরা কবে ভারতের কোন প্রশিক্ষণশিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমাদের হাতে কত অস্ত্র আছে ইত্যাদি। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে অত্যাচারের তাণ্ডব। আমার শারীরিক অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লে তারা কিছুক্ষণ আমাকে রেহাই দিত। পরে আবার শুরু করত প্রশ্ন ও অত্যাচার। নির্যাতন চলাকালীন ফজলুল কাদের চৌধুরী মাঝেমধ্যে কক্ষে প্রবেশ করতেন এবং আমাকে গালাগাল করতেন। তিনি বলেন, তোরা হিন্দু হয়ে গেছিস। তোরা জানিস না যে, শেখ মুজিব ইন্ডিয়ার এজেন্ট। দেশ স্বাধীন করার মানে দেশ ভারতের হাতে তুলে দেওয়া। তোরা তা বুঝছিস না।

শারীরিক নির্যাতনের একপর্যায়ে মুমূর্ষু অবস্থায় তারা আমাকে ফজলুল কাদের চৌধুরীর অন্দরমহলে নিয়ে যায়। আমাকে সেখানে চৌধুরীর এক ছেলে ও এক মেয়ে হাসিঠাট্টা করে অপমান করে। পর্দার আড়াল থেকেও অনেক মহিলা আমাকে লক্ষ করে অনেক কিছু বলতে থাকে। পরে বুঝতে পারলাম দুষ্কৃতকারী কাকে বলে, তা দেখানোর জন্যই আমাকে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, তাদেরকে সেসময় পাকিস্তানের দালালরা দুষ্কৃতকারী হিসেবে আখ্যায়িত করত। কিছুক্ষণ পর আমাকে আবার সেই আগের কক্ষে নিয়ে আসা হয় এবং আবারো শুরু হয় নির্যাতন ও প্রশ্নপর্ব। মধ্যরাতের পর নির্যাতনকারীরা পরিশ্রান্ত হলে আমাকে গুডস হিলের একটি গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন সশস্ত্র পাকিস্তানি সেনা আমাদের পাহারায় নিয়োজিত হয়। ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং তার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাকে নিয়ে গুডস হিলে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এই পাকিস্তানি সেনাগুলো সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে সংঘটিত আলশামস বাহিনীকে সরাসরি সহযোগিতা করত।

পিঠের উপর আমার দুই হাত বেঁধে একটি পিলারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। লাঠির আঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে ফেটে যায় এবং আমি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল–আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। মনে হচ্ছিল–গুলি করে মেরে ফেললেই বরং ভালোই ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আনা হয় আমাদের অপর দুজনের একজনকে, যার নাম ছিল সিরাজ। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম তাঁর ওপরও যথেষ্ট নির্যাতন করা হয়েছে অন্য একটি কক্ষে। পরে জানতে পেরেছি আমাদের তিনজনের অপরজন ওয়াহিদকে ওই রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

সন্ধ্যা ৭টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নির্যাতন চলাকালে পানির পিপাসা বা খিদে কিছুই আমার অনুভূত হয়নি। তারাও সারারাত আমাদের কিছু খেতে দেয়নি। পরের দিন সকালে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের পরোটা-চা খেতে দেয়। খাওয়ার জন্য তারা আমাদের হাত খুলে দেয়। কিন্তু নির্যাতনে হাত ও আগুলের অবস্থা এতটা খারাপ ছিল যে, পরোটা ছিঁড়তে পারিনি। চেহারা ও মুখে আঘাতজনিত কারণে ব্যথা অনুভব করছিলাম, পরটা মুখে তুলতে পারলেও চিবুতে পারতাম কি না জানি না। আমি পানির গ্লাস ও চায়ের কাপ হাত দিয়ে ধরতে না পারায় কিছুই খেতে পারিনি। ওইদিন ৬ জুলাই সন্ধ্যায় আবারো নেওয়া হয় আমাকে সেই নির্যাতন করার কক্ষে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা সংস্থা ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কয়েকজন সদস্য আমাকে খালি হাতে কিল-ঘুসি দিয়ে নির্যাতন করে এবং একই ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। ওই রাতে একটি জিপে করে আমাদের নেওয়া হয় নিয়াজ স্টেডিয়াম (বর্তমানে এমএ আজিজ স্টেডিয়াম) টর্চার সেলে। জিপ থেকে নামানোর পর দুজনকে দুই পাকিস্তানি সেনা এসে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করতে করতে ভেতরে খেলোয়াড়দের সাজঘরে নিয়ে যায়।

সেখানে অনেক জানা, চেনা-অচেনা যুবককে আটক অবস্থায় দেখতে পাই। তাঁদের শারীরিক অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছিল তাঁদেরকে যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে আবারো শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন আরেকটি পৃথক কক্ষে। মধ্যরাত পর্যন্ত থেমে থেমে চলে এই নির্যাতন। পরে আনা হয় খেলোয়াড়দের সেই সাজঘরে। প্রতি দুই ঘণ্টা পর পাহারাদার সেন্ট্রির বদল হতো। নতুন সেন্ট্রি এসেই প্রত্যেককে রাইফেলের বাঁটদ্বারা একটা ঘা দিয়ে তাঁর ডিউটি শুরু করত।

১৩ জুলাই সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও শারীরিক নির্যাতন। সকাল-দুপুর-রাতে তারা আমাদেরকে ডাল ও রুটি খেতে দিত। মাঝেমধ্যে চাও পরিবেশন করত। হাত-মুখ ধোয়া বা গোসল করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফ্লোরেই শুয়ে ঘুমাতে হতো। অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় টয়লেটে আমাদের প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হতো। ১৩ জুলাই রাতে আমাকে ও সিরাজকে একটি ট্রাকে তুলে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাঠানো হয়। সেখানে ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের এক কর্মকর্তা তার সৈনিকদের সহযোগিতায় আমাদের আবার জিজ্ঞাসাবাদ ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। আমরা মনে করেছিলাম ওই রাতেই হয়তো তারা আমাদের হত্যা করবে। আল্লাহর রহমতে তারা শেষ পর্যন্ত সদয় হয়। আমাদের হত্যা না করে তারা পাঠিয়ে দেয় চট্টগ্রাম কারাগারে। মধ্যরাতের পরেই একটি ট্রাক আমাদের নিয়ে চট্টগ্রাম কারাগারে পৌঁছে ।

সিরাজ আর আমি প্রথম কয়েকদিন ছিলাম জুভেনাইল বা কিশোরদের ওয়ার্ডে। পরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় কনডেমড সেলে।

কনডেমড সেল হচ্ছে একটি আধা অন্ধকার কক্ষ, যেখানে শুধু একজনই ফাঁসির আসামি ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত বন্দি অবস্থায় থাকে। কিন্তু আমি সেখানে আরও পাঁচজনের সঙ্গে কক্ষটি শেয়ার করি। কারাগার থেকে দেওয়া পাটের পাতলা বিছানায় শুতে হতো। ওই কক্ষটিতে কোনো আলাদা টয়লেট ছিল না। কক্ষের মুখেই পায়খানা-প্রস্রাব করার ব্যবস্থা ছিল। সুইপার এসে পরে পরিষ্কার করে দিত। একজন যখন প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিত, তখন অন্যরা উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখত। সপ্তাহে একবার সামান্য পানি দিয়ে গোসল করার নামে কোনো রকম গা মুছে নেওয়া যেত। নভেম্বরের শেষ ভাগ পর্যন্ত আমি সেই কনডেমড সেলে বন্দি অবস্থায় ছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আমি চট্টগ্রাম কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। আমরা তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে আমি তৃতীয়। বাবা জহির উদ্দিন আহমদ ছিলেন সরকারি মুসলিম হাইস্কুলের শিক্ষক। আমাদের পৈতৃক বাড়ি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার আধুনগর গ্রামের সুফি মিয়াজীপাড়ায়। আমরা চট্টগ্রাম শহরের চকবাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতাম।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচার দেখে সংকল্প নিয়েছিলাম–যে কোনোভাবেই হোক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। ছাত্র অবস্থায় রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না বিধায় সদলবলে আমি ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারিনি। পরে একা ভারতে যাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। তবে ছাত্রাবস্থায় ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কো (বর্তমানে বিএনসিসি)-এর সদস্য থাকায় আমি রাইফেল, স্টেনগান এবং লাইট মেশিনগান অপারেট করতে জানতাম। মনে আস্থা ছিল যে অস্ত্র এবং সুযোগ পেলেই আমি পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারব।

জুনের প্রথমদিকে সিদ্দিক নামে এক ছেলে এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সে জানায় সে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে hit-and-run গ্রুপের সদস্য হিসেবে। সে জানায়, তার কাছে একটি রিভলবার ও দুটি গ্রেনেড আছে এবং প্রয়োজনে আরও সাপ্লাই আসবে। সে আমাকে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করে। এই ফাঁকে সে সিরাজ এবং ওয়াহিদকেও সংগ্রহ করে নেয়। হাজারী লেনের আধপোড়া বাড়িটি ব্যবহার করার অনুমতি সে সংশ্লিষ্ট মুসলিম মালিক থেকে পেয়ে যায়। হাজারী লেন হলো হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। গণহত্যা শুরু হওয়ার প্রথমদিকেই পাকিস্তানি সৈনিকরা পুরো এলাকাটি জ্বালিয়ে দেয়।

ধরা পড়ার দিন আমরা এই সিদ্দিকের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সকাল থেকে সিদ্দিকের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। পরে জানতে পারি, সে আরেকজনের হাতে প্রতারিত হয়ে সালাহউদ্দিন কাদেরের হাতে ধরা পড়ে এবং নির্যাতিত হওয়ার পরে সে আমাদের আস্তানা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। সিদ্দিককের সঙ্গে যে প্রতারণা করেছিল, সে ছিল এক বিশ্বাসঘাতক মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ। ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে সে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আলশামস বাহিনীতে যোগ দেয় এবং তার পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের একে একে ধরিয়ে দেয়। সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা হলে ইউসুফ তাকে জানায়, ফজলুল কাদের চৌধুরীর দেওয়া পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে সে মুক্তিযুদ্ধে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে। তবে তাঁর জন্য প্রয়োজন হবে গুডস হিলে গিয়ে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা। সরলবিশ্বাসে সিদ্দিক ইউসুফের সঙ্গে গুডস হিলে গেলে তাঁকে সেখানে আটক করা হয়।

আমার ওপর নির্যাতন চলাকালে নির্যাতনকারীদের কথোপকথনে জানতে পারি যে, আমাদের যারা ধরে এনেছিল তাদের মধ্যে ছিল ফজলুল কাদের চৌধুরীর এক ছেলে (পুত্র)। তবে বুঝছি ওই ছেলেটি ছিল সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। এই ছেলেটিও আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করে।

দেশ স্বাধীন হলে ফজলুল কাদের চৌধুরীসহ কিছু পাকিস্তানি দালাল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে। যন্ত্রচালিত নৌকায় সমুদ্রপথে বার্মায় (বর্তমান মিয়ানমারে) পালিয়ে যাওয়ার সময় ফজলুল কাদের চৌধুরী ধরা পড়ে। অন্য দালালরা বিদেশে পালিয়ে যায়। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর তারা আস্তে আস্তে দেশে ফিরে আসে। ১৯৭৫ সালের পর দালালরা দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান নেয়। সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের হাত ধরে অন্য প্রতাপশালী দালালদের মতো সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীও দেশের মন্ত্রী হয়ে যায়।

তখন আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি যে, দালালদের কোনোদিন এ দেশে বিচার হবে। তারাও বিশ্বাস করত তাদের এদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে দালালি করার অপরাধে কোনো বিচার হবে না এবং তারা আজীবন এ দেশে রাজনৈতিক অঙ্গন দখল করে রাখবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের সহযোগিতায় তাদের বিচারের ব্যবস্থা করেন এবং পাঁচ বছরের মধ্যেই সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীসহ ৬ কুখ্যাত দালালের ফাঁসি হয়। আরও কয়েকজন দালাল আছে ফাঁসি ও বিচারের রায়ের অপেক্ষায়।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের সাবেক করেসপনডেন্ট

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

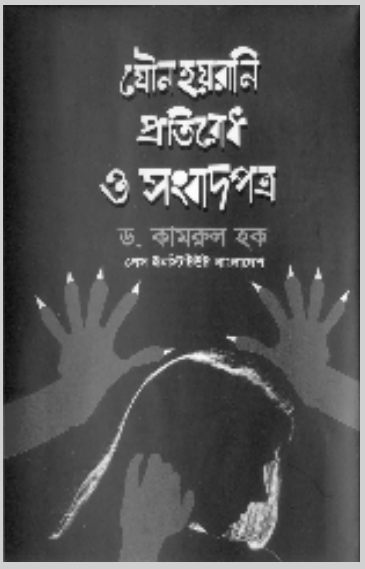

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

টিকতে না পেরে হানাদাররা আশ্রয় নিয়েছিল ঘাঘুটিয়ার মসজিদে

— সুধীর কৈবর্ত

পাকিস্তানি হায়েনার মুখগহ্বর থেকে কেড়ে নিয়ে আসা একটি শব্দ বাংলাদেশ। চড়া দামে কেনা আমার এ স্বাধীনতা। লাখো শহিদের রক্ত, মায়ের সামনে সন্তানের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ, সন্তানের সম্মুখে পিতার হত্যা। জীবন বাঁচাতে শুধুই ছুটে চলা, সে চলায়ও মৃত্যু। শঙ্কা, ভয়। চারদিকে আগুন আর বাঁচার আর্তনাদ। যুদ্ধের ময়দানে গুলি খেয়ে পড়ে থাকা বন্ধুর লাশ। কোটি শরণার্থীর নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ। অশ্রু, হত্যা। রক্তে ভেজা আমার বাংলার মাটি। উপরে শকুনের ঘোরাঘুরি, চারপাশে কাকের কা কা। পচাগলা লাশের গন্ধ। সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের খুবলে খাওয়া বীভৎস দেহ। শুকনো অশ্রু। এসবের মাঝেই জন্ম নেওয়া আমার এ বাংলাদেশ। লাল-সবুজের বিজয়গাথা। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল চ্যালেঞ্জিং। সেই রক্তঝরা দিনে স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় কণ্ঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে অস্ত্র হাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানো এক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক সুধীর কৈবর্ত। তাঁর দীর্ঘ নয় মাসের লড়াই-সংগ্রামে একটি খণ্ডযুদ্ধের স্মৃতি তুলে ধরেন।
অনুলিখন– **পপি দেবী থাপা**

বাঙ্গারামপুর থানায় ঘাঁটি গেড়ে বসা পাকিস্তানি হানাদারদের মধ্যে কদিন ধরেই অস্থিরতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর থেকেই তাদের এ অবস্থা। তারা কখন কী ঘটিয়ে বসে, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনাও চলছিল। ১৩ ডিসেম্বরের একটি ঘটনা চিন্তার

নিরীক্ষা

স্রোতকে আরও গতি এনে দেয়। লুট করে থানা এলাকায় নিয়ে যাওয়া কটি গোরু-ছাগল সেদিন বিকালে ছেড়ে দিয়েছিল হানাদাররা। সেকশন কমান্ডার বিষ্ণু দাস রেকি করতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, অবোধ প্রাণীগুলো কাঠের পুল দিয়ে থানা থেকে বাঙ্গ্-ারামপুর বাজারের দিকে নেমে আসছে।

বাঙ্গারামপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের কমান্ডার এএসএম মহিউদ্দিন আহমদ সেদিন বিকালেই জরুরি সভা ডাকেন। বাঙ্গারামপুরের অদূরে মনাকান্দি গ্রামে ডেকে পাঠান সব কজন প্লাটুন আর সেকশন কমান্ডারকে। সেকশন কমান্ডার বিষ্ণু দাস বাঙ্গারামপুর বাজার এলাকায় রেকি করতে গিয়ে যা যা দেখে এসেছেন, তা সভায় বর্ণনা করেন। সভায় হামলা চালাতে পারে, এ আশঙ্কার কথাই বললেন প্রায় সবাই। থানা কমান্ডার মহিউদ্দিনকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন, হানাদাররা যে কোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটাতে পারে। সবকটি প্লাটুনের মুক্তিযোদ্ধাদের যার যার অবস্থানে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন তিনি। সন্ধ্যায় সভা শেষে সবাইকে যার যার অবস্থানে চলে যেতে বলে নিজ শেল্টারের উদ্দেশে যাত্রা করেন কমান্ডার মহিউদ্দিন।

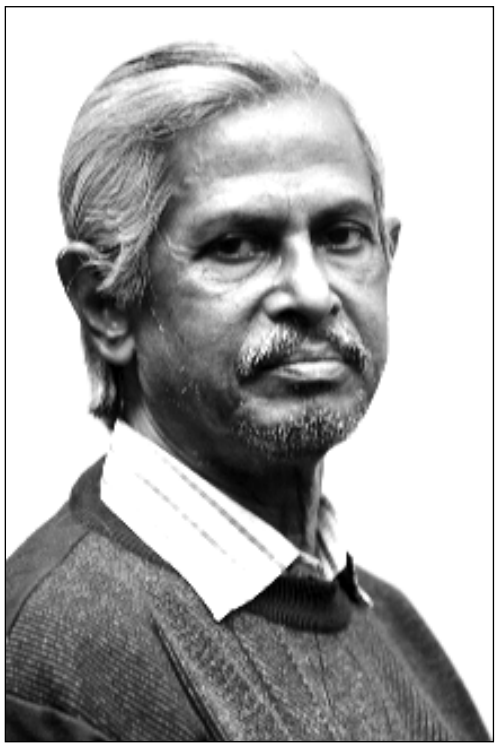

সুধীর কৈবর্ত

সেই রাতে আমি আমাদের সেকশনের কবীরকে নিয়ে মনাকান্দিতেই থেকে গেলাম। কবীরই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করল। পরের দিন ছিল ১৪ ডিসেম্বর। এ তারিখ, এ দিনের ঘটনাবলি কখনই ভোলার নয়।

দিনভর দুপক্ষই গুলি, পালটা গুলি ছোড়ে।

সেদিন কাকডাকা ভোরে আমরা দুজন সেকশনের শেল্টার আয়ুবপুর যাত্রা করি। ভারতে মা-বাবাকে রেখে দেশে ফেরার পর থেকে আমি সেকশন নিয়ে আয়ুবপুরেই থাকতাম। মনাকান্দি ছেড়ে আসার আগে কিছু খেয়ে নেওয়ার কথা বলে কবীর। আমরা রাতে আশ্রয় নিয়েছিলাম একটি তাঁতের কারখানায়। ওই কারখানার মালিকের বাড়িতেই দুজনের সকালে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। আমি খেতে চাচ্ছিলাম না। কারণ এত ভোরে কাউকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না।

তখন ডিসেম্বরের প্রায় মাঝমাঝি। ভীষণ শীত। উত্তরে বাতাসে কনকনে ঠান্ডা। সেই সঙ্গে আকাশভাঙা কুয়াশা। রাত আর ভোরের কুয়াশায় ভিজে একেকজন মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব কালো বর্ণ নিয়েছিল। আমি বাম কাঁধে এসএমজিটা ঝুলিয়ে চাদরে গা-মাথা মুড়িয়ে নিই। কবীরেরও একই অবস্থা। তার রাইফেলটাও চাদরে ঢাকা পড়েছে। শীতের তীব্রতায় কান-চোখ-মুখ যেন অবশ হয়ে আসছিল। ঘন কুয়াশায় আশপাশের প্রায় সবকিছুই অস্বচ্ছ।

মনাকান্দির সড়কপথে উঠে দুজনেই হকচকিয়ে গেলাম। এত ভোরে সংকীর্ণ এ সড়কে অনেক মানুষ। এমন সময় দূরে কোথাও কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ। ব্যাপারটা অনুমান করার চেষ্টা করলাম। পাকিস্তানি হানাদাররা নিশ্চিত কোথাও চড়াও হয়েছে। আমি আর কবীর কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম, ঝগড়ারচর গ্রামে আক্রমণ চালিয়েছে হানাদাররা। এরই মধ্যে ঝগড়ারচরের কটি পরিবার মনাকান্দিতে উঠে এসেছে।

ভাবনায় পড়ে গেলাম, কী করি? এরই মধ্যে উত্তরদিক থেকে মতিনকে ছুটে আসতে দেখলাম। ওর ডান হাতে ঝুলছিল রাইফেল। মতিন প্রথমদিকে আমার সেকশনেই ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে ওর গতি শ্লথ হয়ে আসে। ও হাঁপাতে হাঁপাতে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন ওর দুচোখে রক্ত জমে উঠেছিল যেন। অবয়বজুড়ে ক্রোধ আর যন্ত্রণার ছাপ। বুঝলাম ও টানা দৌড়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করার আগেই ও দ্রুত বলতে শুরু করে, 'আমি বাঙ্গারামপুরের ওই মাথার থেকে এসেছি। ফজরের ওয়াক্তে রেকি করতে বেরিয়েছিলাম। মনে হয় পাঞ্জাবিরা যাচ্ছে। ওদের বাধা না দিতে পারলে তামাম দুনিয়া ছারখার করে দিয়ে যাবে।' মতিনের ভেতর তীব্র হতাশাজনিত অস্থিরতা। আমার শরীর-মনে বিদ্যুৎ খেলে গেল। হঠাৎ করেই ধমনির ওঠানামা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে বাড়ল উষ্ণতা। ওই শীতেও শরীর তেতে তেতে উঠছিল। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিই। ঝটপট লুঙ্গি আর চাদর খুলে ফেলি। পরনে হ্যাফপ্যান্ট আর চাইনিজ শার্ট। এসএমজি, লুঙ্গি আর চাদরটা কবীরের হাতে দিয়ে ওর কাছ থেকে রাইফেল আর যে কয় রাউন্ড বুলেট ছিল ছোঁ মারার মতো করে নিয়ে নিই।

কবীরকে বললাম, তুমি ডবল মার্চ করে আয়ুবপুর চলে যাও। আমাদের সেকশনের সবাইকে আর যাদের পাবে খবর দিবে। আমরা ঝগড়ারচর যাচ্ছি। এই বলে মতিনকে নিয়ে রওয়ানা করি। ডবল মার্চ করে এগোতে থাকি। পূর্ব-দক্ষিণ কোনাকুনি উজানচর যাওয়ার সড়ক। সড়কের উলটোদিকে তিতাস নদীর পশ্চিম পারে ঝগড়ারচর। আমরা সড়কের কাছাকাছি চলে আসি। দেখি, ওপারে অনেক মানুষ। কুয়াশার কারণে পক্ষ-বিপক্ষ নির্ণয় করা যাচ্ছে না। আমি চলার গতি শ্লথ করে রাইফেল তাক করতে গেলে মতিন বাধা দেয়। বলে ওঠে, 'গুলি ছাইড়েন না দাদা! মনে হয় গেরামের মানুষই!'

ওর অনুমানই সত্যি হয়। ঝগড়ারচরের মানুষজন এসে সড়কে উঠেছে। মোটর লঞ্চ ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠুসঠাস গুলিও হচ্ছে। মনে হচ্ছিল, পাকিস্তানি হানাদাররা কাভারিং ফায়ার করে এগোচ্ছে। এরই মধ্যে রোদের প্রখরতায় কুয়াশা দ্রুত কাটতে লেগেছে। হঠাৎই মর্টারের গোলা ফাটার শব্দ। অনুমান করার চেষ্টা করি, কোথায় হলো শব্দটা। মুহূর্তক্ষণও দেরি না করে মতিনের দিকে দৃক্পাত করে সড়ক থেকে দ্রুত নেমে ঝগড়ারচড়ের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে ছুটি। মতিন আমাকে অনুসরণ করে। ছুটতে ছুটতে মতিনকে বলি, ঝগড়ারচরের দক্ষিণ মাথায় গিয়ে এখনই পাঞ্জাবিদের বাধা দিতে হবে। তারা উজানচরে উঠে গেলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মতিন আমার কথায় একমত হয়।

কিছু সময়ের মধ্যে আমরা ঝগড়ারচরের দক্ষিণ দিকটায় এসে পৌঁছাই। এটা হোমনা থানার মধ্যে। পশ্চিমমুখো গুটিকয় দুচালা ঘর। টিনের চালা ঘরের, মুলি-সোলার বেড়া আর দুয়ার। ঘরগুলোর কাছ ঘেঁষে কলাগাছ আর কয়টা আমগাছ। জনমানুষের সাড়াশব্দ নেই। হানাদারদের গোলাগুলির শব্দেই হয়তোবা সবাই অন্যত্র সরে পড়েছে।

ততক্ষণে কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদে চারদিক ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। তিতাসের পার দিয়ে দক্ষিণে এগোচ্ছে পাকিস্তানি হানাদাররা। হাতে চাইনিজ রাইফেল। মাথায় হেলমেট। মতিন একটি ঘরের আড়াল থেকে হানাদারদের তাক করে গুলি ছোড়ে। কয়েক রাউন্ড গুলি হওয়ার পর টের পেয়ে যায় হানাদাররা, কোথা থেকে গুলি হচ্ছে। তাদের দিক থেকেও এলোপাতাড়ি গুলি ছুটে আসতে থাকে। দুপক্ষই রেঞ্জের মধ্যে। আমি একটা ঘরের পাশের কলাগাছের আড়াল থেকে গুলি ছুড়তে থাকি। আর একটু এগিয়ে আড়াল থেকে বের হতেই পাকিস্তানি বাহিনীর ছোড়া গুলি শাঁ শাঁ শব্দে আমার ডান কানের পাশ ছুঁয়ে যায়। আমি সতর্ক হয়ে গেলাম।

কজন হানাদার ঝগড়ারচরের ঠিক দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে পশ্চিমে এগোচ্ছে। তিতাসের এই পার ঘেঁষে উজানচরের দিক এগিয়ে যাচ্ছিল একটা ছোটো লঞ্চ। হানাদাররা উজানচর উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে যদি এরই মধ্যে পৌঁছে যায় তো ভীষণ বিপদ হবে। আমরা হানাদারদের ফাঁদেও পড়ে যেতে পারি।

চাপা কণ্ঠে মতিনকে নির্দেশ দিই, 'ফায়ার করতে করতে পেছনে হট!' আর আমি উপুড় অবস্থায় রাইফেলের গুলি ছুড়তে ছুড়তে পিছু হটতে থাকি। দুইজনে একটা ঢালু স্থানে নেমে আসি। এরপর সড়কে উঠে ছুটতে থাকি উজানচরমুখে। উচ্চবিদ্যালয়ের উত্তরদিকের ঢালু স্থানটায় এসে পরিস্থিতি দেখে আঁতকে উঠি। দেখি, বিদ্যালয়ের পূর্বদিকের খাদের মতো স্থানটায় কজন হানাদার বিদ্যালয়ের দিকে তাক করে একটা ভারী মেশিনগান বসাতে চেষ্টা করছে। পেছন থেকে কাভারিং ফায়ার পাচ্ছে তারা। উপরে বিদ্যালয়ের পাকা ভবনের কক্ষের জানালাগুলো থেকে মুক্তিযোদ্ধারাও গুলি ছুড়তে থাকায় মেশিনগানটা বসাতে হিমশিম খাচ্ছে হানাদাররা।

আমি আর মতিন অবস্থান নিয়ে গুলি ছুড়তে থাকি। এই ফাঁকে আরও কজন মুক্তিযোদ্ধা এসে হাজির হয়। খাদের হানাদাররা ডানদিক থেকে গুলি হচ্ছে দেখে হকচকিয়ে যায়। বিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধারা এসএলআর এবং ৩০৩ রাইফেল ব্যবহার করছে। আমাদের সঙ্গে হেভি তো দূরের কথা, একটা লাইট মেশিনগানও ছিল না। আমি একটা আমগাছের আড়াল থেকে গুলি ছুড়তে থাকি। হঠাৎ গুলি ছোড়া বন্ধ রেখে মুহূর্তক্ষণ ভেবে নিয়ে বিদ্যালয়ের দিকে ছুটে যাই।

বিদ্যালয়ের মাঠে এসে একটা দুঃসংবাদ পেলাম। থানা কমান্ডার মহিউদ্দিন আহমদ আহত হয়েছেন। তিনি বিদ্যালয় থেকে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কমান্ড দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ছোড়া মর্টারের স্প্লিন্টার বিঁধে গুরুতর আহত হন। তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। খবরটা শোনামাত্রই আমার শিরদাঁড়ায় একটা হিমেল শিহরণ খেলে গেল। পরক্ষণেই চেতনায় তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করেছিলাম। রোমকূপে অনুভূত হয়েছিল নিঃশব্দ গর্জন।

আমি বিদ্যালয়ের পাশের খাদ বরাবর শ্রেণিকক্ষটায় ঢুকে পড়ি। দেখি, জানালার কাছে বসে এসএলআর থেকে গুলি ছুড়ছেন ভেলানগরের গোলাম মোস্তফা। পাশের অন্য জানালা থেকে আরও দুজন। আমি উপুড় হয়ে ডান হাতে মোস্তফার ডান কাঁধে চাপ দিতেই তিনি চমকে উঠে বামে চোখ তুলেন। জিজ্ঞেস করি, 'কী অবস্থা মোস্তফা ভাই?' উনি বলেছিলেন– 'অ! দাদা! আর অবস্থা! মনডায় ত কয় বেশিক্ষুণ টিহন যাইতো না। এসএলআর, ৩০৩ দিয়ে আর কতক্ষুণ লড়ন যাইব? পাঞ্জাবিরা গাতাত মেশিনগানডা পাইত্তালতারলে ঠাইট মারা যাম্।' দ্রুত বলে মোস্তফা আবার গুলি চালাতে তৎপর হন।

কিন্তু আমরা বেশি আর কী করতে পারি বলেন? আমাদের একটা এলএমজি পর্যন্ত নেই। ফরদাবাদের কোম্পানিতে শুনেছি এলএমজি আছে। কিন্তু তারাইবা কখন এসে পৌঁছাবে, এরও তো কোনো ঠিক নেই। এখন মান-অভিমান না করে আগে তাদের একটা খবর দেওয়া দরকার।

আমি কিছু সময় চুপ করে থাকি। কী যেন একটা ভেবে বলি, মোস্তফা ভাই! আপনি রাইফেলটা নিয়ে এসএলআরটা দেন।

বসা অবস্থায় মোস্তফা ভাই দুহাতে এসএলআরটা আমার দিকে উঁচিয়ে ধরেন। আমি ততক্ষণে আমার ডান কাঁধে ঝুলানো রাইফেলটা বাম হাতে সরিয়ে নিয়েছি। ডান হাতে মোস্তফার কাছ থেকে এসএলআরটা নিয়ে রাইফেলটা তার হাতে তুলে দিই। মোস্তফা আগ্নেয়াস্ত্রটা কাত করে এর নলটা জানালা দিয়ে গলিয়ে ট্রিগার টিপেন।

আমি কিছুক্ষণ এসএলআরটা নাড়াচাড়া করে এর সেফটি কেসটা খুলে ফেলি। মোস্তফা ভাইকে ডাক দিই। জানালার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মুখ তুলে মোস্তফা আমার দিকে তাকান। বলি, নিন আপনার এসএলআর। এবার অটোমেটিক গুলি বের হবে। তবে সাবধান, চেম্বার বেশি গরম হতে দেবেন না। তাহলে কিন্তু বার্স্ট করবে।

মোস্তফা ভাই রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে এসএলআরটা প্রায় লুফে নিয়ে প্রাণঘাতী যন্ত্রণায় চেম্বারে চুমু খান। তার রক্তবর্ণ দুচোখে ক্রুর হাসি খেলে গিয়ে এর রেশ ছড়িয়ে পড়ে তার কালো ভয়াল অবয়বে। তিনি সেফটি কেসটি আমার কাছ থেকে নিয়ে প্যান্টের বাম পকেটে রাখেন।

বললেন, 'দাদা, আল্লাহর রহমতে এইবার বান্দির পুতাইনগরে আর জিন্দা ফেরত যাইত দিতাম না।' মোস্তফা দুচোখ মুদিত করে মুহূর্তক্ষণ মাথা উপরমুখী করলেন। এরপর চোখ মেলে বিদ্যুদ্‌বেগে গুলিভরা একটা ম্যাগাজিন জুড়ে নিয়ে এসএলআরের নলটা জানালার বাইরে গলিয়ে ট্রিগার টিপলেন তিনি। গড়ুড়ুৎ শব্দ করে একঝাঁক গুলি বের হয়ে গেল।

আমার চোখ গেল পাঞ্জাবি হানাদারের ক্ষত স্থানটায়। ওই তরুণটার হয়তোবা গোলাম মোস্তফার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে।

উজানচর উচ্চবিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে মোস্তফার এসএলআরটা স্বয়ংক্রিয় করে দিয়ে কিছু সময় পর নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে বের হয়ে আসি আমি। বিদ্যালয় মাঠে কারোর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো না। সবাই লড়াইয়ে ব্যস্ত। কারোর দিকে একদণ্ড তাকানোরও সময় নেই। আমি বাম হাতে ধরে থাকা রাইফেলটা ডান কাঁধে ঝুলিয়ে বাঞ্ছারামপুরের পথে হাঁটা শুরু করি।

পড়ন্ত বিকেলে ফের যখন উজানচর ফিরে আসি, তখন যুদ্ধের উন্মাদনা অনেকটাই নেমে এসেছিল। মোস্তফার স্বয়ংক্রিয় করে দেওয়া এসএলআরের গুলির মুখে বেশি সময় টিকে থাকতে পারেনি পাঞ্জাবিরা। দুপুরের মধ্যে তাদের মেশিনগান ফিট করার সাধ মিটে গিয়েছিল। বিপদ আসন্ন বুঝতে পেরে হেভি মেশিনগানটা ফেলে রেখেই তারা তীরে ভিড়ানো লঞ্চটায় গিয়ে ওঠে। তিতাসের ওপার তীরে লঞ্চ ভিড়িয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিল ঘাঘুটিয়া গ্রামের মসজিদে। পরিস্থিতি এতটাই দ্রুত তাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছিল যে, নিহত বা আহত সঙ্গীদের দিকে তাকানোর সময় অবধি তারা পায়নি।

পরের দিন ১৫ ডিসেম্বর আহত থানা কমান্ডার এএসএম মহিউদ্দিন আহমদকে দুপুরের দিকে দেখতে যাই। দেখি, তাঁর অবয়ব ক্লিষ্ট। পায়ের ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা হচ্ছে, এটা বোঝা যাচ্ছিল। তাঁর ডান পায়ে বিঁধে যাওয়া স্প্লিন্টার খুলে ফেলে ব্যান্ডেজ দেওয়া হয়েছে। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। একটা চৌকিতে শুয়ে ছিলেন, আমাকে দেখে আপত্তি করা সত্ত্বেও উঠে বসলেন। এরপর চৌকির এক পাশে দুই পা-ই নামিয়ে বসে আমাকে বসতে বললেন। আমি কিছুটা দূরত্বে চৌকির এক পাশে বসি।

বলেন, আমি সব শুনেছি সুধীর। তুমি না থাকলে কী যে হতো! তোমার ওপরে আমার অনেক ভরসা। বেশি দেরি করো না। উজানচর চলে যাও। সেখানেই থাকবা।

বলি, না মহিউদ্দিন ভাই, এর মধ্যে আমাকে আর থাকতে বলবেন না। তাছাড়া যুদ্ধ তো একরকম শেষই। উনি বলেন, পাঞ্জাবিরা সবাই ধরা পড়েনি। শুনছি, 'গাণ্ডইট্টা'র মসজিদে ঘাঁটি করেছে। ওরা যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে।

আমি থানা কমান্ডারের চোখে তাকিয়ে বলি, পাঞ্জাবিরা আমাদের কাছে সারেন্ডার করবে না। হোমনা থানা কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাদের কাছে টু ইঞ্চি মর্টার চেয়েও পাওয়া যায়নি। হোমনা থেকেই তারা মর্টারের শেল ছোড়ছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শেল তিতাসের জলকেই শুধু আলোড়িত করছে। অবশ্য এতে করে ভালো ফলও একটা হয়েছে বৈকি। আমাদের কাছে মর্টার আছে ভেবে হানাদাররা নিশ্চিত মনোবল হারাচ্ছে।

মহিউদ্দিন ভাই উপর-নিচ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'ঠিক বলেছ। ইন্ডিয়ান আর্মি ছাড়া ওরা আর কারও কাছেই সারেন্ডার করবে না।' তাকে চিন্তিত মনে হলো। তিনি অনেকটাই বাধ বাধ কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা সুধীর, এক কাজ করলে হয় না। শুনলাম, মওলানারা নাকি ফতোয়া দিছেন, দরকার হইলে মসজিদের ভেতরেও পাঞ্জাবিদের ওপরে হামলা চালানো যাবে। তুমি কী বলো?' এ কথা বলে মহিউদ্দিন ভাই আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলেন। মুহূর্তক্ষণ ভেবে নিয়ে বলি, না মহিউদ্দিন ভাই, তা হয় না! এটা করা কিছুতেই ঠিক হবে না। একটা ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রাণহানি, রক্তক্ষয়? নাহ্, এ হয় না! কিছুতেই হতে পারে না। মহিউদ্দিন ভাই কিছু সময় ভাবলেন। এরপর বলেন, সুধীর তোমার কথাই ঠিক। তবে আমার একটা অনুরোধ, পাঞ্জাবিদের যে কয়দিন সারেন্ডার করানো না যায়, সে কয়দিন উজানচরেই থাকবে।

এরপর আর না বলতে পারলাম না। সম্মতি জানিয়ে আবার দেখতে আসব বলে বিদায় নিয়েছিলাম। উজানচরের পথে হাঁটতে থাকি। খোসকাকান্দি গ্রামের সীমানা পেরোতে না পেরোতেই পড়তে হলো এক পাকিস্তানি সৈন্যের লাশের সামনে। সৈন্যটির বয়স উনিশ-কুড়ি বছর হবে।

এখন এ বিকেলে ওখান থেকেও গুলি আর টু ইঞ্চি মর্টারের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তবে গতকালের সেই প্রচণ্ডতা নেই। লাশটাকে ঘিরে থাকা মানুষজনের সেই মালুমও নেই। ভীষণ প্রাণবন্ত লাগছে তাদের। চার-পাঁচজন মাঝবয়সি মহিলা এবং লুঙ্গি, শাড়ি, ফ্রক, প্যান্ট পরা দ্বিগুণসংখ্যক শিশু-কিশোরও রয়েছে সেই জটলায়। সবারই অবয়বে খুশির আভা।

পাকিস্তানি হানাদাররা এ তল্লাটে আসার পর থেকে নিদারুণ শঙ্কা, মানসিক দ্বন্দ্ব আর দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়েছে এলাকার মানুষকে। সেই মুহূর্তে সেই রেশও আর নেই। স্বস্তি আর প্রশান্তি সেই স্থানজুড়ে বসার পাশাপাশি ক্রোধের প্রকাশও তীব্র। যাতে প্রশ্রয় পেয়েছিল পালটা হিংস্রতা। এমনকি মহিলারা পর্যন্ত স্থানীয় ভাষায় লাশটার বাপান্ত করতে ছাড়েনি।

উজানচর উচ্চবিদ্যালয় ভবনের পূর্বদিকের ঢাল বেয়ে অনতিদূরে যে খাদটা, লাশটা আনা হয়েছিল সেখান থেকে। লোকজনও সে রকম বলাবলি করছিল। ক্রমে মানুষের ভিড় আরও বাড়তে থাকে। একেকজন আসে আর জানতে চায় লাশটার বৃত্তান্ত।

মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত পাকিস্তানিদের লাশ আনার হুজুগ কাল বিকালেই উঠেছিল। মুক্তিবাহিনী জিতেছে। এই প্রথম বড়ো ধরনের একটি খণ্ডযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন বাঙ্গারামপুর থানা কমান্ডারের মুক্তিযোদ্ধারা। হানাদারদের কেউই ধরা পড়েনি। অথচ এত বড়ো একটি যুদ্ধ জয়ের প্রমাণ এলাকাবাসীর সামনে শীঘ্রই তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন। আর তাই এ হানাদারের লাশ নিয়ে আসা।

হঠাৎ করেই শূন্যতা বোধ করি। মা-বাবা, ভাইদের আর ছোট্ট বোনটিকে ভীষণ মনে পড়ছিল! ওরা তখন ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়দেশের শরণার্থীশিবিরে। কেমন আছে ওরা? ভেতরটা কেমন জানি হাহাকার করে ওঠে। কান্না পাচ্ছিল ভীষণ।

হঠাৎ দেখি প্রায় মাঝবয়সি এক মহিলা জটলার ভিড় ঠেলে সামনে এসে লাশটার দিকে তেড়ে আসছেন। তাঁর ডান হাতে একটা ঝাড়ু। স্থানীয় ভাষায় গাল পাড়ছেন লাশটার উদ্দেশে। ঝাড়ু দিয়ে পাকিস্তানি মৃত সৈনিকের মাথায়, শরীরে পেটাতে লেগে গেলেন। তা দেখে আমি সশব্দ উচ্চারণে বলতে চেয়েছিলাম, এটা একজন মানুষের লাশ। এর পৃথক কোনো সত্তা নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই! এ শুধুই মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের অপমান করবেন না। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। একটা সমন্বিত শক্তি–সন্তানহারা মা, সম্ভ্রম লুণ্ঠিতা বোন আর শহিদি আত্মার গগনবিদারী আর্তনাদে প্রকৃতির সব শব্দই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

এই সাংবাদিক সেই মুক্তিযোদ্ধা

শংকর কুমার দে

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কীভাবে রাজাকার বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের আটক করেছিলাম, এর একটা বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা '৭১-এর রণাঙ্গনে সোনারগাঁও' বইটিতে। বইটি লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাথা তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। লাল-সবুজের বইয়ের মলাট, সবুজের জমিনে সূর্যাকৃতির লাল গোলাকার বৃত্ত, লাল বৃত্তের মধ্যে আছে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচানো রাইফেলের মাথায় বেয়নেট। এটা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতীকের মনোগ্রাম। বইয়ের মলাটটি এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে এটা মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা বই। বইটিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানা এলাকার (সাবেক বৈদ্যেরবাজার থানা) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশবিশেষ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত নারী, পুরুষ, শিশুর, কঙ্কাল দেহের ছবি আছে বইটিতে। কঙ্কালের মধ্যে বসে থাকা কাক, কুকুর, শকুনের ছবি। এসব ছবি দেখলেই বোঝা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্দয়-নৃশংস নির্যাতনে নিহত হওয়ার নির্মম সব ঘটনাবলি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম-নৃশংস নির্যাতনের ছবি ছাড়াও আমারসহ বিশিষ্ট কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার ছবি দেওয়া হয়েছে। সম্মুখযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা আছে–মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এমন মুক্তিযোদ্ধার পাসপোর্ট সাইজের ছবির সঙ্গে তখন কোন মুক্তিযোদ্ধার কার কী ভূমিকা ছিল, সেটার উল্লেখ করা হয়েছে। বইয়ের লেখক মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী একটা সৌজন্য কপি পাঠিয়েছেন আমাকে। বইটির সৌজন্য কপি পাওয়াটা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের।

দুই.

মেঘনা নদীবক্ষে আমি ও আমার সহযোগীরা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কীভাবে মাছ ধরার জেলে সেজে রাজাকার বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের আটক করেছিলাম, সেটা এক দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর কাহিনি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য তৎকালীন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে (বর্তমান বাংলাদেশ) ১১টি সেক্টরে ভাগ করে। প্রতিটি সেক্টরকে আবার বেশ কয়েকটি সাব-সেক্টরে আলাদা করে একজন অধিনায়কের দায়িত্বে হস্তান্তর করা হয়। মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর একেএম শফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মোশাররফের নামের প্রথম ইংরেজি অক্ষর দিয়ে এই তিনটি ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' ও 'কে ফোর্স'। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম 'কে' ফোর্সের অধীনে ২নং সেক্টরের একজন মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও নোয়াখালী নিয়ে গঠিত হয় ২ নম্বর সেক্টর। মেজর খালেদ মোশাররফ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মেজর এটিএম হায়দার সেবছর ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। আমার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এটিএম হায়দার। তখন আমার বয়স ছিল সতেরো। নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। উনসত্তরের গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি আমি। ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সত্তরের নির্বাচনেও এমএনএ প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সফর আলী ভুঁইয়া (বৈদ্যেরবাজার-আড়াইহাজার নির্বাচনি এলাকা) এবং সাজেদ আলী মোক্তার এমএলএ (বৈদ্যেরবাজার নির্বাচনি এলাকা) প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই সময়ে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে ওই জনসভায় যোগ দিয়েছিলাম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

শংকর কুমার দে

তিন.

সময়টা ছিল একাত্তর সালের এপ্রিলের একেবারে শেষদিক। নারায়ণগঞ্জ জেলার তদানীন্তন বৈদ্যেরবাজার থানার অন্তর্গত নোয়াগাঁও ইউনিয়নের পরমেশ্বরদী নিজ গ্রামের বাড়ি থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশে রওয়ানা দিই। গন্তব্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায়। আমরা ছিলাম আরও কয়েকজন। পরমেশ্বরদী গ্রাম থেকে হেঁটে বারদী বাজার হয়ে মেঘনা নদীর তীর দিয়ে বৈদ্যেরবাজার লঞ্চঘাটে আসি। লঞ্চে বৈদ্যেরবাজার থেকে রামচন্দ্রপুর যাই। রামচন্দ্রপুরে রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরে নৌকায় আগরতলার উদ্দেশে রওয়ানা দিই। পথিমধ্যে আরও দুই জায়গায় রাত কাটাতে হয়। সিএন্ডবি রোডের পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম, এটা মনে পড়ে। সেখানকার একটি বাজারের কাছে গ্রামের বাড়িতে রাত কাটাই। রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প থেকে কানের পর্দা ফাটানো গুলির শব্দ শুনতে পাই। ভয়ে বুক দুরুদুরু করে কাঁপছিল। গভীর রাতে সিএন্ডবি রোড পার হয়ে ছোট্ট একটি নদীর কোমরসমান পানি মাড়িয়ে পার হয়েছি। এভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের সীমানার মধ্যে একটি গ্রামে পৌঁছাই। যদ্দূর মনে পড়ে, গ্রামটির নাম মাধবপুর। ত্রিপুরার হাফানি ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছাই। যাত্রাবিরতির পর সেখান থেকে চলে যাই আগরতলায়। বৈদ্যেরবাজার থেকে তিনদিন-তিনরাত লঞ্চ, নৌকায়, হেঁটে, নদী পার হয়ে অনিদ্রা, অনাহারে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত আরও অনেক ঘটনাই আছে, যা ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা করা কঠিন।

চার.

আগরতলায় পৌঁছে কয়েকদিন ধরে চিড়া, মুড়ি, গুড়, রুটি, শুকনা খাবার খেয়েছি। পিচঢালা মেঝের মাটিতে শুয়ে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করার কথা আজও মনে পড়ে। এক সপ্তাহ আগরতলায় ছিলাম। অনেক কষ্ট সহ্য করার মধ্যেই কলকাতায় চলে যাই। একাত্তর সালের মে মাসে কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি, বিশ্রাম নিই। এরপর আমার এক আত্মীয়ের সাহায্যে তখন পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর ব্লক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি। আমার জন্য মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামানের (জাতীয় চার নেতার একজন) কাছে একটি চিঠি লিখে দেন নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই চিঠিটি এখনো আমার কাছে সযত্নে রয়ে গেছে। মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান চিঠিটি একনজর পড়েই নির্দেশ দেন যেন আমি মুজিবনগর সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই। প্রায় দুই মাস মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ করি। এরপর কলকাতায় অবস্থিত মুজিবনগর সরকারের ভবনে কাজ করতে থাকি। মুজিবনগর সরকারের কার্যালয় ছিল কলকাতার থিয়েটার রোডের ৮নং বাড়িটিতে। এই বাড়িটির নাম শ্রী অরবিন্দ ভবন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায় যে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী কার্যালয় ছিল ৮নং থিয়েটার রোডের এই অরবিন্দ ভবনেই। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে প্রায় দুই মাস মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী কার্যালয়ে কাজ করি। তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা এখানে আসত, তাদের নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার কাজে যুক্ত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জয় বাংলা রেডিয়োর জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান ছিল এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র। এই অনুষ্ঠানটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি অভিহিত করতেন বিচ্ছু বাহিনী। আমার মধ্যেও বিচ্ছু বাহিনী হওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রেরণা জাগায়। এরই মধ্যে খবর পাই নারায়ণগঞ্জ জেলার বৈদ্যেরবাজার থেকে আমার পূর্বপরিচিত অনেকেই আগরতলায় এসেছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, প্রশিক্ষণ নিয়ে বৈদ্যেরবাজার এলাকায় চলে গেছে, অনেকে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। দেশ থেকে দলে দলে লোক চলে আসছে। আমিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মনস্থির করে ফেলি। কতক্ষণে কলকাতা থেকে আগরতলায় আসব, সেই প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে শুরু করি। সতেরো বছরের আমার এই তরুণ মনটা তখন

ছটফট করতে থাকে। মুজিবনগর সরকারের কার্যালয়ে থিয়েটার রোডে প্রায় দুই মাসের মতো ছিলাম। একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ করার সময়ে অনেকের সঙ্গেই পরিচিত হই। আমি তখন বয়সে ছোটো। অনেক জাতীয় নেতার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পাই। সমবয়সি বা বড়োদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, ভ্রাতৃত্বের ভাব জমে উঠে, সহকর্মী হই। এই কদিনেই তাঁদের সঙ্গে আপনজন বনে যাই, যেন এক আত্মীয়ের বন্ধন, মায়ার জাল সৃষ্টি করে। সেটা ছিল একাত্তরের জুলাই। প্রায় দুই মাসে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, সহকর্মী হয়েছিলাম, তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আগরতলার উদ্দেশে রওয়ানা দিই। বিদায়ের সময়ে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একটি প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়। মুজিবনগর সরকারের প্যাডে দেওয়া প্রত্যয়নপত্রটি দেওয়া হয় এজন্য যে, আমি যেন আগরতলায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই। মুজিবনগর সরকারের প্রত্যয়নপত্রটি আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে। এরপর আমি মুজিবনগর সরকারের পরিচিতজনদের কাছ থেকে বিদায় নিই। বিদায়বেলাটা ছিল খুবই করুণ; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ আর আনন্দের মধ্যে বিদায়ের করুণ ক্ষণটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বাসে, ট্রেনে, ট্রাকে করে কলকাতা থেকে আগরতলায় পৌঁছাই। আগরতলার কংগ্রেস ভবনে এসে এমপি গোলাম মোর্শেদ ফারুকীর দেখা পাই। তিনিই আমাকে আগরতলার গোকূলনগর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠান। গোকূলনগর ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন মুন্সীগঞ্জের এমপি শামসুল হক। তাঁর টুআইসি ছিলেন অ্যাডভোকেট ওয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। শামসুল হক এমপি ও অ্যাডভোকেট ওয়াজউদ্দিন আহমেদের কাছে মুজিবনগর সরকারের প্রত্যয়নপত্রটি দেখাই। এই প্রত্যয়নপত্রটি দেখানোর পর তাঁরা আমাকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণে নেওয়ার বিষয়ে সাহায্য করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপে নির্দেশ দেন। অ্যাডভোকেট ওয়াজউদ্দিন আহমেদের আর আমার–দুজনেরই বাড়ি বৈদ্যেরবাজারে। আমার বাড়িও বৈদ্যেরবাজারে হওয়ার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাই। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ২০ বছর পর একটি মামলা নিয়ে অ্যাডভোকেট ওয়াজউদ্দিন আহমেদের কাছে গিয়েছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি আমার কাছ থেকে কোনো প্রকার ওকালতির ফি গ্রহণ করেননি। বিনা পয়সায় আমার মামলাটা করে দিয়েছিলেন।

পাঁচ.

একাত্তর সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। ভারতের সেনাবাহিনীর শিখ ক্যাপ্টেন মান সিংহের অধীনে আগরতলার গোকূলনগর ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আগরতলার গোকূলনগর ক্যাম্পে দেড় মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধার দল নারায়ণগঞ্জ জেলার বৈদ্যেরবাজার এলাকায় রওয়ানা দিই। বৈদ্যেরবাজারে এসে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে উঠি। শুরু হয় আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পর্ব। ১৯৭১ সালের ২৩ অক্টোবর বৈদ্যেরবাজারের চিলারবাগ এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ হয়। এর পরের দিন ২৪ অক্টোবর সরদারবাড়ী (বর্তমান সোনারগাঁও জাদুঘর) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়, যা আকাশবাণী রেডিয়ো, বিবিসির খবরে বলা হয়। ১৭ নভেম্বর লাঙ্গলবন্দ সেতু এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়, যা বিবিসি, আকাশবাণী, জয় বাংলা রেডিয়োতে প্রচারিত হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি আমিও। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আরও অনেক ঘটনাই মনে হয়, যা এখন স্মৃতির মণিকোঠায় জমা হয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সহযোগী অনেক মুক্তিযোদ্ধাই মারা গেছেন। আমার মুক্তিযুদ্ধের সময়ে থানা কমান্ডার ছিলেন আ. মালেক। তিনি নিহত হন মুক্তিযুদ্ধকালীন। এরপর থানা কমান্ডার নিযুক্ত হন মাসুদুর রহমান। তিনিও মুক্তিযুদ্ধের উষালগ্নেই নিহত হন। সুলতান, মতিন, বাবুল আমার সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন, সব শহিদ মুক্তিযোদ্ধার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। এখনো অনেকে সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা জীবিত আছেন, যাদের সঙ্গে দেখা হয় কদাচিৎ। দেখা হলেই বুকে জড়িয়ে ধরি, কোলাকুলি করি, যেন এক আত্মার সঙ্গে আরেক আত্মার মধ্যকার আত্মীয়ের বন্ধন। যখন অবসর মুহূর্ত কাটাই, তখন মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাদের মুখাবয়বের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘটনা অনেক বিশাল, যা সংক্ষেপে বলা কঠিন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণসহ অনেক ঘটনার মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কীভাবে মাছ ধরার জেলে সেজে রাজাকার বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের আটক করেছিলাম, সেই ঘটনাটি এখনো স্মৃতিতে জ্বল জ্বল করে। মনে পড়ে, ভারতের সেনাবাহিনীর শিখ ক্যাপ্টেন মান সিংহের কথা, যিনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন মান সিংহ এখনো বেঁচে আছেন কি না, বেঁচে থাকলে কোথায় কীভাবে আছেন, দেখার কৌতূহল জাগে।

ছয়.

পাকিস্তানি বাহিনী রাস্তাঘাট চিনত না। রাজাকাররাই তাদের রাস্তাঘাট দেখিয়ে দিত। তখন শহরের কিছু অংশ ছাড়া গ্রামবাংলায় কোনো পাকা সড়ক ছিল না। বেশির ভাগ এলাকার যোগাযোগব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ, গাড়ি চলত না। মোবাইল ফোন ছিল না, ছিল না ইন্টারনেট। টিভি ছিল না, ছিল না বৈদ্যুতিক আলো। গ্রামের বাড়িতে রাতে বিত্তশালীরা গ্রামের পথে-ঘাটে হাঁটতে টর্চলাইট ব্যবহার করত। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে প্রায় প্রতিদিনই খবর আসতে থাকে যে মেঘনা নদীবক্ষে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যরা ছিনতাই করছে, ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। জেলেরা মাছ ধরতে পারছে না, মাছ ছিনিয়ে নিচ্ছে। মালামাল বহনকারী গয়না নৌকার ওপর তারা হামলা চালায়, মাঝি-মাল্লার কাছে যা টাকাপয়সা পায়, তা-ই ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেঘনা নদীবক্ষে যাদের নৌকা পায়, তাদের নৌকায়ই আক্রমণ করে রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কোথায়, এর খোঁজখবর নিচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ নিয়ে তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই এই ধরনের খবর আসতে থাকে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। মেঘনা নদীতে রাজাকারবাহিনীর সদস্যদের দিন দিনই অত্যাচার, উপদ্রব, লুটপাট, ছিনতাইয়ের মাত্রা বাড়ছিল। এতে ভয়ভীতি, উদ্‌বেগ, আতঙ্কের সৃষ্টি করে তারা। রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের আটক করার জন্য অপারেশন চালাতে হবে, এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সদর আলী ও আমাকে জেলে সাজারও একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে ধরা পড়ে না যাই। জেলে সাজার ঘটনাটি উল্লেখ করার আগে মুক্তিযুদ্ধের সময়, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা কেমন ছিল, এরও সংক্ষেপে একটু বর্ণনা করা গেলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডচিত্র ফুটে ওঠবে।

সাত.

মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক ক্যাম্পের মধ্যে একটি ক্যাম্প ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বাড়িতে। এই বাড়িটা নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানার অন্তর্গত বারদী ইউনিয়নে অবস্থিত। এই বারদী ইউনিয়নেই পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বাড়ি। জ্যোতি বসুর বাড়িটি যেই গ্রামে, সেই গ্রামের নাম চৌধুরীপাড়া। চৌধুরীপাড়া

গ্রামটি এখন চান্দেরপাড়া নামে পরিচিত। এই চান্দেরপাড়া বা চৌধুরীপাড়াই জ্যোতি বসুর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম আমরা ১২ থেকে ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা। মেঘনা নদী থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পটি। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে হেঁটে পৌঁছানো যায় মেঘনা নদীর তীরে। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের সদর আলী ও আমি– এই দুজনকে মাছ ধরার জেলে সাজতে হবে। মেঘনা নদীতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের খোঁজখবর নিতে হবে। রাজাকাররা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, মেঘনা নদীতে তারা কীভাবে লুটপাট করে, কোথায় চলে যায়–এসব ঘটনার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে এবং সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা সদর আলীকে। আমাদের এ দুই মুক্তিযোদ্ধাকে মাছ ধরার জেলে সেজেই যেতে হবে মেঘনা নদীতে। মেঘনা নদীতে মাছ ধরার জাল ফেলার ছলে রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করতে হবে। গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য সাজতে হবে গুপ্তচরও। এভাবেই রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কমান্ডার।

আট.

একাত্তর সালের দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ, আতঙ্ক আর রাজাকারবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন ছিল গ্রামবাংলায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এছাড়া গ্রামবাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল খুবই ভালো, অনেক উন্নত ছিল, যার ছবি এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন কোনো গ্রাম এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বা কোনো ধরনের অপরাধ ছিল না বললেই চলে। কারণ গ্রামে ছিল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, মুক্তিযোদ্ধাদের নিত্য পদচারণা। মানুষজন রাতে দরজা খুলে ঘুমাতে পারত। নিরাপত্তার দায়িত্বটা যেন অঘোষিতভাবেই পালন করছিলেন মুক্তিযোদ্ধারাই। এক ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধার সহযোগিতায় আরেক ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে আসত। অপারেশনের সময়ে একাধিক ক্যাম্পের গ্রুপ কমান্ডারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অংশ নিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কে হিন্দু, আর কে মুসলমান, এর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সবারই একটা পরিচয় ছিল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধাকে দেখলে গ্রামের মানুষের সাহস বেড়ে যেত। গ্রামের মানুষজনের কাছে মুক্তিযোদ্ধারাই ছিল আপনজন, নিরাপত্তার ভরসাস্থল। নিজে না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াত গ্রামের মানুষজন। গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে রক্তের কোনো সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু রক্তের চেয়ে বেশি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেন নিকটাত্মীয়। সেই দিনগুলো এখন সোনালি অতীত। এখন সেসব ঘটনা মনে হলে ১৯৭১ সালের সেই পুরোনো দিনের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে ফিরে যাই। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খোঁজ নিত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প কোথায়? এজন্য তাদের সহযোগী ছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যরা। তারাই মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ নিত, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দিত, ধরিয়ে দিত মুক্তিযোদ্ধাদের। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসে গ্রামকে গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিত, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে হানা দিয়ে তাঁদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করত। গ্রামের অসহায়, নিরীহ, নিরপরাধ কত নারী, পুরুষ, শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। আজও তা মনে হলে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে।

রাজাকাররা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, মেঘনা নদীতে তারা কীভাবে লুটপাট করে, কোথায় চলে যায়–এসব ঘটনার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে এবং সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা সদর আলীকে

নয়.

মাছ ধরার জেলে সেজে রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের আটক করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি দুই মুক্তিযোদ্ধা– সদর আলী ও আমি। ক্যাম্প কমান্ডারের নির্দেশে আমরা দুজন জেলে সাজার জন্য লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা, জেলেনৌকা, লগি, বৈঠা, মাছ ধরার জাল জোগাড় করি। দুজনই লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে কোমরে গামছা বাঁধি। সদর আলী জেলে নৌকার পেছনে বসে, নৌকার বৈঠার হাল ধরেছে। আমি জাল নিয়ে নৌকার অপর প্রান্তে সামনের দিকটায় বসি। জেলেনৌকা নিয়ে চলে যাই মেঘনা নদীতে, যেখানে নদীর গভীরতা কম, তীরঘেঁষা, অথচ মনে হবে সত্যিই জেলেরা মাছ ধরছে। মেঘনা নদীতে রাজাকার, আলবদর, আলশামস সদস্যদের অত্যাচার, উপদ্রব, লুটপাট, ছিনতাই, ডাকাতি করার খবর তো আগেই বলেছি। তারা আসে কোন দিক থেকে? কোন দিকে চলে যায়? মেঘনা নদীতে তারা কীভাবে অত্যাচার, নির্যাতন, লুটপাট করছে–খোঁজখবর নিতে শুরু করি আমরা। একাত্তরের সেপ্টেম্বর। মেঘনা নদীর তীরেই বেঁধে রাখা হয়েছে অনেক জেলেনৌকা। জেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা নৌকা নিলাম আমরা। সকালে নৌকায় মেঘনা নদীতে গেলাম। সারাদিন কেটে গেল, সেদিন আর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যদের দেখা পেলাম না। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে ফিরে এলাম। আবার পরের দিন সকালে গেলাম মেঘনা নদীতে। দূর থেকে দেখলাম, মেঘনা নদী বেয়ে কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার চন্দনপুরা এলাকার দিক থেকে একটা নৌকা ভেসে আসছে। নৌকার সামনে কয়েকজন মানুষকেও দেখা যাচ্ছে। নৌকাটি আমাদের অনেক কাছে চলে আসে। এটাই রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের নৌকা। আমাদের কাছে আসতেই রাজাকারদের হুংকার, ওই তোরা কে-রে? আমি বললাম, 'আমরা জাউল্লা স্যার, মাছ ধরি।' রাজাকারদের একজন বলল, 'কী মাছ ধরছস? মাছ কই, দেখা? আমাগোরে মাছ দিতে অইব।' আমি বললাম, 'স্যার, আইজকা কপাল খারাপ, এখনো মাছ পাই নাই।' রাজাকারদের একজন বলল, 'মাছ না পাইলে টাকাপয়সা যা আছে দে।' আমি বললাম,' টাকাপয়সা কিছুই নাই। মাছ ধইরতে পারলে বাজারে গিয়া বেচমু। তাইলে টাকাপয়সা হাতে পামু।' রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা এসব কথা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারল না। রাজাকার বাহিনীর একজন থ্রি নট থ্রি রাইফেল থেকে একটা ফায়ার করল। আমাদের বুক ভয়ে দুরুদুরু করে কাঁপছে। এই বুঝি আমাদের গুলি করবে। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'স্যার, এখনো জালে কোনো মাছ আটকা পড়ে নাই। স্যার, আইজকা কপালডাই খারাপ, মাছ মাইর দিতাছে না।' এবার রাজাকার সদস্যরা হুংকার ছাড়ল–'মুক্তিযোদ্ধা

ক্যাম্প কই আছে ক? মুক্তিযোদ্ধাগো দেখছত নাকি?' নানা ধরনের কথাবার্তায় রাজাকার সদস্যরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, ঠাট্টা-মশকরা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কী যেন টিপ্পনী কাটে! এমন সময় দূরে একটি নৌকা দেখে রাজাকাররা চলে যায়। রাজাকারদের নৌকাটি চলে যায় একটু দূরে, যে দিক দিয়ে মালবাহী গয়নার নৌকা আসছে। মালবাহী গয়নার নৌকাটি নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে মেঘনা নদী দিয়ে গোপালদী বাজারের দিকে যাচ্ছিল। গয়নার নৌকায় মাঝিমাল্লাদের কাছে যা টাকাপয়সা পেয়েছে, তা-ই ছিনিয়ে নিয়েছে। মালামালও লুটপাট করে। দূর থেকেই মাঝিমাল্লাদের মারধর করার চিৎকারও শোনা গেল। সারাদিনই মেঘনা নদীতে যেসব নৌকা এসেছে, তা থামিয়ে টাকাপয়সা ছিনতাই, মালামাল লুটপাট করছে, মারধর করেছে। সূর্য ডোবার আগেই রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা মেঘনা নদীর পূর্বদিকে কুমিল্লা জেলার হোমনা থানা ও চন্দনপুরা এলাকা মুখে চলে গেল। এই দিক থেকেই রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা এসেছিল আবার ওই দিকেই চলে গেল।

দশ.

আমি আর সদর আলী সারাদিন মেঘনা নদীতে মাছ ধরার জেলে সেজে কাটালাম। এরপর সূর্য ডোবার আগেই চলে গেলাম মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়ে কমান্ডারকে ঘটনার সব বিবরণ বললাম। এবার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে শলাপরামর্শ করেন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কমান্ডার। অপারেশন ব্যর্থ হলে বিপদ ডেকে আনতে পারে। অপারেশন চালাতে গেলে গুলি করে দিতে পারে রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা। আবার সুযোগ বুঝে সটকে পড়ে কুমিল্লার জেলার দিকে চলে যেতে পারে, সেখানে গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে খবর দিতে পারে, ডেকে নিয়ে আসার আশঙ্কাও আছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে হামলা করতে পারে। গ্রামকে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। ত্রিমুখী অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হলো। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ত্রিমুখী অপারেশন চালাত হলে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বাড়াতে হবে। এত মুক্তিযোদ্ধা জনবল আমাদের ক্যাম্পে নেই। অন্য মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হলো। এরপর রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা মেঘনা নদীতে আসার আগে তিনদিক থেকে অ্যাম্বুশ পেতে থাকার পরিকল্পনা হলো। রাজাকাররা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে। বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়ে ভয়ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যাতে রাজাকাররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এগারো.

দিনটা ছিল ১৯৭১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, রোববার। রাজাকাররা মেঘনা নদীতে আসতেই তিনদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে মুক্তিযোদ্ধারা। দিগ্‌বিদিকহারা হয়ে ওঠে রাজাকার সদস্যরা। তারা দেখতে পায়, তাদের নৌকা তিনদিকের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার উচ্চৈঃস্বরে হুংকার ছাড়লেন, 'হ্যান্ডস আপ'। রাজাকার, আলবদর, আলশামস সদস্যরা ভয়ে কাঁচুমাচু। আবার 'হ্যান্ডস আপ' বলতেই রাইফেল নৌকার পাটাতনের উপর রেখে, হাত উঁচু করে দাঁড়াল রাজাকাররা। মুক্তিযোদ্ধারা তিনদিক থেকে রাজাকার বাহিনীর নৌকাটি ঘিরে ফেলে। তাদের আটক করে হাত পেছনের দিক নিয়ে পিছমোড়া বেঁধে ফেলা হয়। নৌকাসহ তাদের নিয়ে আসা হয় মেঘনা নদীর তীরে। তীরে নৌকা ভিড়ার পর নৌকা থেকে তাদের নামিয়ে হাঁটিয়ে আনা হয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। আটক হয় পাঁচ রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্য। পাঁচজনের কাছ থেকেই উদ্ধার হয় রাইফেল, গুলি। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাদের সঙ্গে আরও কত রাজাকার বাহিনীর সদস্য আছে? পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প কোথায়? অস্ত্র ও গোলাবারুদ কী পরিমাণ আছে ইত্যাদি। মেঘনা নদীতে মুক্তিযোদ্ধার মাছ ধরার জেলে সেজে গুপ্তচরবৃত্তি করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীর সদস্য আটক করার এই ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে '৭১-এর রণাঙ্গনে সোনারগাঁও' বইটিতে।

বারো.

আমি ও সদর আলী–দুইজন মুক্তিযোদ্ধা মাছ ধরার জেলে সেজে যেভাবে রাজাকার বাহিনীকে আটক করেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিজের লেখায় বইটিতে যেভাবে ঘটনার বর্ণনা করেছেন, তা হুবহু তুলে ধরা হলো: 'মেঘনা নদী (তৎকালীন বৈদ্যেরবাজার থানা এলাকা) দিয়ে চলাচল করত মালবাহী নৌকা হইতে রাজাকার, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা জোর করে টাকা আদায় করিত। টাকা না দিলে নৌকায় থাকা মালপত্র রেখে বিদায় দিত। আমি (মোহাম্মদ আলী) আমার গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে সেসময় বারদীর চৌধুরীপাড়া গ্রামে জ্যোতি বসুর (পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বাড়ি) ক্যাম্প করে থাকি। আমার ক্যাম্পের নৌকার মাঝি আসিয়া রাজাকারদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলেন। আমি, দুইজন মুক্তিযোদ্ধা শ্রী শংকর কুমার দে (সাংবাদিক) ও মো. সদর আলীকে মাছ ধরার নৌকায় জেলে সাজিয়ে মেঘনা নদীতে জেলেদের সাথে মাছ ধরার উছিলায় রাজাকারদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগতি ও রেকি করার জন্য পাঠাই। সন্ধ্যায় তারা দুইজন ক্যাম্পে এসে ঘটনা সত্য বলে জানায়।

তেরো.

১২ সেপ্টেম্বর (রবিবার) আমার (মোহাম্মদ আলী) গ্রুপ ও ইব্রাহিম গ্রুপ মিলে চারটি নৌকাযোগে ২০/২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা তিনভাগে তিন দিকে দুপুর প্রায় ১-৩০ মি: হইতে অ্যাম্বুশে বসে থাকি। বিকাল ৪টার দিকে পাঁচ জন রাজাকার নৌকাযোগে মেঘনা নদীতে টাকা তোলার জন্য আসামাত্র আমরা তিনদিক হইতে ঘেরাও করি। ভয়ে রাজাকার/আলবদররা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা তাদের হাতে থাকা ৪টি রাইফেল ছিনাইয়া নেই। রাজাকার পাঁচজনকে বারদী বাজারে নিয়া আসি এবং যুদ্ধকালীন থানা কমান্ডার মালেকের কাছে হস্তান্তর করি।

চৌদ্দ.

মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডারের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারিতে ঢাকা স্টেডিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে অস্ত্রসমর্পণ করি। মুক্তিযুদ্ধের অধ্যায় শেষ করে আবার ছাত্রজীবনে ফিরে আসি। তোলারাম কলেজে পড়তে শুরু করি। স্নাতক শেষ করে ছাত্রজীবনের পাঠ চুকিয়ে চাকরিজীবনে প্রবেশ করি। প্রাইভেট জুট কোম্পানির ম্যানেজার, একটি স্কুলের শিক্ষক, নাটক লেখা, নাটকে অভিনয় করা, নাটক পরিচালনা করা, নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান করি। সাংবাদিকতা পেশায় ৪০ বছর পেরিয়ে এখনো কর্মরত পেশাদার সাংবাদিক। এখন আমি জীবন সায়াহ্নে পদার্পণ করে আজও মনে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সেই অতীত স্মৃতি। সম্মুখযুদ্ধের সময়ে বাঙ্কারে অ্যাম্বুশ করে থাকার ঘটনা। সেদিন হয়তো মৃত্যুও হতে পারত। বেঁচে আছি বলেই আমি জোরগলায় বলতে পারছি, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একটি স্বাধীন দেশ করেছি। একটি জাতীয় পতাকা

উপহার দিতে পেরেছি। এজন্য আমি গর্বিত। অথচ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর এসব কথাবার্তা বলতে পারতেন না মুক্তিযোদ্ধারা। স্বাধীনতাবিরোধীরা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের ভয়ে সেসময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নামটি পর্যন্ত কেউ মুখ ফুটে বলতে পারত না। রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম ও মুক্তিযোদ্ধাদের নাম প্রচার।

পনেরো.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও তাঁর দল ক্ষমতায় আসার পর স্বাধীনতার শত্রুরা আবারো গর্তের ভেতরে ঢুকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা–এই প্রিয় নামগুলোর পুনর্জন্ম হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধারা কিছু পাওয়ার আশায় মুক্তিযুদ্ধ করেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জীবন ছিল তুচ্ছ। সেখানে চাওয়া-পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। যারা আজ জীবিত মুক্তিযোদ্ধা, তাঁদের বেশির ভাগেরই বয়স এখন পঁয়ষট্টিরও বেশি। ১০ থেকে ১৫ বছর পর হয়তো কোনো জীবিত মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে পাওয়াটাই কঠিন হবে। যারা বেঁচে থাকবেন, তাঁরাও বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে চলনশক্তিহীন হয়ে পড়বেন। এই বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের সারিতে আমিও একজন। কতদিন বেঁচে থাকব, জানি না। জীবনের শেষবেলায় এসেও মনে হয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারার ঘটনাটিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন, শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই শ্রেষ্ঠ অর্জনের সময়ের অনেক খণ্ড খণ্ড স্মৃতিই মনে পড়ে অবসরে, একান্তে। রাজাকার বাহিনী ও তার বংশধররা প্রতিশোধ নিতে স্বাধীনতার উষালগ্নে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে আমার ছোটো ভাই শিবচরণ দে (শিবু)-কে হত্যা করেছে। পুত্রহারা আমার মা-বাবার চোখে জল দেখেছি, আহাজারি করে কান্না দেখেছি। স্বাধীনতার এত বছর পর এখনো আমার মা কেঁদে বেড়ায় আর বিলাপ করে, শিবু-শিবু কইরে, আমার শিবু কই। অনেক রক্তের দামে কেনা বাংলার এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা আর মুক্তিযোদ্ধা দুইটি শব্দ একে অপরের পরিপূরক। মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডারের লেখা '৭১-এর রণাঙ্গনে সোনারগাঁও' বইয়ের পাতায় লেখা মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী দেবে, ইতিহাস হয়ে কথা বলবে। মুক্তিযোদ্ধা হয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে রাজাকার বাহিনীকে আটক করেছি, আবার সেই তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার কাজ করেই জীবিকানির্বাহের জীবনযুদ্ধে সাংবাদিকতা পেশায় জড়িয়ে আছি। এই সাংবাদিকের মধ্যে সেই মুক্তিযোদ্ধার কী এক অভূতপূর্ব মিল! এ পৃথিবীতে যুগে যুগে স্কুল-কলেজে পড়িয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাংবাদিক তৈরি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করা যাবে না। একজীবনে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ আসে না। বলে রাখা ভালো, সাংবাদিক জন্ম নেবে বারবার, বীর মুক্তিযোদ্ধা একবার।

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা; বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক জনকণ্ঠ

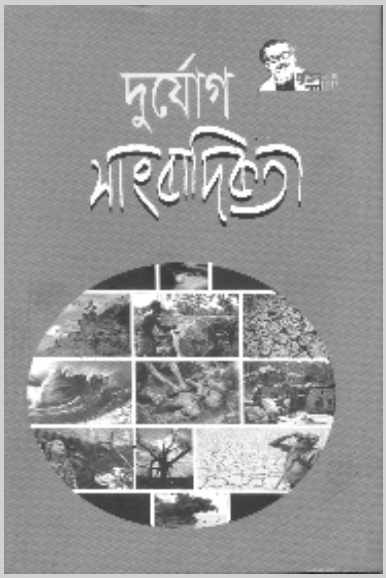

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ দেখতে চাই

পংকজ কুমার দস্তিদার

২৪ মার্চ সকালে বন্দরের শ্রমিকদের মাধ্যমে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা জানতে পারেন করাচি থেকে ৫৬৩০ টন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'সোয়াত' নামের একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭নং জেটিতে ভিড়েছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ হান্নান বন্দর এলাকার শ্রমিক-জনতাকে বললেন, পোর্ট কলোনির মাঠে বিকালে জনসভা হবে। এতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেবেন নেতারা। বন্দরের কর্মচারী ও শ্রমিকরা পতেঙ্গা, হালিশহর, নিউমুরিং এলাকায় ব্যাপক মাইকিং করে। মাঠে বিকালে বিপুল জনসমাবেশ হয়। সমাবেশ চলাকালে স্টিল মিল থেকে কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী লোহার দণ্ড নিয়ে মিছিলসহকারে সভাস্থলে হাজির হয়। সভায় আওয়ামী লীগ নেতা এমএ মজিদ ও এমএ হান্নান বক্তব্য দেন। ঘোষণা করেন সোয়াত জাহাজে অস্ত্র এনেছে পাকিস্তানি জান্তা বাঙালিদের হত্যা করার জন্য। এসব অস্ত্র কোনোভাবে খালাস করতে দেওয়া হবে না। হানাদাররা নামাতে চাইলে প্রতিরোধ করা হবে। এরপর সভা শেষ করে সবাই মিছিলসহকারে পোর্ট কলোনি থেকে বারিক মিয়া স্কুলের পাশে ৩নং জেটির আর্মি নিয়ন্ত্রণ কক্ষে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে বেরিয়ে পড়ে। পৌনে ৬টার দিকে মিছিলটি ৩নং জেটি গেটের সামনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে নেভি ফ্লিট ক্লাবের দিক থেকে পাকিস্তানি হানাদাররা আচমকা মিছিলের ওপর প্রচণ্ড গুলি ছোড়ে, বহু লোক হতাহত হয়। লোকজন আতঙ্কে কান্নাকাটি, ছোটাছুটি করতে থাকে। পরদিন পত্রিকার খবরে জানা যায়, ওই হামলায় ১৭ জন নিহত এবং অনেক লোক আহত হয়েছেন। এমআর সিদ্দিকী, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ নেতা হতাহতদের খোঁজখবর নিলেন এবং যারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁদের দেখতে গেলেন।

বঙ্গবন্ধু এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতি দেন।

'সোয়াত' থেকে অস্ত্র খালাসের উদ্দেশ্যে বাঙালি সেনা অফিসার জিয়াউর রহমানও ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে আগ্রাবাদের কাছাকাছি পৌঁছার পর তিনি শ্রমিক-জনতার প্রতিরোধের মুখে পড়েন এবং শ্রমিক-জনতার তাড়া খেয়ে পিছু হটেন। দেশে যে এবার বাঙালিবিদ্বেষী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই অবশ্যম্ভাবী, এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে।

পংকজ কুমার দস্তিদার

এবার শুরু হলো অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানিদের তাড়ানোর আসল কাজটা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতায় এদেশের ছাত্র-যুবারা ভারতে অস্ত্র ও গোলাবারুদের ট্রেনিং নিতে সীমান্ত অতিক্রম করে। ১৯৭১ সালে আমি কক্সবাজারের চকরিয়া থানাধীন বরইতলী হাইস্কুলের শিক্ষক। বয়স ২১ বছর। ১৯৬৯ সালের শেষদিকে এই স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলাম। ১৯৬৫ সালে পটিয়া মডেল হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করার পর ১৯৬৬ সালে পটিয়া কলেজে (বর্তমানে পটিয়া সরকারি কলেজ) উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হই। এটা ছিল ছয়-দফাভিত্তিক উত্তাল আন্দোলনের বছর। সপ্তাহে ২/৩ দিন ক্লাস হতো। প্রায়ই থাকত প্রতিবাদ, বিক্ষোভ মিছিল, হরতালসহ নানা কর্মসূচি। অধিকাংশ কর্মসূচিতে আমি অংশ নিতাম। ছাত্রলীগের সঙ্গে। ছাত্রলীগের পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়নের দুই অংশের (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ) নেতাকর্মীরাও মিছিল-হরতালে অংশ নিতেন। আটষট্টিতে যখন একই কলেজে বিএ ভর্তি হলাম, তখন ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হলাম ছাত্রলীগ নেতা সিরাজের মাধ্যমে। সে সময় পটিয়া কলেজে ছাত্রলীগের মূল নেতা ছিলেন আমাদেরই সহপাঠী সিরাজ অর্থাৎ চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম খালেদ। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র ছিলেন আনোয়ারুল ইকবাল, যিনি পরে বাংলাদেশ পুলিশের আইজি, র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ও ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা ছিলেন। ইকবালের বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর বদলি সূত্রে পরিবার পটিয়ায় থাকত এবং ইকবাল পটিয়া কলেজে বিএ ভর্তি হন। তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে আগে থেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন। ইকবাল আর আমি একই জায়গায় অর্থাৎ ভারতের দেরাদুন মিলিটারি একাডেমির অন্তর্গত তাঙুয়া গেরিলা ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিয়ে চট্টগ্রামেই বিএলএফ মুজিববাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মনির অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। কলেজজীবনে যেসব ছাত্রলীগ নেতা খুবই প্রেরণাদায়ী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, স্বপন কুমার চৌধুরী, এসএম ইউসুফ, সাবের আহমদ আজগারী, আবু মোহাম্মদ হাশেম প্রমুখ। পটিয়া কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপের নেতা ছিলেন অনিল লালা ও অধর লাল খাস্তগীর। কলেজে ছাত্রলীগের অন্য নেতাদের মধ্যে শামসুদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ চট্টগ্রামে সিনিয়র রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আতাউর রহমান খান কায়সার, আখতারুজ্জমান চৌধুরী বাবু ও সুলতান আহমদ কুসুমপুরী এবং ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী হারুনুর রশিদ।

কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে গেলাম

বরইতলী স্কুলে ক্লাসেই মাঝেমধ্যে দেশের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতো। ছাত্রছাত্রীরাও স্বাধীনতার চেতনায় তখন প্রচণ্ড উজ্জীবিত ছিল। একাত্তরের ৩/৪ এপ্রিলের দিকে শিক্ষকতা ছেড়ে পটিয়ার হাইদগাঁওয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসি। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই চট্টগ্রাম শহরের শেরশাহ, ফিরোজশাহ, ওয়্যারলেস কলোনি, সরদার বাহাদুরনগর, পাহাড়তলী পাঞ্জাবি লেন, হালিশহর, আমবাগান ইত্যাদি বিহারি অধ্যুষিত এলাকায় বিহারিরা ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহন থামিয়ে অসংখ্য নিরস্ত্র বাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। বাড়িতে সারাক্ষণ অস্থিরতায় থাকতাম। পাশের বাড়ির এক কাকার কাছে আমার চার শতাংশের একখণ্ড জমি বর্গা দিয়ে চার শ টাকা নিলাম। স্কুলের এক মাসের বেতনসহ মায়ের হাতে কিছু টাকা দিলাম, অল্প টাকা নিজের হাতে রাখলাম। সম্ভবত ১৮ এপ্রিল আরও দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে মুহুরিগঞ্জ রেল স্টেশনের প্রায় আধা কিলোমিটার উত্তরদিক দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরা পৌঁছি। মুহুরিগঞ্জ স্টেশনে তখন পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটি ছিল। শান্তি কমিটির স্থানীয় দুইজন সদস্য আমাদের তাড়া করেছিল; কিন্তু নাগাল পায়নি। আমরা দৌড়ে সীমান্ত অতিক্রম করি। ভারতের উদ্দেশে দেশত্যাগের দুইদিন আগে ১৬ এপ্রিল পটিয়া মহকুমা শহরে পাকিস্তানি সেনাদের বোম্বিং ও মর্টার শেলিং হয়। আমি তখন পটিয়া স্টেশন রোডে। শেলিং বন্ধ হলে থানার মোড়ে ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরির সামনে এসে এক বীভৎসতা দেখলাম। দেখি মর্টার শেলিংয়ে বিকৃত এক রিকশাওয়ালার পুড়ে যাওয়া দেহ। তখন শুনলাম পটিয়ায় আরও ১০/১২ জন পথচারী ও রিকশাওয়ালা বিভিন্ন স্থানে নিহত হয়েছেন। রাহাত আলী হাইস্কুল ও পটিয়া মডেল হাইস্কুলের মাঠে বোমার আঘাতে বড়ো বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কিছুক্ষণ পর আবারো শেলিং করে হানাদাররা। হামলা বন্ধ হলে বাড়ি ফেরার পথে পটিয়া রেল স্টেশনের কাছে বড়ো মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রায় এক ঘণ্টা। মাদ্রাসার ভেতরে ঢুকে দেখি মাঠে বেশ কয়েকটি বড়ো গর্ত। পাকিস্তানি হানাদারদের আবারো শেলিং হবে আশঙ্কায় আমরা মাদ্রাসার পেছনে পুকুরে বেতঝাড়ের আড়ালে ৪০-৫০ জন লোক বুকসমান পানির ভেতর চুপচাপ লুকিয়ে থাকি। প্রায় এক ঘণ্টা পানিতে থাকার পর বিকালে বাড়ি ফিরলাম গৌরাঙ্গপাড়ার রাস্তা ধরে।

ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুমের হরিণা ক্যাম্প ছিল প্রাইমারি ট্রেনিং সেন্টার। ওখানে দেখা হলো আমার কাকাতো ভাই পুলিন দস্তিদারের সঙ্গে। ১৯৬৯ সালে বিকম পাস পুলিনও আমাদের গ্রামের হাইদগাঁও হাইস্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিল। হরিণা ট্রেনিং ক্যাম্পে তৎকালীন ডাকসাইটে ছাত্রলীগ নেতা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র স্বপন কুমার চৌধুরী (স্বপনদা) ও সাবের ভাই (চট্টগ্রাম জেলা ছাত্রলীগের

তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সাবের আহমদ আজগারী) ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মীদের খুঁজছিলেন বিএলএফে ট্রেনিংয়ের জন্য। স্বপনদা বললেন আগরতলা যেতে হবে। ওখানে আমাদের নেতা মান্নান ভাই আছেন। স্বপনদা আমাদের নিয়ে আগরতলা শ্রীধর ভিলায় মান্নান ভাইয়ের (প্রয়াত মন্ত্রী ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি) কাছে পৌঁছে দিলেন। ওখানে অনেক নেতাকর্মী চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের। শ্রীধর ভিলা ছিল বিএলএফ-এর আগরতলা সদর দপ্তর। থাকা-খাওয়া এবং প্রতিদিন মান্নান ভাইয়ের পলিটিক্যাল ব্রিফিং হতো। এভাবে চলল কয়েক সপ্তাহ। বিএলএফ নেতা সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের আরও একটি গ্রুপ পাঠিয়েছেন। অতঃপর একদিন ভারতীয় বিমানবাহিনীর কার্গো বিমানে করে শিলিগুড়ির বাগডোগরা সামরিক ঘাঁটিতে। সেখান থেকে জলপাইগুড়িতে আরও প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে আরেকটি রাশিয়ান কার্গো বিমানে কয়েক ঘণ্টা যাত্রার পর দেরাদুন সংলগ্ন জঙ্গল ও পাহাড়ঘেরা একটি ক্যাম্পে নেওয়া হয়। ক্যাম্পটি পাহাড়ের ঢালুতে তাঁবু খাটানো। অত্যন্ত ঘন গাছগাছড়ায় আচ্ছাদিত একটি এলাকা। তখন বর্ষা মৌসুম। সেখানে সাপ ও জোঁকের উপদ্রব। ঘন লম্বা ঘাসের মধ্যে হাঁটার সময় দেখি বড়ো বড়ো জোঁক দুই পা বেয়ে শরীরের উপর দিকে উঠে আসছে। আমরা মারে-বাপরে চিৎকার শুরু করি। এরপর আমাদেরকে সেখান থেকে আরও দূরে পাহাড় শীর্ষের পাকা রাস্তা ধরে নিয়ে যাওয়া হলো তাঞ্চুয়ায়, পাহাড়ের সর্পিল আঁকাবাঁকা উঁচু পথ বেয়ে। ট্রাকে আমাদের বসিয়ে রাখা হয়েছিল। বলা হলো দাঁড়িয়ে নিচের দিকে না দেখার জন্য। নিচে তাকালে মাথা ঘুরাবে এবং মনে হবে এই বুঝি পাহাড়ের খাদে কয়েক হাজার ফুট নিচে পড়ে গেলাম। তাই আমরা ট্রাকের ভেতর চুপচাপ বসে পড়লাম। দাঁড়ানোর সাহস পাইনি। ট্রাকে তাঞ্চুয়ায় উপস্থিত হলাম রাতে। এটা ভারতীয় পার্বত্য বাহিনীর (মাউন্টেন ডিভিশনের) প্রশিক্ষণকেন্দ্র, চাকরাতা শহরের অনতিদূরে ভূমি থেকে প্রায় ৭ হাজার ফুট উপরে। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন মেজর মালহোত্রা, ক্যাপ্টেন পিসি ভায়াছ (Vzas বা ব্যাস), মনমোহন সিংহসহ অন্যরা। এসএলআর, এসএমজি, এলএমজি, দুই ইঞ্চি ও তিন ইঞ্চি মর্টার, এক্সপ্লোসিভের (টিএনটি স্ল্যাব) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের যুদ্ধকৌশল ছিল 'হিট অ্যান্ড রান'। এছাড়া গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ দিতেন ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মকর্তারা। প্রতিদিন সকালে জাতীয় সংগীত (আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি) গেয়ে আমাদের ট্রেনিং শুরু হতো। বিকালে থাকত পলিটিক্যাল ক্লাস। ক্লাস নিতেন ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতা (বর্তমানে জাসদ নেতা) হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও আ ফ ম মাহবুবুল হক। ভারত সরকারের পক্ষে প্রশিক্ষণের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল সুজন সিং উবান। প্রতিটা ব্যাচের জন্য একবার এসে তিনি পরিচিতিপর্ব ও যুদ্ধকৌশল নিয়ে বক্তৃতা করে যেতেন। মাঝেমধ্যে আসতেন বিএলএফের চার শীর্ষ নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। বেশ কয়েকটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে এই একাডেমির অবস্থান, যেখানে অবিভক্ত ভারতের পদস্থ সামরিক কর্মকর্তারাও ট্রেনিং নেন। এই একাডেমিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়া প্রায় সবাই ছাত্রলীগ কর্মী বা নেতা, স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত তরুণ। ছাত্রনেতাদের মধ্যে হাসানুল হক ইনু, (সাবেক তথ্যমন্ত্রী) ক্যাম্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং প্রতিদিন বিকালে তিনি শরীফ নুরুল আম্বিয়া এবং আ ফ ম মাহবুবুল হক একাডেমির বড়ো হলরুমে গেরিলা প্রশিক্ষণার্থীদের রাজনীতির ক্লাস নিতেন। বিভিন্ন দেশের গেরিলা ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে নানা বই পড়তে দেওয়া হতো। ১০ বছর গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতেন ইনু ভাই, আম্বিয়া ভাই ও মাহবুব ভাই।

ট্রেনিং শেষে স্বপন চৌধুরী চট্টগ্রাম দক্ষিণ, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিএলএফ তথা মুজিববাহিনীর উপ-আঞ্চলিক অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। চট্টগ্রাম জেলা কমান্ডার হলেন এসএম ইউসুফ এবং চট্টগ্রাম মহানগরে ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন মোহাম্মদ আলী। আমরা স্বপনদার নেতৃত্বে বৃহত্তর চট্টগ্রামের একটি বড়ো দল বাংলাদেশে প্রবেশ করি। দুইদিন সবাই অভুক্ত। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমরা চাকমা বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। তাঁদের বাগানের পেঁপে আর বিলের সরিষা শাক লবণসিদ্ধ করে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করি। পরদিন আমরা আরও কিছুটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে ফটিকছড়ির তৎকালীন আওয়ামী লীগ এমপি মির্জা মনসুরের বাড়ি থেকে আমাদের জন্য ভাত ও মাংস রান্না করে পাঠানো হলো। তিনদিনে সেই প্রথম সবাই তৃপ্তিসহকারে খেলাম।

এদিকে থানাভিত্তিক পটিয়া, আনোয়ারা ও সাতকানিয়ার গ্রুপগুলোকে ফটিকছড়ি ও রাউজানের রণাঙ্গনে নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেকটি গ্রুপের জন্য একটি এলএমজি, প্রত্যেকের একটি এসএলআর ও গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক, বেয়নেট দেওয়া হয়। আমাদের পটিয়ার ১০ সদস্যের বিএলএফ গ্রুপে ছিলেন কমান্ডার নুরুল ইসলাম, ডেপুটি কমান্ডার দিলীপ কান্তি দাশ, নূর মোহাম্মদ, আমি পংকজ কুমার দস্তিদার, আফসার উদ্দিন আহমদ, পুলিন বিহারী দস্তিদার, আহমদ নবী, ফজলুল হক, শাহ আলম ও জাফর। ফটিকছড়ির পাহাড়ি অঞ্চলে বরকত উল্লাহর খামারে আমাদের অদূরে আবু মোহাম্মদ হাশেমের এফএফ গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হন বলে খবর আসে। আমাদের ক্যাম্প ছিল কচুপাড়া পাহাড়ের উপর। এফএফ গ্রুপের ওপর আক্রমণের খবর পেয়ে আমরাও গুলি ছুড়তে শুরু করি। প্রায় এক ঘণ্টা গুলি ও পালটা গুলি চলে। একপর্যায়ে জানা গেল পাকিস্তানি সেনারা গ্রামের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং পরে খবর পাই যে পাকিস্তানি সেনাদের গ্রুপটি ফটিকছড়ির গ্রামে ঢুকে অনেক বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। মাহাত্তির হাট, যুইগ্যাছোলা বাজার ও ডাবুয়ায় আমাদের আরও কয়েকটি যৌথ অপারেশনে রাজাকার আস্তানা ধ্বংস হয়, তবে তাদের ক্ষয়ক্ষতি জানা যায়নি। এছাড়া পাকিস্তানি বাহিনীর যোগাযোগ ও রসদ সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমরা কয়েকটি কালভার্ট টিএনটি স্ল্যাব দিয়ে ধ্বংস করি। এর কয়েকদিন পর ঘটে গেল এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা। ৮ ডিসেম্বর একটি মাদ্রাসায় রাজাকার আস্তানা অপারেশনে যাওয়ার জন্য রাউজানের বিএলএফ কমান্ডার নাজিম উদ্দিন খান আমাদের পাহাড়ে এসে যৌথ অপারেশনের পরিকল্পনায় বসেন রাউজান, পটিয়া ও আনোয়ারা গ্রুপ মিলে। প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা চলছিল। এ সময় হঠাৎ একটি গুলি নাজিম ভাইয়ের বুকে লাগে। আনোয়ারা কমান্ডার ছলিমুল হক চৌধুরী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' বলে চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং আমরা সবাই নাজিম ভাইকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগলাম। তাঁর রক্তে আমাদের জামাকাপড় লাল। আমরা আক্রান্ত হয়েছি ভেবে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দ্রুত ওই বেড়ার ঝুপড়ি থেকে বের হতেই পাশের কক্ষে আবিষ্কার করলাম আমাদের সহযোদ্ধা নাজিম গ্রুপের সুনীল চক্রবর্তীকে। সে তখনও হতভম্ব হয়ে বসে আছে এবং তাঁর হাতে একটি এসএলআর। জিজ্ঞেস করতেই সুনীল অকপটে স্বীকার করল রাইফেল পুল থ্রো করতে গিয়ে নল উপরের দিকে তাক না করে সমান্তরালে ট্রিগার চাপে, চেম্বারে গুলি আছে কি না তা জানতে। অদম্য সাহসী কমান্ডার নাজিমকে আমরা হারালাম এক সহকর্মীর অসাবধানতার কারণে। এরপর আমাদের একটি গ্রুপ নাজিম ভাইয়ের লাশ নিয়ে রাউজানে তাঁর বোনের বাড়িতে চলে গেল এবং আমরা ক্যাম্প ত্যাগ করে নানুপুরের দিকে চলে গেলাম।

এদিকে আমাদের উপ-আঞ্চলিক কমান্ডার স্বপন চৌধুরী ও তাঁর গ্রুপ ২৭ নভেম্বর রাঙ্গামাটির কাউখালীতে পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলে দুই দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তিনি ও তাঁর চারজন সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত অবস্থায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। সেখান থেকে পাকিস্তানি বাহিনী তাদেরকে রাঙ্গামাটির সেনা সদর দপ্তরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের পর ৩ ডিসেম্বর নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাঁর লাশও গুম করে তারা। শহিদ স্বপন চৌধুরীর সঙ্গে কাউখালীতে আরও যারা শহিদ হন তাঁরা হলেন: নুরুন্নবী, শচীন্দ্র লাল দেওয়ানজী, সুব্রত সাহা ও শংকর রায়। ১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কমিটির বর্ধিত সভায় 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ'-এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক স্বপন চৌধুরী, যা অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

পাকিস্তানি মিলিটারিদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে যে পাকিস্তান ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা মনে বড়ো আঘাত পায়। ইয়াহিয়ার পরিবর্তে জুলফিকার আলী ভুট্টো দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জোর কূটনৈতিক তৎপরতা এবং সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ও অন্য আন্তর্জাতিক নেতাদের চাপে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে কারাবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। এ সময় ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের অন্তত একটা লুজ ফেডারেশন রাখার অনুরোধ জানান বলে কেউ কেউ বলেন। তাহলে এই ভুট্টো তো বঙ্গবন্ধুকে চিনেননি। যে বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংগ্রাম করলেন পাকিস্তানি শোষকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য, তিনি কি কখনো এমন চিন্তা করতে পারেন? তবে ওই গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনগামী একটি বিমানে তুলে দেওয়ার সময় ভুট্টো তাঁর আত্মীয় ড. কামাল হোসেনকেও বিমানে তুলে দেন। সমাজতন্ত্রই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। এ কারণে তিনি বিলম্বে হলেও ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি যুদ্ধক্ষত একটি দেশের দ্রুত দারিদ্র্যবিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও শোষণমুক্তির লক্ষ্যে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। প্রচলিত গণতন্ত্রের পরিবর্তে সবাইকে নিয়ে একটি জাতীয় দল তথা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করেন। তিনি মনে করেছিলেন, এতেই জনগণের প্রকৃত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের মৌলিক অধিকার বাতিল না করেই তিনি শাসনতন্ত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তন এনেছিলেন পার্লামেন্টারি পদ্ধতির পরিবর্তে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে। দেশবাসী এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং গুটিকয় ব্যক্তি ছাড়া সর্বস্তরের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাকশালে যোগদান করেছিল। দেশের সাংবাদিকরাও ব্যাপকভাবে সে সময় বাকশালে যোগদান করেছিলেন। সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের একটি বইয়ে তিনি বাকশালে যোগদানকারী ঢাকার ২৪৪ জন এবং চট্টগ্রামের ৬৬ জন সাংবাদিকের তালিকা দিয়েছেন। এই নিবন্ধকারও সে সময় বাকশালে যোগদানকারীদের একজন। এটাকে যারা তখন বা এখন গণতন্ত্র হত্যা বলে, তাঁরা তো দেখতেই পাচ্ছে বর্তমানে কত মিলিয়ন সংখ্যক কোটিপতির জন্ম হয়েছে; ব্যাংক, বিমা আর সরকারি সম্পদ লুট করে বিদেশে অর্থ পাচার করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এখন আমরা মুজিববর্ষ পালন করছি। এ উপলক্ষ্যে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে দেশবাসীর কল্যাণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এই মুজিববর্ষেই সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও শোষণমুক্তির বৈপ্লবিক পদক্ষেপ তথা বাকশালের মাধ্যমে তিনি যে অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেই ব্যাপারে একটি বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠানের অন্তত আয়োজন করতে পারে।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

একাত্তর আসিবে না ফিরে আর হেথায়

মো. মফিজুল ইসলাম

সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া ভাষণের পরপরই আমরা সবাই তৈরি ছিলাম মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ভাষণ শুনে আর বুঝতে আমাদের বাকি রইল না যে–যুদ্ধে আমাদের যেতেই হবে। বয়সটাও ছিল কম, টগবগে যুবক। চাঁদপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে ডাক এলো 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বুঝতে পারলাম আমাদের ছাত্রসমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। ছিনিয়ে আনতে হবে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার লাল সূর্যটাকে। সারাবাংলার ছাত্র-যুবকসমাজ এক কাতারে এসে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ট্রেনিং নিতে শুরু করল দেশের অভ্যন্তরের মাঠে-ময়দানে। আমাদের এই ট্রেনিংয়ে সাহায্য করল সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর সাবেক এবং রেগুলার বাহিনীর ছুটিতে থাকা সদস্যরা।

'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল'–এটাও ছিল বঙ্গবন্ধুর আরেকটি নির্দেশ (ডাক)। আমি আমার রামপুর গ্রাম সংগ্রাম কমিটির একজন সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করলাম। আমাদের সংগ্রাম কমিটিতে ছিলাম অলি আহমেদ পাটোয়ারী, মফিজুল হক মজুমদার, মুখলেছুর রহমান, মরহুম সিদ্দিক পাটোয়ারী, মরহুম সিরাজুল ইসলাম, মরহুম আবদুল খালেক, শহিদুল্লাহ মজুমদার এবং আমি নিজে। আমরা বিচার-আচার থেকে গ্রাম কন্ট্রোলসহ সবই করতাম। ভারতে ট্রেনিংয়ের জন্য আমরা লোক পাঠাতাম চিরকুট দিয়ে। এখন তো অনেকেই সংগ্রাম পরিষদ বোঝেন না। কিন্তু তখন ভারতে ট্রেনিংয়ের জন্য যাওয়া যেত না বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত সংগ্রাম কমিটির চিরকুট ছাড়া।

আগস্টের দিকে গ্রামে-গঞ্জে তুমুল আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের দোসররা। আমরাও সংঘবদ্ধ হতে শুরু করলাম। চাঁদপুর সদর থানার ছোটসুন্দর হাইস্কুল মাঠে, ফরিদগঞ্জ থানার কড়ইতলী হাইস্কুল মাঠে, ওয়াপদার রাস্তার উপর আমাদের ট্রেনিং চলে। অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে বিলোনিয়া বর্ডার দিয়ে চেষ্টা চালাই ভারতে প্রবেশের; কিন্তু এ যাত্রায় ভারত প্রবেশে ব্যর্থ হই।

মো. মফিজুল ইসলাম

স্থানীয় ছোটসুন্দর বাজারে ১০ আগস্ট বর্বরোচিত হামলা, ২৬ জন শহিদ

১০ আগস্ট শুক্রবার সকালে স্থানীয় ছোটসুন্দর বাজারে বাজার করতে আর খবর শুনতে আসা নিরস্ত্র মানুষের ওপর আক্রমণ করে হাজীগঞ্জের রাজাকার বাহিনী এবং কমান্ডার বাচ্চু। সকাল ৮টার দিকে হঠাৎ আক্রমণ চালায় ছোটসুন্দর বাজারে। সেখানে গুলি ছুড়ে হত্যা করে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের জিএস সামসুদ্দিন আহমেদ কালু ভাইকে। সেখানে আসলাম কাকা, ওহাব কাকা, আবুল বাশার, আবদুল খালেক, হানিফ বেপারিসহ ২৬ জন বুলেটের আঘাতে শহিদ হন রাজাকার কমান্ডারের হাতে। আমি এই হত্যাকাণ্ড থেকে প্রাণে বেঁচে যাই। মুক্তিযোদ্ধারা তখনও এতটা সংগঠিত হতে পারেনি। তবে এরই মধ্যে মধুরোড রেল স্টেশনের কাছের জমজমিয়া ব্রিজের উপরের রেলের পুলটি আমাদের মুক্তিবাহিনীর একটি দল ধ্বংস করে দিলে পরে পাকিস্তানি বাহিনী আবার তা পুনঃস্থাপন করে চাঁদপুর-চট্টগ্রামের সঙ্গের রেল চলাচল সচল রাখে।

তারপর আমাদের চাঁদপুর কলেজের তৎকালীন ছাত্রনেতা মো. হানিফ পাটোয়ারীর সঙ্গে দেখা করে যোগ দিই তাঁর সঙ্গে। তিনি ১৯৬৯ সালে চাঁদপুর কলেজের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য সেই নির্বাচনে অন্য সব পদেই ছাত্রলীগের ছেলেরা জিতে যান একমাত্র ভিপি পদ ছাড়া। ভিপি পদে নির্বাচিত হন ছাত্র ইউনিয়নের আবদুর রহমান। হানিফ ভাই আমাদের ছাত্রলীগের নেতা এবং আমাদের বড়োভাই ছিলেন। বাড়ি চাঁদপুরের কোড়ালিয়া রোডে; কিন্তু ছিলেন মুজিববাহিনীর ফরিদগঞ্জ থানার কমান্ডারের দায়িত্বে ও নেতৃত্বে। ট্রেনিং নেন ভারতের উত্তর প্রদেশের দেরাদুনে। তাঁর নেতৃত্বে ছিলাম ৮ ডিসেম্বর চাঁদপুর মুক্ত হওয়ার এবং বিজয় অর্জনের পর পর্যন্ত।

১৯৬৯ সালেই বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হন। সারাদেশের মতো চাঁদপুরের ছাত্র-জনতাও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। বর্তমান চাঁদপুর জেলা ছিল তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমা। মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন আবদুর রব মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু জাফর মাইনুদ্দিন। চাঁদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন রফিউদ্দিন আখন্দ ওরফে সোনা আখন্দ। মিজানুর রহমান চৌধুরী ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা। চাঁদপুরে মিজানুর রহমানের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিলেন মরহুম আবদুল করিম পাটোয়ারী, আবুল কাসেম ওরফে টুনু চৌধুরী, নওজোয়ার ওয়ালী উল্লাহ, হরি বিলাস সাহা, মিজানুর রহমান পাটোয়ারী, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবি সিদ্দিক, অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আবদুল আউয়াল, অ্যাডভোকেট আবুল ফজল, বাচ্চু মিয়াজি প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বেই মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

তখনকার ছাত্রনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মরহুম রবিউল আলম ওরফে কিরণ ভাই, মনির আহম্মদ, জহিরউদ্দীন বাবর, বাচ্চু ভাই, অজয় কুমার ভৌমিক, সন্তোষ দাস, আবদুর রহমান মিয়াজি প্রমুখ। হানিফ ভাইয়ের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। হানিফ ভাই সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। সারাবাংলার ছাত্র-জনতার সেই আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি জান্তা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সেদিনই ছাত্রনেতারা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এরপর কঠিন আন্দোলনের মুখে সেনাশাসক আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে দাঁড়ালেন। ইয়াহিয়া খান বললেন নির্বাচন দিবেন, গণতন্ত্র দিবেন তারপর শুরু হয় ১৯৭০ সালের নির্বাচন। আমরা ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ২টি আসন বাদে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়ে মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে সরকার গঠনের অপেক্ষায় থাকেন বঙ্গবন্ধু। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো বনে গেলেন বিরোধীদলীয় নেতা। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ১ মার্চ অধিবেশন আহ্বান করলেন। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরোধিতা ইয়াহিয়া খানকে প্রভাবিত করে। ইয়াহিয়া খান বললেন, সংসদ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যরা যদি ঢাকায় আসেন, তাহলে অধিবেশন কসাইখানায় পরিণত হবে। তারপর হঠাৎ ১ মার্চ সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

তারপর সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন গভর্নর হাউসে বর্তমান বঙ্গভবনে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ করলেন, আলোচনা সন্তোষজনক হলো না। কিন্তু পার্লামেন্ট অধিবেশন তিনি ডাকলেন না। এর মধ্যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে সৈন্যসামন্ত আনলেন পূর্ব পাকিস্তানে। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারলেন ভুট্টো-ইয়াহিয়ার পাতানো ষড়যন্ত্র।

১ মার্চ থেকে বাংলার অবিসংবাদিত নেতার নির্দেশে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধু বাংলাকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবি সিদ্দিক দায়িত্ব নিলেন সাবেক আর্মি, বিডিআর ও আনসার বাহিনীকে একত্রিত করার। জুলাইয়ে আমরা মুক্তিবাহিনীরা অস্ত্র হাতে পাই। শেখ মনি ভাই ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগ বিএলএফ প্রধান। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ–এই চার মূলনীতি নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার লক্ষ্য

নিয়ে। জুলাইয়ের মাঝামাঝির পর থেকে প্রায় পুরো সময়টাতেই আমি কমান্ডার হানিফ ভাইয়ের সঙ্গে ছিলাম। নভেম্বর থেকেই ফরিদগঞ্জে আমাদের মুক্তিবাহিনীর তিন বাহিনী– বিএলএফ, এফএফ এবং এমএফ পাকিস্তানি বাহিনীকে ঘিরে রেখেছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর চলাচল, তাদের খাদ্য সংগ্রহসহ যাবতীয় কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। এসব কারণে ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ফরিদগঞ্জ থেকে পালিয়ে চাঁদপুর চলে আসে। ৪ ডিসেম্বর ফরিদগঞ্জ হানাদারমুক্ত হয়।

৫ ডিসেম্বর রাজাকার অধ্যুষিত কেরোয়া গ্রামটিতে রাজাকার নিধন চলে। ৬ ডিসেম্বর চাঁদপুরের উদ্দেশে রওয়ানা দেন হানিফ ভাই। ৭ ডিসেম্বর ইচলী ঘাটের পাশ দিয়ে ডাকাতিয়া নদীর পাড় দিয়ে চাঁদপুরে ঢোকার সময় জানা গেল পাকিস্তানি বাহিনী গত রাত ১০টার স্টিমারে উঠে চাঁদপুর থেকে চলে গেছে। ওই সময় আমাদের সব বাহিনী–এফএফ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার দুলু, জহির উদ্দিন বাবর ভাই, আবদুল মমিন খান মাখন ভাই এবং সৈয়দ আবেদ মনসুর ভাই তাঁদের দলবল নিয়ে চাঁদপুরকে চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে আছে।

৮ ডিসেম্বর খুব ভোরে বালুর ঘাট দিয়ে হানিফ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা সিএসডি গোডাউন হয়ে চাঁদপুরে ঢুকি। এ সময় মুক্তিবাহিনীর অন্য সব গ্রুপও বিভিন্ন দিক দিয়ে শহরে ঢুকে পড়ে, চাঁদপুর শহর মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে এবং চাঁদপুর হানাদারমুক্ত হয়। যুদ্ধ হয় চান্দিনা, কালির ভাংতি, পল্লীবিদ্যুৎ, কড়ইতলী প্রভৃতি স্থানে।

১৬ ডিসেম্বরে মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধুর হাতে ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে আমাদের ছাত্রত্বে ফিরে এলাম। শুরু হলো দেশকে পুনর্গঠনের কাজ। অবিরাম চেষ্টা করে দেশকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় যখন বঙ্গবন্ধু ফিরিয়ে আনলেন, সারাবাংলায় যখন চালের মূল্য সাড়ে তিন টাকা, সেই সময় পরাজিত শত্রুদের ষড়যন্ত্রে খুনি মোশতাকের নেতৃত্বে ছয়জন মেজর নেতৃত্ব দিয়ে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। ২১ বছর আওয়ামী লীগ লড়াই-সংগ্রাম করে বাংলাদেশকে আবার বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা করার সংকল্প নিয়ে ১৯৯৬ সালে দেশ শাসনের ক্ষমতা পান শেখ হাসিনা। যুদ্ধাপরাধের বিচার, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে গেলেন ২০০১ সালের নির্বাচনে। শুরু হলো জামায়াত-বিএনপির অত্যাচারের তাণ্ডব। আওয়ামী লীগ দলের প্রথম সারির নেতা সিলেটের এসএমএ কিবরিয়া, নাটোরের মমতাজ উদ্দিন, টঙ্গীর আহসান উল্লাহ মাস্টারের মতো অনেক নেতাকে হারাল। আন্দোলন-সংগ্রামের মুখে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পতন হলো।

তারপর শেখ হাসিনার সরকার তিনবার দেশের পরিচালনার দায়িত্ব নিল। দেশ এখন সমৃদ্ধ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশকে আরও উন্নত-সমৃদ্ধ করার মানসে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনা মহামারির কারণে পদ্মা সেতু, মেট্রো রেলসহ দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম খানিকটা ব্যাহত হলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি শুনলেই শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে অনেকের হৃদয় আর এই শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে বাঙালি জাতির গর্বের ও গৌরবের ইতিহাস। বাঙালি জাতির অহংকারের বীরগাথা। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির সূর্যসন্তান, শ্রেষ্ঠ সন্তান। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বলে আর মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন বলেই বিশ্বের মানচিত্রে জাতি পেয়েছে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। বাঙালি পেয়েছে তাদের ঠিকানা স্বদেশভূমি। তাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই এসেছে লাল-সবুজের পতাকা আর বিশ্বের বুকে এক গর্বিত মানচিত্র। জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে নিজের জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু আর আসবেন না, মুক্তিযুদ্ধও আর হবে না, মুক্তিযুদ্ধে আর কেউ যাবে না–এই গৌরবও আর কেউ নতুন করে অর্জন করতে পারবে না।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক

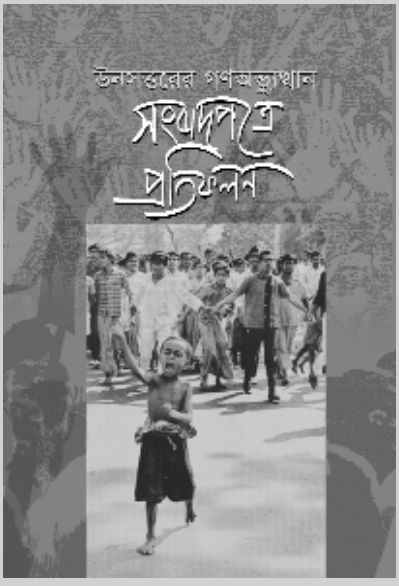

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

একাত্তর ও আমার কৈশোর

কালী রঞ্জন বর্মণ

ক্লাস শুরুর আগে স্কুল অ্যাসেম্বলিতে লাইনে দাঁড়ানোর সেই গতানুগতিক নিয়ম চালু আছে ঠিকই। তবে চাঁদতারা মার্কা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় লিডিং লাইনে দাঁড়িয়ে 'পাক সার জামিন সাদ বাদ' জাতীয় সংগীত গাওয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত কোনো ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অর্ধসহস্র ছাত্রের মধ্য থেকে আগের মতো আর কেউ আসছে না। মাঠজুড়ে সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক অনির্দিষ্টভাবে অনেক হাঁকডাক করলেন; কিন্তু কোনো ছাত্রই স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের এই জাতীয় সংগীত গাওয়ার জন্য লিডিং লাইনে দাঁড়াতে রাজি নয়। অবশ্য নাচের শিক্ষক মহোদয় চাকরি বাঁচানোর জন্য কোনো ছাত্রের নাম ধরে ডাকলে তো অবাধ্য হওয়ার উপায় নেই। কারণ তখনও দেশটা পাকিস্তান। সেটা উনিশ শ সত্তর সাল। আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র।

স্কুলের পাঠ্যসূচিবহির্ভূত কার্যক্রম হিসেবে সপ্তাহান্তে যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিনোদনচর্চার একটি ক্লাস হতো, সেটাও কয়েক বছর ধরে বন্ধ। গত বছর থেকে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য আমরা কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র আমাদের সাহিত্যের শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুছ স্যারের সঙ্গে আলোচনা করি। তিনি আমাদের ইচ্ছা ও উদ্যোগকে সমর্থন জানালেও এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের অনুমতি লাগবে বলে জানান। আমরা ক্লাস নাইনে থাকতে একবার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছি। অনুমতি তো দেনইনি, উলটো ধমক দিয়ে অফিস কক্ষ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তিনি খুবই কট্টর একজন অভিভাবক ও রক্ষণশীল মানসিকতার মানুষ। এবার আমরা স্কুলের সবচেয়ে বড়ো ক্লাসের ছাত্র এবং দেশকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এক নতুন উদ্দীপনায় দৃপ্ত হয়ে নাটকের অনুমতির

জন্য লিখিত আবেদনসহ প্রধান শিক্ষকের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্লাসের সহপাঠী ছাত্রী যারা এর আগে আমাদের সামনে ছেলেদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলারই সাহস পেত না (স্কুলের কড়া প্রশাসন ও কিছুটা লজ্জার কারণে), এবার তারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং নাটকের নারী চরিত্রে অভিনয় করার ব্যাপারেও তাদের সম্মতি জানাল। তাদের পরিবর্তিত এই মানসিকতায় আমরা অভিভূত। আমরা স্বোৎসাহে ছেলে-মেয়েরা দলবেঁধে প্রধান শিক্ষকের চেম্বারের সামনে হাজির হলাম। হেড স্যার তখন জোহরের নামাজের জন্য ওজু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এসময় আমাদের দেখে বোধহয় একটু বিরক্ত হলেন এবং ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে দেখে তিনি আরও বিগড়ে গেলেন। তাঁর বিরক্তি ও বিস্ময় কপালের কুঞ্চিত রেখায় ফুটে উঠল। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সেই টক ও তেতো মাখা স্বরে বললেন–'অ্যা..., তোদের আবার কী চাই? এখানেও কি দেশোদ্ধার করতে এসেছ?' আমি 'স্যার, আমাদের একটা আর্জি আছে' বলে আবেদনপত্রটি স্যারের দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি কাগজটায় একনজর চোখ বুলিয়েই শ্লেষমাখা স্বরে বললেন, 'এখন আবার যাত্রাপালা শুরু করবে নাকি? এত ঝামেলার মাঝে এসব না করলে আর চলছে না? তোমাদের এলাকা তো খুব ভালো, শান্তশিষ্ট! তা আইনশৃঙ্খলা সামলাবে কে?' আমরা বললাম, কোনো অসুবিধা হবে না স্যার, আমরা সামলাব। আরও বললাম, এবার নাটকে মেয়েরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করতে চায়, শুধু আপনি অনুমতি দিলেই হয়।

কালী রঞ্জন বর্মণ

তিনি এবার প্রচণ্ড রেগে গেলেন। বললেন, 'তা হলে তো হয়েই গেল, আমার অনুমতির দরকার কী? ওনারা তো নিজেরাই অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। যখন গুন্ডারা স্টেজ থেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে, তখন তার দায়দায়িত্ব কি তোরা নিবি? আমি এসব জানি না, তোদের যা ইচ্ছা তা-ই কর।' এই বলে তিনি হন হন করে বাইরে চলে গেলেন। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি নামাজের পর চেম্বারে ফিরে এলে আমরা এবার বেশি নমনীয় হয়ে বললাম, 'স্যার, নারী চরিত্র ছেলেরাই করবে, তবু আপনি অনুমতি দিন।' তিনি রাজি হলেন। সেটা সত্তর সাল বলেই সম্ভব হয়েছিল।

আমাদের হেড স্যারের পুরো নাম আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী। কিন্তু সবাই বলতেন 'খয়ের স্যার'। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে লেফটেন্যান্ট হিসেবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি চলে আসেন বলে আমরা শুনেছি এবং এ কারণেই তাঁর মেজাজ নাকি এমন কড়া, সবাই বলাবলি করত। তবে এ কথা সত্য যে, জ্ঞানে-গুণে একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন সবার উপরে–সেই সময়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের নাটক অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তা মঞ্চস্থ হয়েছিল। সম্ভবত নাটকটির নাম ছিল 'অবিচার'। আমরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর এই প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হলো। সত্তরের অক্টোবরে।

আমাদের স্কুলের নাম শ্যামপুর হাইস্কুল। এর একটি ঐতিহ্যগত আলাদা পরিচয়ও আছে। এটি এই স্কুলের দ্বিতীয় প্রজন্মের নাম। এর প্রথম প্রজন্মের নাম ছিল 'কুন্ডি হাইস্কুল'। কুন্ডি জমিদারদের দ্বারা এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪০ সালের দিকে। কুন্ডি পরগনা একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জমিদারির নাম। এই জমিদারির প্রাণপুরুষ কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' (প্রকাশকাল ১৮৪৭) এখানে থেকেই প্রকাশ করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীনকূল সর্বস্ব' রচনাও হয়েছিল (নাট্যকার রাম নারায়ণ তর্করত্ন) তার ঘোষিত পুরস্কারের বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এখান থেকেই। সেই কুন্ডি স্কুলটি প্রথমে নারী শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রয়োজনীয় ছাত্রী না পাওয়ায় পরবর্তী সময়ে সহশিক্ষার সাধারণ হাইস্কুল হিসেবে পরিচালিত হয়। পরে দেশভাগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে শ্যামপুর রেল স্টেশনের পাশে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় প্রজন্মের এই 'শ্যামপুর হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়।

নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসার কারণে স্কুলপড়ুয়ারা আরও বেশি আলোকিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অন্যান্য সুবিধার সঙ্গে রেলযোগাযোগে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় আমরা একদিন পরেই দৈনিক খবরের কাগজটা পড়ার সুযোগ পেতাম। সেসময় অর্থাৎ ষাটের দশকে ঢাকা থেকে আমাদের স্কুলে খবরের কাগজ আসত একদিন পর বিকালে, কখনো বা তারও একদিন পর সকালে। একটাই পেপার আসত 'ইত্তেফাক'। পেপার পড়ার জন্য তীর্থের কাকের মতো তক্কে তক্কে থাকতাম–কখন স্যারদের পড়া শেষ হবে এবং পত্রিকাটি আজকের মতো পরিত্যক্ত হবে। মাঝেমধ্যে অবশ্য ভেতরের পেজ চেয়ে নিয়ে পড়তাম। অথবা স্যাররা নিজেরাও ভেতরের পাতা খুলে আমাকে পড়তে দিতেন।

উনসত্তরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং সমসাময়িক ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবর পড়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অস্থিরতা ও উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। আমাদের স্কুলের মজিবর স্যার (মো. মজিবর রহমান) সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রতিদিনই বিকালের ট্রেনে হয় রংপুর অথবা বদরগঞ্জ যেতেন সাংগঠনিক কারণে। রাজনৈতিক কোনো সিদ্ধান্তের কোনো নতুন খবর থাকলে আমাদের জানাতেন এবং সেই অনুযায়ী আমরা স্কুলে ধর্মঘটের ডাক দিতাম। মিছিল ও পোস্টারিং করতাম।

এর মধ্যে একদিন আমরা স্কুল থেকে দেখতে পাই সামনের রাস্তায় মহিলাদের মিছিল। হাতে ঝাড়ু উঁচিয়ে আকাশ বিদীর্ণ করা চিৎকারে 'আয়ুবশাহী ধ্বংস হোক, ... নিপাত যাক' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে অন্তত দুই-আড়াই শ মহিলা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের প্রায় সবাই গরিব, খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক পরিবারের মানুষ, অনেকে দিনমজুর। মিছিলের অগ্রভাগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছাবেরা বেগম (প্রয়াত)–বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বাংলাদেশ আখচাষি সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক (পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ আখচাষি সমিতির সভাপতি এবং কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক) কমরেড ছয়েরউদ্দীনের স্ত্রী এবং আমাদের সহপাঠী বন্ধু দুলালের গর্ভধারিণী। এই প্রথম এরকম একটি মিছিল দেখে আমরা সত্যিই চমৎকৃত হলাম, যা আজও ভুলিনি।

এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে সামরিক শাসক লৌহমানব আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতার পালাবদলে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি হয়। এর মধ্যে পরিবর্তিত তারিখে এসএসসিসহ অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষাগুলো হয়ে গেল। আমাদের নিয়মিত ক্লাসও শুরু হলো। কিন্তু মন বড়ো উচাটন। বাঙালিদের মনে বিদ্রোহের যে আগুন লেগেছে, দূর মফস্বলে থেকেও আমরা তার প্রকৃত আঁচ অনুভব করতে পারছিলাম।

এর মধ্যে একদিন স্কুলে গিয়ে শুনতে পাই যে, শ্যামপুর রেলস্টেশনে কী গণ্ডগোল হয়েছে, হাজার হাজার লোক ট্রেন আটকে রেখেছে। আমরা ক্লাসের বেঞ্চে বই-খাতা রেখে রেলস্টেশনে গেলাম। স্টেশন প্ল্যাটফরম লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যেই আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম। দেখি গত রাতের লোকাল ট্রেনটি (পার্বতীপুর-লালমনিরহাট) এখনো ১নং লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন ভীষণ উত্তেজিত। বেশি ছোটাছুটি করছেন ছিদ্দিক ভাই। আমাদের স্কুলের সাবেক বড়ো ভাই। মনে হলো তিনি আজকের ঘটনার নেতৃত্বদানকারী। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন জনের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে যা বুঝলাম–শ্যামপুরের পাশের এক গ্রামের যুবক এনামুল (এনামুল গুন্ডা নামে সমধিক পরিচিত) রাতের ট্রেনে বদরগঞ্জ থেকে শ্যামপুরে আসার জন্য রেলস্টেশনে আসে; কিন্তু স্টেশন প্ল্যাটফরমে পৌঁছার আগেই ট্রেনটি ছেড়ে দেয়। তখন সে দৌড়ে গিয়ে একটি বগির হ্যান্ডেল ধরে পাদানিতে উঠে পড়ে। কিন্তু বগির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় ভেতরে ঢুকতে পারছিল না। সে দরজা ধাক্কা দিতে থাকে। কিছুক্ষণ ধাক্কা ও ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি খুলে দেওয়া হয়। ভেতরে ঢুকেই দেখে যে চারজন অবাঙালি আর্মি অফিসার ক্ষুধার্ত বাঘের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখেই আর্মিরা অকথ্য ভাষায় গালগাল করতে থাকে। সে প্রতিবাদ করায় শুরু হয় কথাকাটাকাটি, এরপর ধস্তাধস্তি। অফিসারদের সঙ্গে কথাকাটাকাটির ও ধাক্কাধাক্কির একপর্যায়ে ইয়াহিয়া খানের বীর পুঙ্গবরা মিলে এনামুলকে মারধর করে বদরগঞ্জ রেলস্টেশনের অদূরবর্তী পাকের মাথার রেলওয়ে ব্রিজের নিচে নদীতে ফেলে দেয়। ট্রেনে অন্য বগিতে থাকা শ্যামপুর এলাকার লোকজন দৃশ্যটি দেখতে পায়। ট্রেনটি পরে শ্যামপুর রেলস্টেশনে এসে থামলে ঝটিকাবেগে এই সংবাদ শ্যামপুরে প্রচার হয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে শত শত লোক জড়ো হয়ে যায়। তারা ড্রাইভার ও গার্ডকে ট্রেন ছাড়তে নিষেধ করে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। এরপর যে বগি থেকে এনামুলকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেই বগিতে উঠে চারজন আর্মি অফিসারকে মারধর করে এবং ট্রেনটিকে পেছনে চালিয়ে ঘটনাস্থলে যেতে বাধ্য করে। সেখানে লোকজন রাতভর খুঁজে খুঁজে একটু দূরে নদীর কিনারে আহত অবস্থায় এনামুলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর পুনরায় ট্রেন এসে থেমেছে শ্যামপুর রেলস্টেশনে। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি রংপুরের উদ্দেশে শ্যামপুর রেলস্টেশন ছেড়ে যায়।

তখন ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন চলছে। কিছুদিনের মধ্যে এনামুল ও ছিদ্দিক ভাইসহ প্রায় আট-দশজন যুবককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রংপুরের সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে তাদের বিচার হয়। বিচারে দণ্ড হিসেবে প্রত্যেককে পাঁচটি করে বেত্রাঘাত এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড করা হয়। এ ঘটনার কারণে স্থানীয় জনমনে পাকিস্তানি আর্মি ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। সাজাপ্রাপ্তরা পাকিস্তানি আর্মিদের শারীরিক নির্যাতনের কারণে কয়েক বছর অসুস্থ ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কিছুটা স্বাভাবিক হলেও তাদের জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল–ভুক্তভোগীদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে জেনেছিলাম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে অল্প সময়ের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুবার রংপুর আসেন। প্রথমবার রংপুর কালেক্টরেট মাঠে স্থানীয় আওয়ামী লীগের আয়োজনে তিনি এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এই প্রথমবার আমি বঙ্গবন্ধুকে অনেকটা কাছ থেকে দেখেছি। এত বড়ো একটা বিশাল মাঠে যেন লোক থইথই করছে। শহরের সব যানবাহন বন্ধ। বড়ো রাস্তা, ছোটো রাস্তা, অলিগলিতে মানুষ গিজ গিজ করছে। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই শুধু মানুষ আর মানুষ। আমরা আমাদের স্কুল শিক্ষক মজিবর রহমান স্যারের নির্দেশনায় শ্যামপুর হাইস্কুল থেকে একটি ব্যানার নিয়ে সারিবদ্ধভাবে আট মাইল হেঁটে শ্যামপুর থেকে রংপুর কালেক্টরেট ময়দানে পৌঁছি। সারাদিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, পথ পরিশ্রমের ক্লান্তি–সবকিছু ভুলে যাই শুধু একনজর বঙ্গবন্ধুকে দেখব বলে। আমাদের সে আশা সার্থক হয়। সব শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে অবস্থান করি। বয়স্করা বলাবলি করছিলেন এমন গণজোয়ার, এমন সমাবেশ তারা এর আগে কখনো দেখেননি। বঙ্গবন্ধু সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সব বাঙালিকে সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

এর কিছুদিন পর ডিসেম্বরের নির্বাচনের ঠিক আগে আগে বঙ্গবন্ধু ট্রেনে করে রংপুর-দিনাজপুর সফর করেন। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী ট্রেনটি রংপুর স্টেশন থেকে পার্বতীপুর যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য শ্যামপুর রেলস্টেশনে যাত্রাবিরতি করলে তিনি একটি কম্পার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে মাইকে বক্তৃতা দেন। শ্যামপুর স্টেশন প্ল্যাটফরমে নিবিড়ভাবে দাঁড়ানো অবস্থায়, স্টেশনবাজার, রেল সড়কের কিনারে থাকা নিম্নভূমিতে এবং পাশে দণ্ডায়মান বিভিন্ন গাছে চড়ে হাজারো উৎসুক জনতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনেন। তিনি আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানিদের শোষণ-শাসন থেকে মুক্তির জন্য 'নৌকা মার্কায়' আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানান। আমরা ট্রেন এসে দাঁড়ানোর আগে থেকেই মধ্য প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ছিলাম– যাতে শেখ মুজিবকে কাছাকাছি থেকে দেখতে পাই। কিন্তু ট্রেনটি আমাদের হিসাব গরমিল করে আরও একটু সামনে এগিয়ে দাঁড়ায়। আমরা জনতার ভিড় ঠেলে আর সামনে এগোতে পারি না। তিনটি বগির সমান দূরত্বে শেখ মুজিবকে ট্রেনের দরজা সমান একটি শালপ্রাংশু মানবমূর্তিতে দেখতে পাই। তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠের সেই উদাত্ত আহ্বানে জনতার পক্ষ থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠতে থাকে– 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি...'। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেনটি ছেড়ে যায় বদরগঞ্জ স্টেশনের উদ্দেশে।

ডিসেম্বরের ভোটের আগেই টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের পর স্কুল থেকে আমাদের বিদায়ের পালা। আমাদেরকে গোপনে একটি ক্লাসরুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে মজিবর স্যার বললেন, আমরা যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। কারণ পাকিস্তানি শাসকদের মতিগতি ভালো নয়। যে কোনো সময় পরিস্থিতি পালটে যেতে পারে। আর ভোটের সময় আমরা ভোটার না হলেও যেন আওয়ামী লীগের কর্মী বাহিনীকে সাহায্য করি। এ সময় নির্বাচনের পূর্বনির্ধারিত তারিখ একবার পিছিয়ে দেওয়া হয়।

সামনে পরীক্ষার চাপ থাকলেও মনটা কেমন অস্থির অস্থির লাগে। পড়ায় সেভাবে মন বসে না। মাঝেমধ্যে স্কুলে যাই। শ্যামপুর স্টেশন বাজারে গিয়ে শশি মামার 'হেয়ার কাট' সেলুনে বসি। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে নানা রকম আলোচনা হয়, শুনি। স্কুলে গিয়ে যতদূর সম্ভব বাসি খবরের কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। চারদিকে মানুষের মধ্যে নতুন চাঞ্চল্য। চোখেমুখে নবীন আলোর উদ্ভাস। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের আয়োজনে শ্যামপুর হাটখোলা ফুটবল মাঠ, পালিচড়াহাট স্কুল মাঠে, অযোধ্যাপুর ফুটবল মাঠের সমাবেশে আওয়ামী লীগের নৌকা

প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্লোগান ও হাত তুলে সমর্থন বুঝিয়ে দেয়–আমরা এবার এক হয়েছি। বাঙালি জেগেছে, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এরপর নেতাকর্মীদের পৃথকভাবে গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আর ভোট চাইতে হয়নি। এই জাগরণে হাটবাজারে, ট্রেনে বাসে, বন্দরে-গঞ্জে, রাস্তাঘাটে জনে জনে প্রচারণা চালিয়েছে জনতাই। এই দায় তখন আর কোনো নেতার দায় না–জেতার দায় সব জনগণের, সব বাঙালির, আপামরসাধারণের।

অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমরা তখনও ভোটার তালিকাভুক্ত হইনি। তবে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটার তালিকা অনুযায়ী ক্রমিক নম্বরের স্লিপ নিয়ে ভোটারদের হাতে হাতে দিয়ে ভোট প্রদানকে ত্বরান্বিত করি এবং কেউ যাতে বিরক্ত হয়ে ভোটদানে বিরত না থাকে বা ভোটকেন্দ্র ত্যাগ না করে, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করি। এছাড়া ভোট প্রদান শুধু একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই নয়, এটি যে একটি উপভোগ্য আনন্দ উৎসব এবং তা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করি। ভোটকেন্দ্রের স্কুল মাঠে সারি সারি খাবারের দোকান, খেলনার দোকানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে থেকে বয়স্ক পুরুষ-মহিলারাও কেনাকাটা করছেন। চৈত্র-বৈশাখে যেমন গ্রামে গ্রামে মেলা, বারুনি উৎসব লাগে, কেন্দ্রগুলো তেমনভাবেই সেজেছে। যে যার মতো আপন কাজে ব্যস্ত। ভোট দেওয়ার পর অনেকে জিলাপি, বাতাসা, কদমা ইত্যাদি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এ যেন রথ দেখে কলা কিনে বাড়ি ফেরা।

নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রচারমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে নিজেই ঘোষণা দিলেন–'পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।' আনন্দের জোয়ারে যেন ভেসে গেল সারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। তবু খটকা একটু লেগেই থাকল পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ব আচরণের অভিজ্ঞতার কারণে।

এসএসসি পরীক্ষার্থী হিসেবে বইপত্রের প্রতি আমার প্রেমের বাঁধন অনেকটা শিথিল হয়েছে ইতোমধ্যেই। কেন জানি পাঠ্যপুস্তকের প্রতি আর তেমন মনোযোগ নেই। আকর্ষণ বেশি রেডিয়োর খবর, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবরের প্রতি। এ সময় আমাদের পাড়ার ভূপেনদা (প্রয়াত ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়) রংপুর রেলওয়ে বুকস্টলে চাকরি করতেন। তিনি বাড়ি থেকে নিয়মিত রংপুরে যাওয়া-আসা করতেন এবং আসার সময় প্রতিদিনই কোনো না কোনো পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে আসতেন বিশেষত আমার অনুরোধে। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বয়সের অনেক ফারাক সত্ত্বেও আমাদের ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। নিত্যনতুন খবর পড়ে আমরা খুব উদ্দীপ্ত হতাম। এ সময় দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ছাড়াও পূর্বদেশ, সোনার বাংলা, নতুন বাংলা ইত্যাদি ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রপত্রিকা তিনি নিয়ে আসতেন। ভূপেনদা ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। নাটকে অভিনয় এবং গানও গাইতে পারতেন। আমাদের পাড়ায় বেশ আগে থেকেই একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল। প্রায় পুরো ষাটের দশকে (পঁয়ষট্টি সাল ব্যতীত) প্রতিবছর অন্তত একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা হতো–দুর্গাপূজার মৌসুমে। অন্য গ্রামের গ্রামবাসীদের অনুরোধেও কখনো বা সে এলাকার পুরুষ-মহিলাদের মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের মঞ্চায়িত নাটক পুনর্মঞ্চস্থ করা হতো। বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কেশবপুরের মানুষের আগ্রহের কারণে একাধিক নাটক পুনর্মঞ্চস্থ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে ঐতিহাসিক, বিনোদনমূলক, দেশপ্রেমমূলক বিভিন্ন শ্রেণির নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে। ভূপেনদাই ছিলেন সব নাটকের পরিচালক। ভূপেনদার বড়ো ভাই শংকরদা ভালো তবলা বাজাতে পারতেন, হারমোনিয়ামও। তবে গানের গলা তেমন ভালো ছিল না। গান শিখত হরেন কাকুর বড়ো মেয়ে সান্ত্বনা। শংকরদা কখনো তবলা কখনো বা হারমোনিয়াম বাজাতেন। অতুল কাকু বাজাতেন বাঁশি। ষাটের দশকে যখন রংপুর বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তখন বাঁশির শিল্পী নির্বাচনের জন্য বেতার কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিরা একবার আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা নিতে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না বলে অতুলকে নির্বাচিত করা যায়নি, পরে শুনেছি।

প্রতি সন্ধ্যায় পাড়ার মধ্যস্থলে সুনীলদের বাড়ির খুলিতে (বাইরের উঠোন) চট পেতে বসে বিভিন্ন সংগীত ও দেশাত্মবোধক গানের চর্চা করতাম আমরা। নিয়মিত গায়ক কেউ নেই; তবে সবাই মাইকে, রেডিয়োতে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শুনে শুনে সুর রপ্ত করে যে যেটা জানে সেইভাবে গাওয়ার চেষ্টা করতাম। যার কণ্ঠে যে গান ভালো লাগত, তাকেই অনুসরণ করা হতো। এভাবেই আমরা রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা', নজরুলের 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি', আব্দুল লতিফের 'সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা, সোনা নয় তত খাঁটি...' ইত্যাদি দেশের গানগুলো আমরা সুর, তাল, কণ্ঠ যেমনই হোক প্রাণের আবেগ দিয়ে গাইতাম। ভূপেনদার নেতৃত্বে এ সময় তালিমে অংশ নিত শিশির, সান্ত্বনা, বাবলু, হরিচরণ, অতুল সিংহ, পুলিন বর্মণ, শহীদুল প্রমুখ। মাঝেমধ্যে নালোকাকুর (লালমোহন বর্মণ) আড্ডাখানায়ও দিনের বেলায় খোল করতাল আর বাঁশি নিয়ে এসব গানের চর্চা হতো। এই চর্চাই পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকালে আমার যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। পরে পত্রিকা মারফত জেনেছিলাম ছাত্রলীগ আয়োজিত ৩ মার্চ তারিখের পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা পাকিস্তানের 'পাক সার জামিন সাদ বাদ' থেকে হয়তো মুক্তি পেতে যাচ্ছি, এজন্য আমরা খুবই আপ্লুত।

এই অন্তর্বর্তীকালীন পরিবেশে অর্থাৎ সত্তরের ডিসেম্বরে নির্বাচনের পর ১ মার্চের আগ পর্যন্ত একটা অস্বস্তিকর গুমোট সময়কালে দুটি বিষয় লক্ষ করে আমি বিশেষভাবে আশান্বিত হয়েছি, এর মধ্যে একটি–ছাত্রদের গুরুত্ব ও সম্মান অনেক উচ্চসীমায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে ছাত্রদের যে কোনো কাজকেই মনে হতো প্রয়োজনীয় এবং সমগ্র বাঙালির সার্বিক মঙ্গলের সমার্থক। সাধারণের কাছে ছাত্ররা দেবশিশুর মতো পবিত্র, সৎ ও সাহসী–তারা কখনো অন্যায়

ছাত্রদের গুরুত্ব ও সম্মান অনেক উচ্চসীমায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে ছাত্রদের যে কোনো কাজকেই মনে হতো প্রয়োজনীয় এবং সমগ্র বাঙালির সার্বিক মঙ্গলের সমার্থক। সাধারণের কাছে ছাত্ররা দেবশিশুর মতো পবিত্র, সৎ ও সাহসী–তারা কখনো অন্যায় করতে পারে না

করতে পারে না। তাই তখন আমরা নিজেরা ছাত্র হিসেবে গর্ববোধ করতাম। ছাত্র পরিচয়ে কোনো কাজে গিয়ে রাস্তায় তৃষ্ণার্ত হয়ে কোনো ব্যক্তি বা গৃহস্থের কাছে খাওয়ার জল চাইলে তিনি পরম আদরে জলযোগ করিয়ে ছাড়তেন। ট্রেনে ভ্রমণের সময় দেখেছি টিকিট চেকার সামনে এসে মুখের দিকে তাকিয়েই 'ওঃ ... ছাত্র' এই বলে টিকিট না দেখেই এড়িয়ে যেতেন। ভয়, যদি টিকিট না থাকায় ছাত্রটি বিব্রত হয়। এই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধে আপামরসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের অন্যতম উপাদান হিসেবে সেদিন মূর্ত হয়েছিল। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে সম্ভবত বাঙালির মনে একুশের অনুভূতি এবং আওয়ামী লীগের ছয়-দফার সমার্থক ১১ দফার ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের অবিস্মরণীয় সাফল্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

আর একটি লক্ষণ হলো, সাম্প্রদায়িকতার পারদভারী বিষময় বাতাস অনেকটা সহজ ও হালকা হয়ে এলো। ফুরফুরে হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার স্বস্তি বিরাজমান সবখানে যেন। আমার অভিজ্ঞতায় ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আশপাশে বেশকিছু সাম্প্রদায়িক সংঘাত হয়েছিল–যদিও এর অধিকাংশই ছিল প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় এবং তা ছিল একতরফা। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে এর সম্প্রসারণ ছিল ভয়াবহ। প্রতিক্রিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া হলো। ফলে ১৯৬৬ সালে আমরা যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠলাম, তখন নতুন নিয়ম অনুযায়ী বাধ্যতামূলক বিষয়াবলির সঙ্গে হিন্দু ছাত্রদেরও অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের বদলে অবশ্যই উর্দু পড়তে হবে। এর আগের বছর পর্যন্ত সংস্কৃত পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। সংস্কৃতের শিক্ষকও চাকরিতে বহাল আছেন। কিন্তু তার দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হলো। তিনি মনের দুঃখে, অপমানে পরের বছর ভারতে চলে গেলেন। সে বছরই ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রকাশ্য ফলাফল ঘোষণার সময় আমাকে 'প্রথম' হিসেবে ঘোষণা করা হলেও ডিসেম্বরের অবশিষ্ট কয়েকদিন ছুটির পর প্রথম দিন ক্লাসে গিয়ে দেখলাম ক্লাসের হাজিরা খাতায় আমার নাম লেখা হয়েছে ২নং ক্রমিকে। অর্থাৎ ঘোষণার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে যে কোনো প্রকারে আমাকে দ্বিতীয় করা হয়েছে। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। কেউ কোনোদিন এর কোনো ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন বোধ করেনি এবং ব্যাখ্যা চাওয়ার সামর্থ্যও আমার ছিল না। নীরবে সবকিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি।

একজন ভদ্র ও সুশীল বালক হিসেবে, লেখাপড়ায় তেমন খারাপ না হওয়ায় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় কয়েকজন শিক্ষক ও বন্ধুর অনুরোধে নবম শ্রেণিতে আমি স্কুল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিই। আমার একমাত্র প্রতিযোগী আমাদেরই একজন সহপাঠী। কিন্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করলাম আমার কোনো কোনো স্নেহশীল শিক্ষক আমার বিরুদ্ধে আমার প্রতিযোগী সহপাঠীকে শুধু সাম্প্রদায়িক অর্থে ভোট দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করছেন। এই বেদনা বাইরে থেকে দেখার বা বোঝার নয়, অন্তর্জ্বালা শুধু ভুক্তভোগীর একার।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর আজ উনিশ শ একাত্তরের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে এই নতুন পরিবেশে যেন নতুন করে চিনলাম আমার দেশকে। আমরা এখন মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারব। এখানে কেউ হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, বৌদ্ধ নয়, খ্রিষ্টান নয়–'আমরা সবাই বাঙালি' এই চেতনায় অসাম্প্রদায়িক নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্নবিভোর এক উদ্‌ভ্রান্ত কিশোর শান্তি ও সাহসের পাহাড় ডিঙিয়ে ভোরের লাল সূর্যটাকে হাতের দশটি আঙুল দিয়ে নিবিড়ভাবে ছুঁতে চায়। আমি শ্যামপুর স্টেশন বাজার থেকে জোনাকি জেগে ওঠার আগের সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদকে সূর্য ভেবে পূর্বদিকে রেললাইন ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগলাম। বিরতিহীন এক দৌড়ে আমি দুই মাইল দূরে আমার গ্রামের বাড়িতে এসে দাঁড়ালাম। দেশকে নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত একটি দীর্ঘ কবিতা লিখলাম। বারবার আবৃত্তি করলাম। সংশোধনের পর সংশোধন করলাম। কবিতা লেখার বাতিকটি শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সাল থেকেই স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে প্রথম। এরপর থেকে অভ্যাসটি আর বদল হয়নি। আজীবন সাথী হয়েই রইল।

সেবার ফাগুনের প্রকৃতির রং রক্তোজ্জ্বল ছিল না, কেমন যেন ফিকে-ফ্যাকাশে। সূর্যের আলোকে রহস্যময় হালকা কুয়াশার চাদরে মুড়ে দিয়েছে প্রকৃতি। তার সঙ্গে হালকা শীত শীত বাতাসে ধুন্ধুমার ধুলোর আস্তরণ সরষে আর ভাটিফুলের সৌন্দর্যে লেপে দিয়েছে কলঙ্কতিলক। মন ভালো নেই কারও। প্রতীক্ষা, উদ্‌বেগ আর উৎকণ্ঠা ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের সাফল্যকে ঘিরে। কিন্তু দুদিন আগেই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে নতুন উদ্‌বেগের জন্ম দিল ইয়াহিয়া খানের ১ মার্চের বেতার ঘোষণা–'জাতীয় পরিষদের অধিবেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।' বাতাসের বেগে এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গ্রামের সাধারণ মানুষ রাস্তায়, হাটবাজারে ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে, বাজারে রেডিয়োতে সংবাদ শোনার জন্য ভিড় করতে থাকে। পাকিস্তানের প্রতি তীব্র হতাশা, ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্ম নেয় মানুষের মনে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই প্রতীতি জন্মেছে যে, পাকিস্তান সরকার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। অতএব সংগ্রামই একমাত্র সমাধান।

সন্ধ্যায় বেতারে বিবিসি, আকাশবাণীর খবরে জানা গেল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ ঢাকায় এবং ২ মার্চ সারাদেশে হরতালের ডাক দিয়েছেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা করে সেখানেই তিনি ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। কার্যত ১ মার্চ অপরাহ্ণ থেকেই পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। এক ভয়াবহ অজ্ঞাত আশঙ্কার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য সমগ্র বাঙালি জাতি টান টান উত্তেজনা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে থাকল।

১ মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী ৩ মার্চ শ্যামপুরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। এলাকার ছাত্র-জনতা এবং শ্যামপুর চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি বিশাল মিছিল শ্যামপুর রেলস্টেশন বাজার থেকে শ্যামপুর হাইস্কুল হয়ে শ্যামপুর হাটখোলা গিয়ে সমাপ্ত হয়। মিছিলে গগনবিদারী স্লোগান–'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তুমি কে, আমি কে, বাঙালি বাঙালি' ইত্যাদি। অনেক জনমানুষের পদচারণায় ধূলিধূসরিত কাঁচা রাস্তাটি যেন অন্ধকার হয়ে এলো। আমরা হাটখোলা ফুটবল মাঠে পৌঁছানোর পর সেখানে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে স্থানীয় নেতারা বক্তৃতা শুরু করেন। এর মধ্যে আমাদের মধ্যে কে একজন প্রস্তাব করল যে, যেহেতু আজ সারাদেশে হরতাল, এখানকার কাজ তো প্রায় শেষ, চলো আমরা রংপুরের হরতাল দেখতে যাই। বলা মাত্রই আমরা চার-পাঁচজন গণজমায়েত থেকে উঠে এসে রংপুরের উদ্দেশে হাঁটা দিই। গঞ্জের হাট থেকে লাহিড়ীহাট হয়ে রংপুরের দূরত্ব প্রায় ১০ মাইল। রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই। দ্বিপ্রহরের রোদও বেশ ঝাঁজালো। তখনকার দিনের রাস্তাঘাটের মোড়ে মোড়ে এখনকার মতো চায়ের দোকান, খাবারের দোকান ছিল না। লাহিড়ীহাটের মোড়ে পৌঁছে আমরা একটি গাছের তলে দম নিই। কিন্তু তা-ও মিনিট কয়েকের জন্য। প্রবল উত্তেজনায় আমরা আবার হাঁটা শুরু করি। চন্দনপাট মাটিয়াপাড়া হয়ে আমরা যখন নাজিরের হাট মোড়ে পৌঁছি, তখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকটা হেলে পড়েছে। সামনে ঘাঘট নদী, নিসবেতগঞ্জের পারঘাট।

আমরা লক্ষ করলাম রংপুরের দিক থেকে লোকজন দ্রুত ফিরে আসছে। তাদের কাছে শুনতে পেলাম হরতালে গুলি হয়েছে। একজন

মারা গেছে। বিক্ষুব্ধ লোকজন বিহারিদের দোকানে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন শহরে কারফিউ চলছে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী লোকজন ফিরে আসছে। আমরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম শহরের দিকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উড়ছে। আমরা শহরে ঢুকতে না পেরে বাড়িতে ফিরে যাই। পরে জেনেছিলাম–৩ মার্চ হরতালের সময় যখন স্বতঃস্ফূর্ত জনতার একটি বিশাল মিছিল আলমনগর হয়ে রেলস্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। মিছিলটি পীরপুর খাদ্যগুদামের কাছে পৌঁছলে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শঙ্কু সমজদার রাস্তার পাশে একটি উর্দু লেখা সাইনবোর্ড দেখলে চিৎকার করে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সাইনবোর্ড সরানোর জন্য অন্যদের সঙ্গে এগিয়ে যায়। এ সময় অবাঙালি উর্দুভাষী সরফরাজ খানের বাড়ির ছাদ থেকে মিছিলের ওপর গুলি ছোড়া হয়। গুলিতে দুই কিশোর শঙ্কু সমজদার ও শরিফুল আলম (মকবুল) আহত হয়। একটি গুলি শঙ্কুর মাথায় বিদ্ধ হয়। আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার পথে শঙ্কু সমজদার (১২) মারা যায়। তখন পর্যন্ত মার্চের আন্দোলনে কেউ শহিদ হয়েছেন বলে জানা যায়নি, তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সম্ভবত শঙ্কুই প্রথম শহিদ। পরে জানা যায় যে, শহরে ওইদিনের সংঘর্ষে অবাঙালিদের দ্বারা আরও দুইজন ব্যক্তি শহিদ হন। বিক্ষুব্ধ জনতা জাহাজ কোম্পানি ও প্যারাডাইস কোম্পানির দোকানসহ উর্দুভাষীদের দোকানে অগ্নিসংযোগ করেছে।

পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে নানা জল্পনা আর দুর্ভাবনায় দিন কাটতে থাকে মানুষের। দৈনন্দিন কাজকর্মে কারও কোনো মন নেই। হালের বলদ, দুধের গাভি, পোষা বকরি–অসহায় প্রাণিকুলও অযত্ন-অবহেলায় বড়ো কষ্টে আছে। শান্ত, নিরীহ বেচারারা প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে–তাকালেই মায়া হয়। কিন্তু উপায় কী, সবারই একই অবস্থা। দিনে এর আঙিনায়, তার খুলিতে, ওর বৈঠকখানায়, এখানে-সেখানে পড়শিদের জটলা–কে কী খবর পেয়েছে, শুনেছে, সেসব নিয়েই দিনভর আলোচনা। কী হবে সামনের দিনগুলোয়! আর সন্ধ্যা হলেই যার বাড়িতে রেডিয়ো আছে, সেখানে গিয়ে ভিড় করে খবর শোনা–বালক থেকে বৃদ্ধ, খেতমজুর থেকে জোতদার, বেকার-চাকরিজীবী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একই আবেগ, একই উৎকণ্ঠায়–এক কাতারে সারাদেশ!

অবশেষে বহুপ্রতীক্ষিত সেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এলো। যেসব বাড়িতে রেডিয়ো আছে, তা বড়ো উঠোনে টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হয়েছে। সামনে ছোটোখাটো গণজমায়েত। বঙ্গবন্ধুর সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানে সবাই মন্ত্রমুগ্ধকর ক্যারিশমায় আবিষ্ট। সবাই যেন এমনটাই চাইছিলেন। এই আহ্বান যেন সব বাঙালির মনের কথা, প্রাণের কথা। তাই তো এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মাহুতি দিতেও কোনো ক্লেশবোধ নেই। ভাষণ শোনার পর ছোটো ছোটো শিশু ও বালকরাও 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

সবাই যেন এমনটাই চাইছিলেন। এই আহ্বান যেন সব বাঙালির মনের কথা, প্রাণের কথা। তাই তো এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মাহুতি দিতেও কোনো ক্লেশবোধ নেই। ভাষণ শোনার পর ছোটো ছোটো শিশু ও বালকরাও 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের নির্দেশ মতো অসহযোগ আন্দোলনে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। শহরের দোকানপাট, বেচাকেনা বন্ধ। গ্রামের হাটবাজার মোটামুটি খোলা থাকলেও কেনাবেচা অত্যন্ত সীমিত। তারপরও মানুষের মনে এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ নেই, কষ্ট নেই। তাদের কথা–আগে তো আমার দেশ। দেশকে মুক্ত করতে হবে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলোয় এবং শ্যামপুরে আঞ্চলিক সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এরপর ১২ বা ১৩ মার্চ শ্যামপুর হাটখোলা ফুটবল খেলার মাঠে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির ডাকে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। খবর পেয়ে আমি সাইকেল চালিয়ে সেদিন ওই জনসভায় অংশগ্রহণ করি। আমি দর্শক-শ্রোতা হিসেবেই সেখানে গিয়েছি। কিন্তু বক্তাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে শুনতে (বক্তাদের সবার নাম এখন আর মনে নেই) আমি খুব আবেগপ্রবণ ও আপ্লুত হয়ে পড়ি। মনে হলো আমারও কিছু বলার আছে, যেটা কেউ বলছে না; কিন্তু বলা প্রয়োজন। সভামঞ্চে লক্ষ করে দেখলাম, আমাদের মজিবর রহমান স্যার সভায় সভাপতিত্ব করছেন এবং সভামঞ্চে অন্যদের মধ্যে আছেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড ছয়েরউদ্দিন আহম্মদ। তিনি সভামঞ্চে বসে থাকলেও মাঝেমধ্যে উঠে গিয়ে সঞ্চালকের দায়িত্বও পালন করছেন। আমি সাইকেলটা একপাশে রেখে সভামঞ্চের কাছে গেলাম। আমি যে কিছু বলতে চাই, তা সঞ্চালক অথবা সভাপতিকে বলতে হবে। কিন্তু তারা তো মঞ্চে, ওখানে গিয়ে বলাটা অশোভন। আমি অস্থির অপেক্ষায় ক্ষণযাপন করতে থাকি। এমন সময় দেখি কাউকে খুঁজতে ছয়ের চাচা নিচে নেমে এসেছেন (তাঁর বড়ো ছেলে ছিল আমার সহপাঠী বন্ধু এবং পারিবারিকভাবে আমার ঘনিষ্ঠ তাই চাচা বলেই ডাকতাম)। তখন আমি তাকে সভায় কিছু বলার ব্যাপারে আমার অভিপ্রায়ের কথা জানাই। তিনি আমার প্রস্তাবে বরং খুশি হন–হয়তো এই ভেবে যে বড়ো যারা মঞ্চে বক্তৃতা করছেন, তারা সবাই কমবেশি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং তাদের বক্তব্য কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক। কিন্তু আমার মতো অর্বাচীন কিশোরের মনের কথা কী–জাতির এই ক্রান্তিকালে সে বিষয়টি জানাও কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মঞ্চে উঠে আমার নাম ঘোষণা করলেন। কয়েকদিন ধরে এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লিখিত আমার সংগ্রামী কবিতাগুলোয় যা বলতে চেয়েছি, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে গদ্যভাষ্যে গড় গড় করে সেসব কথাই বলে গেলাম। নিচে নেমে এসেও আমি আবেগ ও উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। কী বলেছিলাম, তা আর মনে নেই। তবে প্রথমবার কোনো রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমার ব্যক্তিগত আবেগের কথাগুলো বলতে পেরেছিলাম–সেই আত্মপ্রসাদে আপ্লুত হয়ে আমি সভাস্থল ত্যাগ করলাম।

আমাদের বাড়ি রেললাইনের ধারেই (রংপুর-শ্যামপুর-পার্বতীপুর রেলসড়ক)। আমাদের দূরবর্তী যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমও রেলপথ। বাড়ির কাছাকাছি একটি ছোট্ট রেলওয়ে ব্রিজ আছে–এই ব্রিজের ডাবল লাইনের জন্য দুই দিকে ৩টি করে মোট ৬টি শানবাঁধানো উঁচু বেদি আছে; যেখানে প্রায় বিকেলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নানা আলোচনা ও আড্ডা দেওয়া হতো। এখানে উল্লেখ্য, এই রেলসেতুতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের যাতায়াতের জন্য দুটি রেললাইন ছিল।

বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে একটি লাইন সরিয়ে নেওয়া হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনের সময় রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ, অচল। শোনা যায়, অনেক জায়গায় রেলের স্লিপার ও রেললাইন তুলে ফেলায় রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখন আর সে রকম আড্ডা হয় না, তবে প্রয়োজনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে আলোচনার জন্য মাঝেমধ্যে সেখানে বসা হয়। এখানে বসেই বিভিন্ন স্থান থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া খবরগুলো পরিবেশন করা এবং তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয় প্রয়োজন পড়লে। এই আড্ডা আলোচনায় একজন করে মধ্যমণিও থাকেন। এক্ষেত্রে শুধু বয়স বা জ্যেষ্ঠতা নয়–নেতৃত্বগুণেও কেউ মধ্যমণি হয়ে নির্দিষ্ট আসনটিতে বসতে পারেন।

২৪ মার্চ এমনই এক আড্ডায় আমরা বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন লোক মারফত বিভিন্ন খবর, উড়ো খবর, গুজব নিয়ে আলোচনা করছিলাম; এমন সময় আমাদের এক সহপাঠী বন্ধু সেকেন্দার এই আড্ডায় এসে উপস্থিত হলো। তাকে খুব ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। আমাদের পাড়ার পূর্বে অবস্থিত মাটিয়াল পাড়ায় সে তার আত্মীয় বাড়িতে এসেছে কিছুক্ষণ আগে, জানাল। সে আরও জানাল, তাদের ওখানে সাতগাড়া ইউনিয়নের দামোদরপুর ও সম্মানীপুর গ্রামে এক মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে এবং সে কারণে এলাকার লোকজন তাদের বাড়িঘর ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে।

সেকেন্দারের কাছ থেকে যা জানা গেল, তার সারমর্ম এই–ইদানীং অসহযোগ আন্দোলনের কারণে রংপুর সেনানিবাসের ঠিকাদাররাও তাদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে বিভিন্ন জায়গায় তাজা ফলমূল, মুরগি, ছাগল, ডিম ইত্যাদির অন্বেষণে আর্মিরা সেনানিবাসের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোয় হানা দিচ্ছিল। আজ সকালের দিকে একটি জিপে কয়েকজন আর্মি প্রথমে ক্যান্টনমেন্টের পাশে নিসবেতগঞ্জ হাটে এসে দোকানপাটে তাজা খাবারদাবার খোঁজাখুজি করতে থাকলে হাটের লোকজন এবং দোকানিরা দ্রুত দোকানপাট বন্ধ করে সরে পড়ে। এরপর আর্মি জিপটি বড়বাড়ী হাটের দিকের কাঁচা রাস্তায় ধীরে ধীরে রওয়ানা দেয়। এ সময় সম্মানীপুরের এক ব্যক্তি দ্রুত সাইকেল নিয়ে আগেই সম্মানীপুর এলাকায় আর্মিদের আসার খবর জানিয়ে দেয়। এদিকটায় কিছুদিন ধরেই আর্মিদের এইরূপ তৎপরতায় সম্মানীপুরের কয়েকজন যুবক তাদের এলাকায় আর্মিরা ঢুকলে প্রতিরোধ করা হবে বলে নিজেরা একটা পরিকল্পনা তৈরি করে এবং গেরিলা কায়দায় কীভাবে তাদের পরাস্ত করা যাবে, এ কর্মকৌশলও রপ্ত করে। ফলে এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলনেতা সাহেদ আলী (একজন পেশাদার কসাই) অন্যদের একত্রিত করে। তারা পার্শ্ববর্তী দামোদরপুরের বড়ো ময়দান ইদগাহ মাঠের কাছে রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা জিপটি ইদগাহ মাঠের উলটোদিকে হাকিম মিয়ার বাড়ির কাছে পৌঁছলে ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে সাহেদ আলী জিপের সামনে দাঁড়ান এবং জানতে চান যে, কেন তারা এখানে এসেছে। কথা বলতে বলতে আরও ৩-৪ জন যুবক গাড়ির কাছে চলে আসে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাহেদ আলী জিপের বনেটে উঠে সামনে বসে থাকা পাঞ্জাবি অফিসার লে. আব্বাসকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলে আব্বাস ধরাশায়ী হয়। সঙ্গে অন্যান্য যুবক এবং গ্রামবাসী অতর্কিত আক্রমণ করে সঙ্গের তিন আর্মির কাছ থেকে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেয় এবং বেধড়ক মারধর করে তাদের আধমরা করে ফেলে। পরে জিপ গাড়িসহ আহতদের দূরবর্তী ডাঙ্গীরপাড়ে নিয়ে রেখে আসা হয়। পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে দামোদরপুর, সম্মানীপুরের অনেক মানুষ নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছে। সে কারণে ওর এই গ্রামে আসা।

এ ব্যাপারে পরে আরও জানা যায়, আর্মিরা সেনানিবাসে ফিরে না যাওয়ায় সেনানিবাস থেকে একটি অনুসন্ধানী দল বেরিয়ে এসে তাদের খুঁজতে থাকে এবং উদ্ধার করে তাদের সেনানিবাস হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরদিন লে. আব্বাস মারা যায়। পরে পাকিস্তানি সেনারা গনেশপুর এলাকাকে ঘটনাস্থল মনে করে গনেশপুর গ্রামটি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। গেরিলা কায়দায় এমন প্রতিরোধযুদ্ধ সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটাই প্রথম।

২৪ মার্চের গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি আর্মিদের সঙ্গে লড়াইয়ের সংবাদ আমাদের খুব উদ্দীপিত করেছিল। উত্তেজনা, আশঙ্কা, নানা কল্পনায় রাতে ভালো ঘুমাতে পারিনি। অভ্যাসবশে সকালে উঠে বিষাদ ভরা মনে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রেলগুমটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে। সদ্যপুষ্করিণী থেকে আমার সহপাঠী বন্ধু নগেনের বড়ো ভাই নৃপেনদা সাইকেল চালিয়ে এসে থামলেন এবং বললেন যে, এদিকে এসেছেন রংপুর শহরের খবর নেওয়ার জন্য। তিনি রংপুর শহরে একটি 'সাইকেল স্টোরে' সেলসম্যান কাম ম্যানেজারের কাজ করেন। শহরের অবস্থা কী তা জানা দরকার। রেল গুমটিতে যে রেলখালাসি ও কর্মচারীরা থাকেন, তাদের মধ্যে আনু মিয়া বললেন যে, তারা শুনেছেন শহরে এখন কারফিউ চলছে। সবকিছু বন্ধ। সবাই অনিশ্চিত আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

চৈত্রের আকাশে কেন যেন বিষাদের ছায়া। গুপ্ত বাতাসে কেমন একটা ধোঁয়াটে উৎকট গন্ধ। বাড়ির পোষা কুকুরটা অকারণে ঘেউ ঘেউ, কোঁ কোঁ করে কাঁদছে। একটা অস্থির অশান্ত আবহাওয়া যেন নিথর, নিস্তব্ধ করে দিয়েছে সবকিছু। কোথায় কী ঘটছে কেউ তেমন কিছু জানে না। রেডিয়ো খুলেও তেমন নির্ভরযোগ্য কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না, না বিবিসি, না আকাশবাণী থেকে। সবার আন্দাজ ঢাকায় বড়ো কিছু একটা ঘটেছে। খবর রটেছে অনেক লোক মারা গেছে। বঙ্গবন্ধু কি বেঁচে আছেন? কেউ বলতে পারে না। ঢাকায়ও কারফিউ চলছে, তা তো ঢাকা রেডিয়োর খবরে জানা যাচ্ছে। এর অতিরিক্ত কিছু জানার উপায় নেই।

তবু অন্যান্য দিনের মতো ২৭ মার্চ বিকালে আমরা বাবুর হাটের পাশে বিমলদাদের বাড়িতে গিয়ে উঠোনে বসলাম রেডিয়োর খবর শোনার জন্য। তখন অন্যান্য খবরের সময় না হওয়ায় বিমলদা রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে কোন সেন্টারে কী হচ্ছে, তা দেখার চেষ্টা করছিলেন। হঠাৎ মিটারের কাঁটা সূক্ষ্ম এক জায়গায় যেতেই কানে ভেসে এলো 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' কথাটি, মুহূর্তের জন্য আবার অন্য কোথাও মিটার সরে গেল। এভাবে একটু পরে মিটারের কাঁটা ঠিক জায়গায় স্থাপন করার পর শোনা গেল–'আমি, মেজর জিয়া, মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি...।' এই ঘোষণা শুনে আমরা সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে কিছুক্ষণের জন্য সরগরম হয়ে উঠল বাড়ির অঙ্গন। এরপর সেখানে আলোচনা হতে লাগল এটা নিশ্চিত যে, সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ শুরু করেছে। আর কোনো দ্বিধা নেই–যুদ্ধই অনিবার্য। সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

২৮ মার্চ ১৯৭১ সাল। সকালের সূর্যটা লাল ছিল না সেদিন, ছিল মেঘলা আকাশে ঢাকা। মেঘের আড়ালে বেলা বাড়তে থাকে। মনের ভেতরে কেমন একটা অস্থিরতা অনুভব করতে থাকি আমি। কোথায় কী হচ্ছে জানার জন্য মনটা ছটফট করতে থাকে। ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে থাকি–এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। কোথায় যাব, জানা নেই। তবে বেরোতে হবে।

একটু পরেই আমার সতীর্থ বন্ধু ওপাড়ার রফিক এসে ডাক দেয়। আমি জামাটা কাঁধে টেনে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় কিছুদূর

যেতেই দেখা হয় সুশীলদার সঙ্গে। খেতে খেটে খাওয়া মানুষ। কিন্তু এখন কোনো কাজ নেই। আমরা বাবুরহাটের দিকে যাচ্ছি শুনে তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

আমরা বাবুরহাটে পৌঁছেই দেখি, বটতলায় দাঁড়িয়ে আছেন বিমলদা। এলাকার প্রবীণ শিক্ষক, যার বাড়িতেই আমরা সকাল-বিকাল রেডিয়োর খবর শুনে দেশের পরিস্থিতি অনুমান করি। দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিমলদার কাছ থেকে জানা গেল, গতকাল বদরগঞ্জফেরত (রংপুর সদরের পার্শ্ববর্তী থানা) লোকজনের কাছে পাওয়া তথ্যমতে, বদরগঞ্জ ও তার আশপাশে এলাকায় বেশকিছু বাঙালি আর্মি, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য কেউ খাকি পোশাকে, কেউবা সাদা পোশাকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাঙ্কার তৈরি করে লোহার হেলমেট এবং গাছের ডালপালা মাথায় দিয়ে যুদ্ধের মতো পজিশন নিয়ে আছে।

আলোচনার মাঝে ইতোমধ্যে আমাদের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছেন পুলিনদা, হরিদা, অতুল কাকু ও শহিদুল। সবার চোখেমুখে পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু একটা জানার অদম্য কৌতূহল যেন খেলা করছে। সবার ইচ্ছা, কোথায় কী হচ্ছে, তা এখনই জানতে হবে। অতএব, আলোচনায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হলো, রংপুর শহরের কাছাকাছি গিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর বিমলদা বাদে আমরা সাতজন রংপুর শহরের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আমাদের নিজ গ্রাম অযোধ্যাপুর থেকে যাদবপুর পার হয়ে ছোট্ট ঘাঘট নদী। নদীতে হাঁটুজল; কিন্তু টলটলে পরিষ্কার। দেখলেই আঁজলা ভরে নিতে ইচ্ছে করে। আমরা নদীর শীতল জলে চোখমুখ ধুয়ে নিলাম।

নদী পার হলেই মনোহরপুর গ্রাম। রাস্তার দুধারে ফসলহীন বিরান মাঠ। আমরা এগিয়ে যেতে থাকি সামনের গ্রাম বড়বাড়ীর দিকে। রাস্তার পাশের বসতবাড়িগুলো যেন কেমন সুনসান, নীরব। বাড়ির বাইরের উঠোনে খুঁটিতে বাঁধা গোরুগুলো ওদের সামনে দেওয়া শুকনো খড় না খেয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ওদের চোখেমুখেও যেন উদ্‌বেগের কালো মেঘ।

আকাশের মেঘ তখন অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। সূর্যটাকে অস্পষ্ট দেখা যায়। নীরব ছন্দে সমান তালে আমাদের পাগুলো যেন আপন টানে এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা। মুখে কারও কোনো কথা নেই। সবার মুখের কথা যেন কেউ কেড়ে নিয়ে উধাও হয়েছে। সবাই অধীর কোনো কিছু শোনার জন্য, জানার জন্য। আমাদের মধ্যে যে বড়ো বাচাল রসিক অতুল কাকু, তাঁর মুখও যেন কুলুপ দিয়ে আঁটা।

রাস্তায় চলতে চলতে আমরা লক্ষ করলাম, দূরে একজন লোক খুব দ্রুত সাইকেল চালিয়ে আমাদের দিকে আসছে। কাছাকাছি এলে লক্ষ করা গেল, চৌদ্দ-পনেরো বছরের এক কিশোর খালি গা, লুঙ্গি পরা, সাইকেলে চড়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে সাইকেল থামাতে থামাতে কাত হয়ে মাটিতে পা ঠেকিয়ে দাঁড়াল এবং দাঁড়িয়েই উত্তেজিতভাবে সে গড়গড় করে বলে গেল যে, 'আজ দুপুর ১২টায় সব বাঙালি মিলে লাঠিসোঁটা, যার যা অস্ত্র আছে তা-ই নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করা হবে। সবখানে খবর দেওয়া হয়েছে। সবাই প্রস্তুত। আপনারা এগিয়ে যান।' সে আরও বলল, 'বলদিপুকুর (মিঠাপুকুর), লোহানীপাড়া (বদরগঞ্জ) থেকে শত শত সাঁওতাল ট্রাকে করে এবং দেড় শ বন্দুক নিয়ে হারাগাছিরা হারাগাছ থেকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে আসছে। ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা সবাই রেডি আছে, তারা খবর পাঠিয়েছে বাইরে থেকে আক্রমণ করার। খান সেনারা অনেকে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি যান। আমি আরও খবর দিতে গেলাম।' কথাগুলো দ্রুত বলে আর মুহূর্ত দেরি না করে সে আমাদের পেছনের রাস্তায় মিলিয়ে গেল।

আমরা তার কথাগুলো শুনে উত্তেজনায় শিহরিত হলাম। বিস্ময় ও আকস্মিকতায় থরকম্প আমাদের দেহ ও মনে আমরা আলাদা রকম প্রাণশক্তি খুঁজে পেলাম। পা এবার দ্বিগুণ উৎসাহে সামনে বাড়তে থাকল। আর একটু বাদে বড়বাড়ী হাট। বড়বাড়ী হাটে গিয়ে দেখা গেল, স্থানীয় কতিপয় লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে, ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের বিষয়ে খবর পেয়ে আলোচনা করছে। আমরা মুহূর্তের জন্য তাদের কথা শুনে আর দেরি না করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। দেওডোবা গিয়ে রাস্তার বিপরীত দিক থেকে আসা দুজন পথচারীর কাছ থেকে জানা গেল, তেঁতুলতলা রেলগেটে অনেক লোক জড়ো হচ্ছে। তারা ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এসব কথা শুনে আমাদের দ্রুত হাঁটা দৌড়ে পরিণত হলো।

দেওডোবা গিয়ে রাস্তার বিপরীত দিক থেকে আসা দুজন পথচারীর কাছ থেকে জানা গেল, তেঁতুলতলা রেলগেটে অনেক লোক জড়ো হচ্ছে। তারা ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এসব কথা শুনে আমাদের দ্রুত হাঁটা দৌড়ে পরিণত হলো

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তেঁতুলতলা রেলগেটে উপস্থিত হলাম (রংপুর কারমাইকেল কলেজের নিকটবর্তী বর্তমান আরকে রোড লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে)। তেঁতুলতলা রেললাইন ও আশপাশে তখন প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন শ লোক উপস্থিত। এছাড়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ দিক দিয়ে ক্রমাগত দলে দলে শত শত লোকজন এসে জড়ো হচ্ছে। রেললাইনের পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে কারা যেন দা ও কুড়াল চেয়ে নিয়ে এসে পাশের বাঁশবাগান থেকে সরু ও মাঝারি আকারের বাঁশ কেটে নিয়ে এসে লাঠি বানানো শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে অনেক লাঠি কাটা হয়ে গেল এবং সবাই লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হলো। এখন ক্যান্টনমেন্টের দিকে অভিযানের পালা। বিভিন্ন দিক থেকে দলে দলে বিভিন্ন বয়সের লোক আসা অব্যাহত আছে। কিন্তু যারা আগে এসেছে, তাদের আর তর সইছে না। আর কত অপেক্ষা, আর কত? সবাই তাড়া দিচ্ছে–চলেন চলেন, শুরু করা যাক। সময় যে বয়ে যায়!

দুপুর গড়িয়ে সূর্য তখন হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। উপস্থিত বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কথা, আলাপ-আলোচনায় গুঞ্জরিত তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশটি দেখতে দেখতে একটি বিশাল জনসমাবেশে পরিণত হলো। হঠাৎ সমাবেশ থেকে কে একজন চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, ভাইসব আর দেরি নয় সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এখনই আমাদের ক্যান্টনমেন্টের দিকে যেতে হবে। চলো চলো, এগিয়ে চলো।

সমাবেশের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল– 'জয় বাংলা! বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' সঙ্গে সঙ্গে সমাবেশের প্রতিধ্বনি উঠল সমুদ্রের গর্জনের মতো। অতঃপর সারিবদ্ধভাবে লাঠি হাতে নবগঠিত আরকে রোড ধরে সামনে এগিয়ে চলল জনতার বিশাল মিছিল। সবার মধ্যে একটি যুদ্ধংদেহী ভাব। সবাই দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে

যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে পরস্পরের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনায় একটা বিশাল গুঞ্জরণ–অনেকটা কোলাহলের মতো শোনা যাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে স্লোগান উঠছে–জয় বাংলা! বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো...। তুমি কে আমি কে–বাঙালি বাঙালি...। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব... ইত্যাদি।

চলতে চলতে আমার পাশের এক শিক্ষিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাশের আরেক ভদ্রলোককে বলছেন, 'আচ্ছা ভাই আমরা যে বাঁশের লাঠি নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে যাচ্ছি, আমাদের হাতে তো অন্য কোনো অস্ত্র নেই। অথচ ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি আর্মিদের হাতে রাইফেল, মেশিনগান, কামান, কত ভারী ভারী অস্ত্র আছে। তারা সেসব চালালে আমরা তো কাছেই যেতে পারব না। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল–'তাহলে আমরা যাচ্ছি কেন?' কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ পাশের একজন বলে উঠলেন, 'আরে ভাই, রাখেন তো! ওদের কি আর কামান-বন্দুক চালানোর মতো সাহস ও সময় আছে নাকি? এত লোক দেখলে ওরা তো এমনিতেই পালিয়ে যাবে। যান, পা চালিয়ে যান ভাই। সামনের লোকজন অনেক এগিয়ে গেছে।' কথাটা শুনে আমার মনেও খটকা লাগল। সত্যি তো, এ কী করে সম্ভব? কিন্তু তখন সামনে-পেছনে মুহুর্মুহু স্লোগান, সবার উত্তেজনা এবং দুর্দমনীয় আবেগের কাছে এসব যুক্তি কোনো পাত্তাই পেল না। আমরা মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলাম, মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

আরকে রোড তখন সদ্যনির্মিত। মাটির তৈরি চওড়া কাঁচা রাস্তা, অব্যবহৃত, ফাঁকা। আমরা সেই নতুন ফাঁকা রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে যেতে থাকি। বিনোদপুরের কাছে যাওয়ার পর মিছিলের সামনের দিকের প্রায় সবাই লক্ষ করল, গুড়াতিপাড়ার দিক থেকে একটি লোক হাতে এক বিশাল তরবারি মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে এবং চিৎকার করতে করতে দৌড়ে মিছিলের দিকে আসছে। লোকটি যুবক, পরনে ট্রাউজার ও কালো গেঞ্জি, মাথায় বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া চুল, দেখতে অনেকটা ষণ্ডামার্কা চেহারার। সরাসরি মিছিলের সামনে এসে থামল। মুহূর্তের জন্য মিছিল থমকে দাঁড়াল। যুবক নিজেকে গুন্ডা পরিচয় দিয়ে বলতে লাগল, 'ভাইসব, আপনারা কোনো ভয় পাবেন না। সবার সামনে আমি থাকব। যদি মারতে হয় সবার আগে আমি মরব। জীবনে অনেক পাপ করেছি। এবার দেশের জন্য প্রাণ দিতে চাই।' একটু থেমে আবার বলল–'এই মাত্র খবর পাওয়া গেছে, পাকিস্তানি আর্মিরা ক্যান্টনমেন্টের পেছন দিয়ে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা গেলেই ক্যান্টনমেন্ট দখল হয়ে যাবে। আমরা আর দেরি করব না। তাড়াতাড়ি চলেন।' এই বলে যুবক সবার সামনে মিছিলের অগ্রভাগে বীরের মতো হাঁটতে লাগল।

সাতঘড়ার কাছাকাছি গিয়ে (বর্তমান কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের পাশে) মিছিলটি থেমে গেল। মিছিলের অগ্রভাগ থেকে একজন চিৎকার করে বললেন, 'ভাইসব, আমরা এখন আর সামনের রাস্তায় যাব না। আপনারা রাস্তার বামপাশে জমিনের উপর দিয়ে সারিবদ্ধভাবে লাঠি নিয়ে উপশহর ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে যান। ক্যান্টনমেন্টের অন্যদিক থেকেও হাজার হাজার লোক এগিয়ে আসছে। জয় বাংলা।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন রাস্তা থেকে নেমে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে পরিত্যক্ত ফাঁকা মাঠ, কোথাও ঢেলাযুক্ত চষা মাঠ আর খেসারি-কলাই খেতের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল ক্যান্টনমেন্টের দিকে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিশালী জওয়ান সুশীলদা 'আক্রমণ করো' বলে চিৎকার করে মাথার ওপর বাঁশের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে সবার আগে সামনের দিকে দৌড়ে চলে গেল। একসঙ্গে যাওয়ার জন্য তাকে কিছুতেই থামানো গেল না। আমিও অন্যদের সঙ্গে কলাইখেতের মাঠে নেমে হাঁটা শুরু করলাম–হাতে বাঁশের লাঠি। কিছুদূর যাওয়ার পর বুঝলাম, আমি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমার সঙ্গে আছে শুধু রফিক। আমাদের অন্য সাথীরা কে সামনে গেছে বা কে পেছনে আছে, তা ঠাহর করা মুশকিল। একবার পেছনে তাকালাম, দেখি হাজার হাজার লোক স্রোতের মতো সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, কেউ লাঠি হাতে, কেউ খালি হাতে, কেউবা গাছের ডাল, দা, কাস্তে বা পাথর হাতে যুদ্ধের জন্য সামনে ধাবমান। আমাদের বাঁয়ে কিছুদূরে একটি বড়ো বাঁশঝাড়, ডানে দূরে গাছপালাঘেরা শান্ত নির্জন গ্রাম, আর সামনে মাথার ওপর উত্তোলিত লাঠি হাতে দ্রুতপদে এগিয়ে চলা বালক থেকে পৌঢ় অবধি শতসহস্র মানুষ।

তখন শেষ বিকেল। বাঁশবাগানের মাথার ওপর লাল সূর্যটা জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ ঠা... ঠা... ঠা... শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মেশিনগানের গুলি। মনে হলো খুব কাছাকাছি থেকে গুলি করা হচ্ছে। অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক। সবকিছু যেন থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। জনতার মূলস্রোত তারপরও এগিয়ে চলল সামনের দিকে। কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে মাঠে, কেউ কেউ সরে যাচ্ছে বাঁশবাগানের দিকে আপাতত নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। দু-একজন ভয়ে পিছু হটে ফিরে যেতে থাকে। কিন্তু এরই মধ্যে এই আক্রমণের খবর বিদ্যুদ্‌বেগে চারদিকে প্রচারিত হওয়ায় মেশিনগানের গুলির শব্দ আর মৃত্যুভয় উপেক্ষা করেও এই অভিযানে চারদিক থেকে নতুন করে যোগ দিতে থাকে অজস্র জনতা। যেন এই গুলি, এই মৃত্যুভয় কোনো বাধাই নয়।

মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। একটুখানি থেমে আবার শব্দ ঠা... ঠা... ঠা...। গুলির শব্দে এবং আঘাতে বাগানের বাঁশগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। আমাদের সামনে দিয়ে এক আহত কিশোর দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, ওর পায়ে গুলি লেগেছে। প্রচুর রক্ত ঝরছে। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমরাও শুয়ে পড়লাম খেসারি-কলাইখেতের নরম চাদরে। আতঙ্ক, উত্তেজনা ও আকস্মিকতায় নিশ্চল পাথরের মতো পড়ে থাকলাম আমরা দুজন। লাল সূর্যটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁশবাগানের ওপারে হারিয়ে গেল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। হঠাৎ গুলির শব্দও থেমে গেল।

আমরা দুজন এক দৌড়ে পাশের বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢুকে একটা গর্তের মতো নিচু জায়গায় শুকনো পাতার উপর শুয়ে পড়লাম। তখনও মাঝেমধ্যে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ খুব কাছাকাছি শুকনো পাতা ভাঙার মচমচ শব্দ শুনে মনে হলো কারা যেন আসছে এদিকে। আমরা কানখাড়া করে একদম কাঠ হয়ে পড়ে থাকলাম। এ সময় অন্ধকারে দুটি লোক এক আহত তরুণকে ধরাধরি করে এনে আমাদের পাশে শুইয়ে দিল এবং নিচু গলায় আমাদের বলল, 'ওর বুকে গুলি লেগেছে। ওকে বাঁচাতে হবে।' বলেই লোক দুটি ত্বরিতে অন্ধকারে মিশে গেল। আমরা উঠে বসলাম। তরুণের দেহ অচেতন। রক্তে জামা ও লুঙ্গি ভিজে গেছে। ওকে নিয়ে আমাদের কী করা উচিত, সেই বোধশক্তিও যেন হারিয়ে গেছে। আমরা নিশ্চল মূর্তির মতো কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। এ সময় আশপাশে আবার শুকনো পাতার মচমচ শব্দ। আবার আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, প্রতীক্ষার প্রহর। ফিরে আসে সেই লোক দুটো। কাছে এসে একজন বললেন, এখন ক্যান্টনমেন্ট থেকে আসা পাকিস্তানি আর্মিরা গাড়ি থেকে নেমে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে খুঁজে বাঙালিদের যেখানে যাকে পাচ্ছে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে। এখানে এভাবে থাকা নিরাপদ হবে না। চলো, এখনই এখান থেকে সরে যেতে হবে।' নিচে পড়ে থাকা তরুণের অচেতন দেহ ওরা দুজনে কাঁধে তুলে নিল। অন্ধকারে বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে ওরা। আমরা দুজন ওদের অনুসরণ করি। জঙ্গল পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে মেঠোপথ। অবশেষে জোনাকজ্বলা অন্ধকারে আমরা এগিয়ে যাই আরেক পথের সন্ধানে।

২৮ মার্চের সেনানিবাস অভিযানের পর পাকিস্তানি আর্মিরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অভিযানের দিন আর্মিরা মেশিনগানের গুলিতে

এবং লুকিয়ে থাকা মানুষকে খুঁজে খুঁজে বেয়নেট চার্জ করে প্রায় একশ লোককে হত্যা করে। তাদের দেহ পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে নিসবেতগঞ্জ ঘাঘট নদীর পাশে একটি খালে ফেলে দেয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোয় আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। রংপুর শহরের রাজনীতিবিদ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে তাঁদের হত্যা করে লাশ ফেলে দেয়। চারিদিকে একটি অস্থিরতা, বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে।

দেখতে দেখতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের হিন্দুপাড়াগুলো ফাঁকা হয়ে যেতে থাকল, শুধু আমাদের পাড়া বাদে। পাড়ার জ্যেষ্ঠরা একমত হতে না পারায় শেষ পর্যন্ত কোনো পরিবারই ভারতে গেল না। আমি সুযোগ খুঁজতে থাকলাম। এর মধ্যে এপ্রিল চলে গেল। মে মাসের শেষের দিকে একদিন রাতে আমাদের পাশের মুন্সিপাড়ার গোলজার ভাই তার দুইজন সহযোগীসহ এসে হাজির হলেন। তাদের সবার হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। তিনি বললেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন এবং ভারত গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছেন। গোলজার ভাই বেশ কয়েক বছর আগেই সম্ভবত ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন এবং বরাবর পশ্চিম পাকিস্তানে তার পোস্টিং ছিল। জানুয়ারিতে তিনি ছুটিতে এসে আর ফিরে যাননি। ২৫ মার্চের পর হঠাৎ করে তিনি উধাও হয়ে যান। তারপর আমরা কেউ আর খোঁজখবর জানতাম না। এখন তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং এখানে একটি দলকে তিনি প্রশিক্ষণ দিতে চান।

আমরা সানন্দে তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়ে পাড়ায় আমাদের যুব-কিশোরদের নেতা লালমোহন কাকুর বৈঠকখানায় প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি। তিনি এক সপ্তাহ ধরে আমাদের থ্রি নট থ্রি, রাইফেল, স্টেনগান ও এলএমজি চালানো শেখালেন।

ইতোমধ্যে আমাদের গ্রাম থেকে এক মাইল পশ্চিমে 'গাড়ার কুড়া' রেলওয়ে ব্রিজে পাহারা দেওয়ার জন্য রাজাকারদের একটি দল মোতায়েন করা হয়েছে। তারা প্রায়ই আশপাশের গ্রামগুলোয় গিয়ে নানা উৎপাত করত। এর মধ্যে একদিন খবর পাওয়া গেল, আমাদের পাড়ার উত্তরে ভাটিয়াপাড়ার আব্বাস খলিফার মেয়েকে জোর করে বিয়ে করার জন্য রাজাকাররা রাতে ওই বাড়িতে আসবে। গোলজার ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা তিনজন (লালমোহন কাকু, পুলিনদা এবং আমি) একটি এলএমজি, একটি স্টেনগান এবং দুটি রাইফেল নিয়ে অযোধ্যাপুর রেলগুমটির উত্তরের রাস্তায় কালভার্টের নিচে ওতপেতে থাকলাম। রাজাকাররা ছিল তিনজন। তারা হাসাহাসি, ঢলাঢলি করে, গান গেয়ে ফুর্তিতে রাস্তা দিয়ে আসছিল। রেঞ্জের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গোলজার ভাইয়ের এলএমজি গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্ত্র থেকে অগ্নিবর্ষণ শুরু হলো। এমন আক্রমণ–পালটা গুলি করার কোনো সুযোগই পেল না। বরং তারা আচমকা গুলি খেয়ে চিৎকার করে দিগ্‌বিদিক ছুটে পালিয়ে গেল। গুলিবিদ্ধ একজন পড়ে থাকল। আমরা তাড়াতাড়ি ফাঁকা মাঠ হয়ে সরে পড়লাম।

আমরা তিনজন সেদিন রাতেই গ্রাম ছাড়লাম। খবর পেয়ে পরদিন রংপুর থেকে একদল আর্মি ট্রেনে করে এসে আশপাশের গ্রামগুলোয় অপারেশন শুরু করে। সকালেই গ্রামগুলো অবশ্য প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই আমার পাশের বাড়ির রূপালী রানী সিংকে আর্মিরা ধর্ষণ করে।

এরপর গোলজার ভাইয়ের সহায়তায় আমরা তিনদিনে লালমনিরহাট সীমান্ত পার হয়ে ভারতের কোচবিহারের সিতাই বর্ডারে পৌঁছি। সিতাই যুবশিবিরে যোগদান করি। সেখান থেকে দিনহাটা ও কোচবিহার ক্যাম্প হয়ে টাপুরহাট ও শিলিগুড়িতে প্রশিক্ষণ শেষে ৬নং সেক্টরের ৪নং লালমনিরহাট সব সেক্টরে যোগদান করি। লালমনিরহাট ও কালীগঞ্জ থানার বিভিন্ন গেরিলা অপারেশনে অংশ নিই। সেসময় এই সাবসেক্টরের কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক আজকের প্রভাত

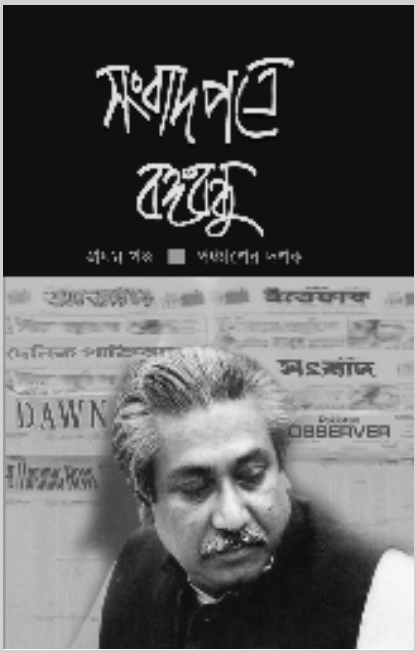

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধে সজীব গ্রুপের দুঃসাহসী সেই বিচ্ছুবাহিনী

এ জেড এম রাহাগীর

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের জীবনবাজি রেখে যারা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় অর্জন করেছে, সেটাই জীবনের সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। কাজেই সজীব গ্রুপের বীরত্বগাথা সব ঘটনাই বিজয়ের মাসে আমার হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। অতীতকে ভুলতে চেয়েও সেই স্মৃতি কখনো ভুলতে পারিনি আর ভোলাও যাবে না। তা হলো, এক ভারতীয় বৈমানিক মেহেরাকে উদ্ধারে মুক্তিযোদ্ধা সজীব গ্রুপের তৎপরতা। স্কুল-কলেজের কোমলমতি ছাত্রদের সমন্বয়ে গঠিত সজীব গ্রুপ (Y প্লাটুন) দেশমাতৃকার স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসের অংশ। আজকের লেখা কোনো স্মৃতিচারণ নয়, এটা কেবল মুক্তিযুদ্ধে ঘটে যাওয়া সজীব গ্রুপের মানবতার একটি খণ্ডচিত্র, যতদূর মনে পড়ে।

১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে চলছে চূড়ান্ত পরিণতি লাভের দিকে। ঢাকার নিকটস্থ সাভার হাইড-আউট-এ অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে অবস্থান করছি। যখন মন চাইছে, তখনই 'হিট অ্যান্ড রান' গেরিলা টেকনিকে এক্সপ্লোসিভ, গ্রেনেড, জিলেটিন বোম, ফসফরাস, এন্টি-টেক ও এন্ট্রি পারসোনাল মাইন নিয়ে অবরুদ্ধ রাজধানী ঢাকার ভেতরের বিভিন্ন জায়গায় ছোটো-বড়ো অ্যাকশন চালিয়েছি। আবার কখনো বা পাকিস্তানি হানাদার আর্মি ও জামায়াতে ইসলামীর দালাল, রাজাকার এবং আলবদরদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলছিলাম। এসব এলাকা ছিল ২ নম্বর সেক্টরের অধীন এবং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ এবং ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ছিলেন মেজর হায়দার। সেক্টর হেডকোয়ার্টার মেঘালয়ে (ত্রিপুরা) অবস্থিত ছিল। ২১ নভেম্বর থেকে যৌথ কমান্ড স্থাপিত হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চতুর্থ কোর-আর

ডেল্টা সেক্টর ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিংয়ের অধীনেই সেক্টর-২ ছিল। চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে মতিনগর, মেলাঘর ও বাগমারা ট্রেনিং সেন্টার থেকে গেরিলা ও হায়ার আর্মস ট্রেনিং শেষ করে ঢাকার লালবাগ থানা কমান্ডার নিযুক্ত হন আজিমপুরের হ্যান্ডসাম, স্মার্ট যুবক সজীব। বিচ্ছু জালাল, বারী, আনাম, শাহনেওয়াজ, হেলাল, বাহাউদ্দিন, খোকন, নয়ন, খোকা, সাইফুল, লুৎফর, রাহাগীর, মুজাহিদ, সরোয়ার, মঞ্জু, মাহাবুব, লিটন, মানিক, হেদায়েত, বুলবুল, হানিফ, কুদ্দুছ, ফুয়াদ, বাবুল, ফয়েজ প্রমুখ ছিলেন সজীব গ্রুপের সদস্য। আমাদের বলা হতো সেক্টর-২-এর 'Y' প্লাটুন।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর কনকনে শীতে সাভারের মুশুরীখোলা তুলাতুলি গ্রামে কুদ্দুছ আলীর বাড়িতে অস্ত্র হাতে জেগে আছি। কয়েকদিন ধরে রাতে ব্লাক আউট চলছে, সাইরেন বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিমানবিধ্বংসী গোলায় ঢাকা শহর ও আশপাশ কেঁপে উঠছিল। তখন রাত ৩টা। সবাই অস্ত্র হাতে ঘর ছেড়ে খোলা মাঠে টমেটো, মুলাখেতের ওপর বসে ঢাকার দিকে তাকাচ্ছি। কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছি। আমাদের হাইড আউট থেকে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। আকাশে ছোড়া গোলা থেকে ট্রেসার বুলেটে পুরো আকাশটা যেন ঝলক মারছিল এবং ফুলঝুরির মতো ট্রেসার বুলেটগুলো আকাশের দিকে ছুটছিল। গোলার শব্দে গ্রামবাসী পাকিস্তানি আর্মির হামলার আশঙ্কায় গোরু, ছাগল, মুরগি হাতে ধলেশ্বরী নদীর দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। রাত ৩টার দিকে ঢাকার আকাশে শুরু হয় বিমানযুদ্ধ। এর আগে আমাদের বিমানযুদ্ধ দেখার অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই সে যুদ্ধের স্মৃতি আজও অনেকেই ভুলতে পারেননি। সে রকম বীরত্বগাথা যোদ্ধা হিসেবে আমি তুলে ধরছি সজীব গ্রুপের পাইলটের যুদ্ধের অজানা কাহিনি। ৩ ডিসেম্বর মধ্যরাত ৩টায় যৌথ বাহিনীর (মুক্তিবাহিনী, গেরিলাবাহিনী ও মিত্রবাহিনী নিয়ে গঠিত) মিগ-২১ পশ্চিমবঙ্গের দমদম বিমানবন্দর থেকে এসে সজীব গ্রুপের ক্যাম্পের উপর দিয়ে শাঁ-শাঁ শব্দে উড়ে গেল ঢাকা বিমানবন্দরের দিকে। বোম্বিংয়ের ফলে আগুনের লেলিহান কুণ্ডলী আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা ছিল পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। পাকিস্তানি জঙ্গি বিমানগুলো এখানেই ছিল। ঢাকায় রাখা মিগ-১৯ জঙ্গি বিমানগুলো আর্মিরা সরিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছিল। ঢাকায় রেখে গিয়েছিল শুধু ১৪টি স্যাবর জেট এবং এম-১৮ এলুউট হেলিকপ্টারগুলো। এগুলো ঢাকার বিমানবন্দর থেকে ফ্লাই করে বিভিন্ন জেলার যৌথ বাহিনীর স্থল আক্রমণ রুখতে বোম্বিং করত। তাই যৌথ বাহিনীর প্রথম টার্গেট ছিল ঢাকা বিমানবন্দর। এ রাতে পাকিস্তানি শত্রু বাহিনীর বিমানগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঢাকার আকাশ যত দ্রুত সম্ভব দখলে নেওয়ার প্রচেষ্টা নেয় যৌথ বাহিনী। পাকিস্তানি স্যাবর জেটগুলোও তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে উড়ে বাধা দিতে থাকে। সারারাত বিমানবিধ্বংসী ফায়ার বোম্বিং ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলতে থাকে। এভাবেই শুরু হলো বিমানযুদ্ধ। একবার ছুটে আসে মিগ-২১, তার পিছু ধাওয়া করে স্যাবর জেট। দু-রকম শব্দে বোঝা যেত প্রথমটি ভারতীয় বিমান আর দ্বিতীয়টি পাকিস্তানের। স্যাবর জেটগুলোর আগমনের শব্দ শুনে আউট অব ইমোশনালি মধ্যরাতেই এইম করে ফায়ার করতে থাকি আমরা। ৪ ডিসেম্বর একাত্তরের এদিনে সকাল ৭টায় ব্রিটিশ নির্মিত দুটি হান্টার দমদম বিমানবন্দর থেকে উড়ে এসে ঢাকায় শত্রুর রাডারের নিচ দিয়ে লো-ফ্লাই করে ঢাকা বিমানবন্দরে আক্রমণ করে ফিরে যায়। এ দুটি হান্টারের পাইলট ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুনির ও স্কোয়াড্রন লিডার কেডি মেহেরা। দ্বিতীয়বার এ হান্টার দুটি একত্রে আক্রমণ করতে আসে এবং বোম্বিং করে ফিরে যাওয়ার সময় কেডি মেহেরা দেখলেন মুনিরের হান্টারটিকে দুটি পাকিস্তানি স্যাবর জেট পেছন থেকে আক্রমণ করছে। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ভারতীয় হান্টারটি বিপদ মোকাবিলা করছে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুনির হান্টারের ককপিট থেকে ওয়্যারলেসে কেডি মেহেরাকে বললেন, পাকিস্তানি স্যাবর জেটগুলোকে গুলি করতে। কেডি মেহেরা পাকিস্তানি বিমান দুটিকে গুলি করে আঘাত হানেন; কিন্তু কেডি মেহেরা দেখলেন তাঁর বিমানের ককপিটের ভেতর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং পেছন দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর বিমান শত্রুর আক্রমণের শিকার হয়েছে। তখন তিনি হান্টারের প্রেসারাইজেমশনের সুইচ বন্ধ করে দিলে ধোঁয়া কেটে যায়। এসব ঘটনা ভূমি থেকে মাত্র ৫০০ ফুট উপরে ঘটেছিল। মেহেরা দেখলেন দুটি স্যাবর জেট তাঁর বিমানের দিকে ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মেহেরা ঘুরপাক খেতে থাকলেন। ফলে পাকিস্তানি বিমান দুটি সহজেই তাঁর বিমানটিকে আঘাত হানতে পারছিল না। মেহেরা তাঁর বিমানের আয়না থেকে দেখলেন পেছন দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে এবং পেছন থেকে ক্রমাগত পাকিস্তানি বিমান দুটি তাঁর বিমানকে লক্ষ্য করে ফায়ার করছে। সে ফায়ারে গ্রামের গোরু-ছাগল মারা যাচ্ছে। হঠাৎ মেহেরার বিমানে আগুন লেগে যায়। এ অবস্থায় বাঁচার একমাত্র উপায় হলো জাম্প করে বের হয়ে যাওয়া। হান্টারের পেছনের কালো ধোঁয়া দেখে যে হান্টার যাচ্ছিল, সেদিকেই দৌড়াতে থাকেন সজীব গ্রুপের সদস্যরা। কিছু দূর দৌড়াতেই দেখলাম হান্টার থেকে পাইলট বেল আউট করে প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। মাটিতে ঝাঁপ দেওয়ার সময় প্যারাশুট খুলল না। মাটিতে পড়ার আগে মাত্র কয়েক ফুট উপরে প্যারাশুট খুলল এবং একটি ধানখেতে পড়ল। এরপর হান্টারটি ঘুরপাক খেতে খেতে ধলেশ্বরী নদীর তীরে হযরতপুর গ্রামের চুনারচর এলাকায় প্রচণ্ড শব্দে বিধ্বস্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিমান থেকে পাইলট লাফিয়ে যেদিকে পড়েছিলেন, সজীব গ্রুপের যোদ্ধারা সেদিকেই ছুটে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম ধানখেতের ভেতর পাইলট রক্তাক্ত অবস্থায় বসে আছেন। গ্রামের লোকজনের হাতে তিনি মই, কাস্তে দেখে পাইলট ভাবলেন এরা বোধহয় রাজাকার-আলবদর। তাই জীবন বাঁচাতে তিনি পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে থাকলেন। এতে গ্রামের লোকজন তাঁকে পাকিস্তানি পাইলট ভেবে মারধর শুরু করবে–এমন সময় আমরা সজীব গ্রুপ অস্ত্রশস্ত্রসহ পৌঁছে যাই পাইলটের কাছে। পাইলটের ডান হাত ভেঙে গেছে এবং কপাল

সবাই অস্ত্র হাতে ঘর ছেড়ে খোলা মাঠে টমেটো, মুলাখেতের ওপর বসে ঢাকার দিকে তাকাচ্ছি। কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছি। আমাদের হাইড আউট থেকে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। আকাশে ছোড়া গোলা থেকে ট্রেসার বুলেটে পুরো আকাশটা যেন ঝলক মারছিল এবং ফুলঝুরির মতো ট্রেসার বুলেটগুলো আকাশের দিকে ছুটছিল

দিয়ে রক্ত ঝরছে। তাঁর কোমরে একটা বড়ো ৩৮ বোরের রিভলবার। পাইলট আমাদের হাতের অস্ত্র দেখেই 'জয় বাংলা' বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'জয় হিন্দ' বলে স্বাগত জানালাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের দেখা হলেই মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় হিন্দ' বলতাম। এর উত্তরে ভারতীয় সৈন্যরা 'জয় বাংলা' বলত। এটা ছিল একটা সাধারণ রেওয়াজ। পাইলটের ড্রেসের বাম দিকে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের মনোগ্রাম এবং ডানদিকে বুকের উপরে তাঁর নাম লেখা ছিল। তিনি একজন পাঞ্জাবি। গ্রামবাসী সবাই সেখানে ভিড় করে। জায়গাটি মোহাম্মদপুরের অদূরে ভাকুর্তা বটতলী হাইমচর গ্রামের কাছে। পাকিস্তানি বিমানগুলো তখনও পাইলটের খোঁজে টহল দিচ্ছে। ফলে আমরা দ্রুত মেহেরাকে নিয়ে পাশেই একটি আখখেতের (গেণ্ডারি) মধ্যে লুকাই। কারণ পাকিস্তানি আর্মির চোখে পড়লে রক্ষা নেই। তারা বিমান থেকে বার্স্ট ফায়ার করে সবাইকে খতম করে ফেলবে। পাইলটের ড্রেসের পকেটে ছিল একটা বড়ো মানচিত্র, বাংলাদেশের পতাকা, মানিব্যাগ, পরিচয়পত্র, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের ছবি, হান্টার বিমানের একটি লাল রঙের ফায়ারিং চাবি। এগুলোর কিছু বিচ্ছু জালালের হাতে এখনো রক্ষিত রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে কেরানীগঞ্জের বটতলী থেকে শাহাবুদ্দিন গ্রুপের ধানমন্ডির সোহেল (লম্বা ও স্মার্ট) এসে পাইলটের ড্রেসটা পরলেন। সোহেল তাঁর দলের কুতুব, পিচ্ছি সোহেল, শেখ শাহজালাল, শাজাহানসহ প্যারাশুট নিয়ে তাঁদের ক্যাম্পে চলে যান। বটতলী থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের দূরত্ব ৪/৫ কিলোমিটার। যে কোনো মুহূর্তে পাকিস্তানি আর্মি হেলিকপ্টারে কমান্ডো বাহিনী নামাতে পারে। অথবা স্পিড বোটে চেপে আর্মিরা পাইলটকে নিয়ে আসতে পারে। তাই আমরা সজীব গ্রুপ লুঙ্গি, শার্ট পরিয়ে মাথায় গামছা প্যাঁচিয়ে গ্রামবাসী সাজাই, যেন তাঁকে দেখে মনে হয় গ্রাম্য কৃষক। এ সময় হঠাৎ গ্রামের লোকজন দৌড়ে পালাতে শুরু করল। কারণ তাঁরা খবর পেয়েছে পাইলটকে নিতে আরিচা রোড হয়ে পাকিস্তানি আর্মিরা এগিয়ে আসছে। এ খবর শুনে কমান্ডার সজীব বললেন, 'সর্বশেষ বুলেট অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কেডি মেহেরাকে নিরাপদ রাখব, পাকিস্তান আর্মিকে প্রতিহত করব। আমারা তাঁকে নিয়ে যেতে দেব না।' শত্রু পাকিস্তানি আর্মিদের বাধা দিতে কমান্ডার সজীবের নির্দেশে বিচ্ছু জালাল, এনাম, শাহনাজ, সাইফুল, নয়ন, খোকন, হেলাল, বাহাউদ্দিন, বারী, রাহাগীর, লুৎফর, খোকা, হানিফ, সরোয়ার, লিটন, মুজাহিদ ও আমি এগিয়ে গেলাম। শত্রু বাহিনীর বাধা হয়ে দাঁড়াল নৌকাবিহীন একটি খাল আর অস্ত্র হাতে সজীব গ্রুপের যোদ্ধারা। পাকিস্তানি স্যাবর জেট দুটি তখনও আমাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে চক্কর দিচ্ছে। যখন মিত্রবাহিনীর বিমান এগিয়ে আসে, তখন ডগ ফাইটে অংশ নেয়। বোঝা গেল কেডি মেহেরাকে উদ্ধারে পাকিস্তানি আর্মিরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তখন বেলা ১১টা বাজে। শত্রু আর্মি থেকে আমাদের সজীব গ্রুপের দূরত্ব এক কিলোমিটার। আমরা সজীব গ্রুপের যোদ্ধারা ধলেশ্বরী নদীর এপার থেকে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে অতি সতর্ক অবস্থায় পাকিস্তানি আর্মি বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ করতে থাকি। সবাই সবার কাছে পরিষ্কার, হানাদার পাকিস্তানি আর্মি ও মুক্তিযোদ্ধা উভয় গ্রুপ এখন মুখোমুখি ও প্রস্তুত। মৃত্যুচিন্তা একবারও দুঃসাহসিক আক্রমণ থেকে আমাদের পিছু হটাতে পারল না। কারণ আমাদের সবার চোখেই তখন যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন। স্বাধীন বাংলার রঙিন স্বপ্নে আমরা সবাই বিভোর। মিত্রবাহিনীর বিমানের সঙ্গে হানাদার বাহিনীর বিমানের ডগ ফাইট তখনও চলছে। পাকিস্তানি আর্মিরাও ফাইটারগুলোকে লক্ষ্য করে অবিরাম গুলি ছুড়ছে। আমরা সজীব গ্রুপের যোদ্ধারাও থেমে থেমে পালটা গুলি চালাচ্ছি আর ভাবছি, এই বুঝি পাকিস্তানি আর্মিরা হেলিকপ্টার, স্পিডবোটে চেপে আমাদের পজিশনের পেছনে পাকিস্তানি কমান্ডো বাহিনীকে নামিয়ে আক্রমণ চালিয়ে পাইলটকে ছিনিয়ে নিতে আসছে। এমন সময় বেলা ১১টার পরে জিনজিরা কালিন্দী গ্রামে বিধ্বস্ত হলো মিত্রবাহিনীর আরেকটি বিমান। বিমানযুদ্ধ ও বার্স্ট ফায়ারে এবং সজীব গ্রুপের শত্রু প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি আর্মিরা পজিশন উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এভাবেই পাইলট যুদ্ধের প্রথম বিজয় ছিনিয়ে নেয় সজীব গ্রুপ। পাইলটকে পাকিস্তানি আর্মিরা নিয়ে যেতে পারেনি বলে গ্রামবাসী জয় বাংলা বলে উৎফুল্ল হয়ে সজীব গ্রুপকে অভিনন্দন জানায়।

এরপর পাইলট কেডি মেহেরাকে ক্যাম্পে নিয়ে আসি। আমাদের ক্যাম্পটি ছিল সাভারের মুশুরীখোলা তুলাতুলি গ্রামের কুদ্দুছ আলীর বাড়িতে। ক্যাম্পে আসার পর মেহেরা ভাঙা হাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেন। দুঃসহ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমাদের বলেন, 'আমাকে তোমরা পাকিস্তানি আর্মির হাতে তুলে দাও, এভাবে আমাকে তোমরা বাঁচাতে পারবে না।' রাতে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পর আমাদের কাছে খবর এলো ভারতীয় বিমানবাহিনী বিধ্বস্ত বিমানের একজন রাজপুত পাইলটকে পাকিস্তানি আর্মিরা কেরানীগঞ্জে ধরেছে। খবরটা কেডি শুনে বললেন, ব্যাড লাক। রাতে গ্রামে কড়াকড়ি সেন্ট্রি ডিউটিতে বসলাম। ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১। বিমানযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অর্থাৎ আজকের এই দিনে জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে সজীব গ্রুপের সদস্য বারীকে ডাক্তারের খোঁজে ঢাকায় পাঠানো হলো। এদিন সকাল পর্যন্ত ঢাকার আকাশে মহড়া দিচ্ছিল দুটি স্যাবর জেট। বেলা ১২/১টায় স্যাবর জেটকে তেজগাঁও বিমানবন্দরের কাছে কালো ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরপাক খেতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর সেই বিমানটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। বোঝা গেল পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর শক্তি শেষ। ঢাকার মুক্ত আকাশে বিজয়ীর বেশে যৌথ বাহিনীর মিগ-২১, হান্টার ও ন্যাট বিমান ও সুখোই-সু-৭ মিত্রবাহিনীর জঙ্গি বিমানগুলো খোলা আকাশে মহড়া দিতে থাকে এবং মেপে মেপে ডিগবাজি খেতে থাকে সেগুলোকে লক্ষ্য করে করে পাকিস্তানি বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো অবিরাম গোলা ছুড়ছিল। বিমানগুলো অনেক উপর দিয়ে ঘুরছিল, রৌদ্রে বিমানগুলো চিকচিক করছিল। বিমানগুলো টার্গেট করে লক্ষ্যবস্তুর উপর বোম্বিং করছিল, ঢাকার আকাশ বিমানবিধ্বংসী গোলার সাদা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তবুও মিত্র বিমানবাহিনীর বিমানগুলো সুযোগ বুঝে ছোঁ মেরে ড্রাইভ দিয়ে একটার পর একটা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আহত পাইলট মেহেরা ভাঙা হাতের ব্যথা সহ্য করে একটা নৌকায় চড়ে বিমানযুদ্ধ দেখেন। আর আমাদের বলেন, "আমাদের বিমানগুলো দুইদিনের ৩৪ ঘণ্টার বিমানযুদ্ধে কয়েক শ বার আক্রমণ চালিয়ে শত শত টন বোম্বিং করে 'এয়ার ইন্টারডিকশন' আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি আর্মির বিমানের শক্তি, যানবাহন অচল করে দিচ্ছে, আমাদের ওয়ার প্ল্যান সাকসেসফুল। খুব তাড়াতাড়ি আমরা বিজয়ী হব। দুপুর ২টায় ঢাকা থেকে ডাক্তার আনতে না পেরে কারফিউর মধ্যে অনেক কষ্টে বারী সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্রকে। তাঁর নাম ইকবাল। ইকবাল শুরু করেন মেহেরার চিকিৎসা, এমন সময় মেহেরাকে উদ্ধার করার জন্য পাকিস্তানি আর্মি ও রাজাকাররা বেলা ৩টায় সাভার হেমায়েতপুরের শ্যামপুর গ্রামে আক্রমণ চালায়। তারা ওই গ্রামে অনেক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। পাইলট উদ্ধারে সার্চ করতে এবং সজীব গ্রুপের ক্যাম্প উড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসছে। তখন আমরা জেলে নৌকায় জেলেদের মতো সাজিয়ে কেডি মেহেরাকে আধা মাইল দূরে ঢাকার চর এলাকায় নিরাপদে রেখে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দল নিয়ে এগিয়ে যাই। আর্মির ভয়ে গ্রামের লোকেরা পালিয়ে যায়। মুহূর্তেই সারা গ্রাম নিঝুমপুরি হয়ে গেল, গ্রামে একজন লোকও থাকল না। শত্রু পাকিস্তানি আর্মি ও রাজাকাররা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তুলাতুলি গ্রামের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে

শত্রু আক্রমণের পথে কমান্ডার সজীব বিচ্ছু জালাল, এনাম, সাইফুল, খোকন, নয়ন, হানিফ, সাজ্জাত, বারী, মুজাহিদ, সরোয়ার, খোকা, হেলাল ও আমি রাহাগীর এক্সপ্লোসিভ, এপি মাইন ও ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে বুবি ট্র্যাপ বসালাম। পাকিস্তানি আর্মি ট্র্যাপে পা দিতেই এগুলো ব্লাস্ট হতে থাকে এবং কেডি মেহেরাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে চলতে থাকে তুমুল গোলাগুলি, এতে পাকিস্তানি আর্মি ও সজীব গ্রুপের যোদ্ধারা হতাহত হয়। পাশের চারুলিয়া গ্রাম থেকেও মোহাম্মদপুর/মিরপুরের বাবর গ্রুপের তাহের, চুন্নু এবং সাভারের ইমু গ্রুপের ছেলেরাও এগিয়ে আসেন এই যুদ্ধে। এই দিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের শত্রু আর্মিরা বলতে থাকে 'হুঁশিয়ার সে অ্যাডভান্স হোনা চাহিয়ে–শালা জয় বাংলা ডিফিন্স ম্যা হ্যায়'। হঠাৎ মুক্ত আকাশ থেকে মিত্রবাহিনীর বিমানগুলো 'ক্লোজ এয়ার সাপোর্ট' (যুদ্ধরত শত্রু বাহিনীর ওপর বিমান অ্যাটাক) পাকিস্তানি আর্মি ও হেমায়েতপুরে দাঁড়িয়ে থাকা সাঁজোয়া গাড়ির ওপরে বোম্বিং করতেই শত্রুর গাড়ি বিধ্বস্ত হতেই পাকিস্তানি আর্মিরা ঘাবড়ে যায়। এই বোম্বিংয়ের ঘটনায় আমাদের সাহস বেড়ে যায়। তখন আমাদের গুলি ছোড়াও বাড়িয়ে দিই। উপরে এবং নিচে পর্যুদস্ত হওয়ায় পাকিস্তানি আর্মি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তখন তারা পজিশন ছেড়ে আরিচা রোড হয়ে মিরপুরের দিকে পালাতে থাকে। সন্ধ্যায় তুলাতুলি গ্রামের কুদ্দুছ আলীর ছোটো ভাই নাজিম একটা রাজাকারকে ধরে এনে তার রাইফেল কেড়ে নিয়ে রাজাকারটাকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করল। এভাবে পাইলট নিয়ে দ্বিতীয় যুদ্ধেও সজীব গ্রুপ বিজয় হলাম।

পরদিন অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ভালো চিকিৎসার জন্য কেডিকে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। সজীব, সরোয়ার ও বিচ্ছু জালাল স্টেনগান, গ্রেনেড নিয়ে ছোটো ছানি নৌকায় কেডিকে নিয়ে আগরতলার পথে রওয়ানা হলেন। গ্রামের লোকজন কেউ টের না পেলেও কেডিকে সেবাযত্নে যারা ছিলেন, সেই কুদ্দুছ আলীর স্ত্রী হাসিনা, মেয়ে জ্যোৎস্না, জামাই হানিফ, ছোটো ভাই নাজিম, চাচাতো ভাই সাজ্জাদ ও সজীব গ্রুপের অনেকের সঙ্গে আমার চোখের পানিকেও সেই মুহূর্তে বাধা দিয়ে রাখতে পারিনি।

তুলাতুলি গ্রামের লোকজনের আদর-যত্ন, সেবা ও ভালোবাসা ছেড়ে কেডি মেহেরার যেতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কলাইতিয়া, সৈয়দপুর, পাড়াগ্রাম, নবাবগঞ্জ হয়ে নৌকাবদল করে শ্রীনগর হয়ে গজারিয়া পৌঁছলাম।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। ওই এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রফিক, তানেশ, ফজলুল হক, আব্দুল খালেক (আলো), সালেহ আহম্মেদ (বেনু) রসুলপুর গ্রামের বাজারের নদীর কিনারে একটি রাইস মিলে ফুলের মালা দিয়ে বিজয়োল্লাসে বিপুল সংবর্ধনা জানালেন। জয় বাংলা-ইন্দিরা মুজিব স্লোগানে মুখরিত হলো মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া থানা এলাকা। এখানের লোকজনও কেডি মেহেরাকে সেবাযত্ন করল আন্তরিকতার সঙ্গে।

৮ ডিসেম্বর ১৯৭১। কেডি মেহেরাকে নিয়ে সজীব, সরোয়ার ও বিচ্ছু জালালসহ গ্রুপটি যখন মেঘনা নদী পার হচ্ছিল, তখন কালীপুর গ্রামের কাছে পাকিস্তানি আর্মির ৩টি বোটের মুখোমুখি হলো। সজীবদের নৌকার মাঝি দুজন পারে তো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল, কমান্ডার সজীব মাঝিকে বললেন, কপালে মৃত্যু থাকলে নদীতে ঝাঁপ দিয়েও বাঁচতে পারবা না। এগিয়ে আসা পাকিস্তানি আর্মি মেশিনগান দিয়ে কালীপুর বাজারের দিকে জয় বাংলা স্লোগানধারী উৎফুল্ল জনতার দিকে গুলি করল। সজীবরা স্টেনগান লোড করলেন, গ্রেনেড হাতে নিল। কেডি মেহেরাকে তাঁর ৩৮ রিভলবার দিয়ে সাদা গেঞ্জি খুলে দিয়ে বললেন, 'ফাইট করে মরব, সারেন্ডার করব না। কেডিকে বললাম, তুমি তো ইন্ডিয়ান, সাদা গেঞ্জিটা সুবিধা বুঝে দেখিয়ে সারেন্ডার করবে।' মেহেরাকে নিয়ে ওরা তখন মোল্লাকান্দি গ্রামের কাছাকাছি, এখান থেকে দাউদকান্দি ৮/৯ কিলোমিটার। পাকিস্তানি আর্মি ৩টি বোট নিয়ে এগিয়ে আসছে, উত্তর-দক্ষিণের গ্রামগুলোয় গুলি করছে। সবাই উত্তেজনায় কাঁপছিল। কেউ কারও চেহারার দিকে তাকাতে পারছিল না। সবাই যেন বোবা হয়ে গেল। একটি আর্মি বোট কেডি মেহেরাকে বহনকারী নৌকা সার্চ করবে ইশারা করতেই দেখা গেল দুটি হান্টার আকাশে ঘুরে ঘুরে নদী ও রাস্তায় আর্মি ক্যাম্পে চলাচলে বোম্বিং করছিল। কেডি মেহেরা তখন উত্তেজিত হয়ে দুটি হান্টার দেখিয়েই চিৎকার করে বললেন, 'দিজ আর মাই বয়েজ' চলে এসেছে। সজীব দেখবে ওরা পাকিস্তানি আর্মির বোট উড়িয়ে দেবে। এ কথা বলতে বলতেই হান্টার বিমান দুটি বোটের উপর বোম্বিং করল। কালীপুর মেঘনা নদীতে বিধ্বস্ত দুটি বোট জ্বলে-পুড়ে ডুবতে থাকল যারা সাঁতার জানল ডুবন্ত বোট দুটি থেকে বাঁচার জন্য সাঁতরিয়ে নদীর পারে বেরুকান্দা গ্রামের দিকে পালাতে থাকল। ডুবে যাওয়া দুটি গানবোট থেকে রক্তে মেঘনা নদীর পানি লাল হয়ে গেল। যে কয়টি শত্রু আর্মি সাঁতরিয়ে নদী পার হলো, তাদেরকেও ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী হত্যা করল। পানির গভীরতা ১০/১২ হাত, ভারী অস্ত্র-গোলাবারুদ পাওয়া যাবে আশায় কমান্ডার সজীব নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডুবন্ত বোটের উপরে। যতবারই ডুব দিল, ততবারই মহিলার চুল, শাড়ির আঁচল সজীবের হাতে প্যাঁচাতে থাকল। সজীব অনুমান করল বোটে পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে কিছু মহিলাও ডুবে মরেছে। বেরু মোল্লাকান্দি গ্রামে সাঁতরিয়ে যেসব পাকিস্তানি আর্মি উঠল, তাদেরকে গ্রামের ক্ষুব্ধ মহিলারা টেনে-হিঁচড়ে, দা-টেঁটা, লাঠি, কুড়াল দিয়ে টুকরো টুকরো করল। জয় বাংলা স্লোগানে গ্রামবাসী খণ্ডিত লাশগুলো নিয়ে জয়ের মাতাল নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠছিল। এসব ঘটনা সব এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটেছিল। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মির চাঁদপুর সেক্টরের কয়েকজন সিনিয়র অফিসার ও সেনা নিহত হন এবং হিলাল-ই-জুরাত পদকে ভূষিত জেনারেল রহিম খান নিজেও আহত হন। পাকিস্তানি পরাজিত সেনাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি 'দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান' নামক বইয়ে এই যুদ্ধের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেন।

ডুবে যাওয়া দুটি গানবোট থেকে রক্তে মেঘনা নদীর পানি লাল হয়ে গেল। যে কয়টি শত্রু আর্মি সাঁতরিয়ে নদী পার হলো, তাদেরকেও ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী হত্যা করল। পানির গভীরতা ১০/১২ হাত, ভারী অস্ত্র-গোলাবারুদ পাওয়া যাবে আশায় কমান্ডার সজীব নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডুবন্ত বোটের উপরে

এভাবে অনেক দুর্যোগের ভেতর সজীব গ্রুপ মেঘনা নদী পার হয়ে ভাটারচর, বদরপুর, রসুলপুর, গজারিয়া, বাতাকান্দি, নগরচর,

আসমানি বাজার, পন্থি, বাখরাবাগ হয়ে চান্দিনায় পৌঁছল। চান্দিনায় নৌকা ছেড়ে সবাই রাস্তায় হাঁটছিল। কেডিকেও আহত অবস্থায় হাঁটতে হচ্ছে। গ্রামবাসী জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন মিত্রবাহিনীর চতুর্থ কোর ডেল্টা সেক্টরের একটি জিপ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেল। কেডি মেহেরা একজন ক্যাপ্টেনকে তাঁর পরিচয় দিলেন এবং আগরতলা পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। মিত্রবাহিনীর ক্যাপ্টেন কেডি মেহেরা ও সজীবদের চান্দিনা মিত্রবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গেল। এখানেই সবাই রাত্রিযাপন করল। সকালে আগরতলা আর্মি হেডকোয়ার্টারে চান্দিনা ক্যাম্প থেকে ওয়্যারলেসে ৯১-বিএসএফ-এর ডিবি ব্রিগেডিয়ার টম পান্ডেকে ঘটনা জানালে টম পান্ডে দুটি হেলিকপ্টার নিয়ে ছুটে আসে চান্দিনায়। কেডি মেহেরা মিত্রবাহিনী অফিসারদের সঙ্গে সজীব এবং তাঁর সঙ্গী সারোয়ার ও বিচ্ছু জালালসহ অন্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। চান্দিনায় অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মিত্রবাহিনী ব্রিগেডিয়ার টম পান্ডে কেডি মেহেরা ও সজীব গ্রুপকে সংবর্ধনা জানাল। ব্রিগেডিয়ার পান্ডে এই অনুষ্ঠানেই সেক্টর-২ গেরিলা বাহিনীর সজীব গ্রুপ কমান্ডার মফিজুর রহমান খানের (সজীব) হাত থেকে বিধ্বস্ত হান্টার বিমানের যুদ্ধাহত পাইলট কেডি মেহেরাকে গ্রহণ করে নিলেন। মেহেরা হেলিকপ্টারে আগরতলা চলে গেলেন।

এখান থেকে মেহেরা সজীব গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। বিদায়ের সময় সজীব এবং তাঁর গেরিলা দলকে কেডি মেহেরা দিল্লিতে তাঁর নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সজীব গ্রুপের সাহসিকতা, বীরত্ব এবং বাংলাদেশের গ্রামের জনতার সেবাযত্ন, ভালোবাসার কথা লিখবেন।

এই যুদ্ধের কারণে কেডি মেহেরা ভারত সরকারের 'গ্যালান্ট্রি' (অ্যাওয়ার্ড) অর্জন করেন। যৌথ বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জেসি মালিক ভারতীয় সেনাবাহিনীর দৈনিক সমাচার পত্রিকায় 'দ্য সেভড এ পাইলট' নামে ঢাকা বিমানযুদ্ধের এই অজানা কাহিনির বীরত্ব তুলে ধরেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্বরূপ (ওয়ার বুথ) সজীব গ্রুপের বিচ্ছু জালালের সেই যুদ্ধের বিধ্বস্ত বিমানের একটি ফায়ারিং চাবি, মেহেরার ছবি, পরিচয়পত্র ও লিখিত চিঠি রেখে দিয়েছেন, যা আজও বারবার একাত্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ফটোসাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

রণাঙ্গনের স্মৃতি

আবদুল হাকিম চৌধুরী

১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা ১২০নং আওয়ামী লীগ অফিসে আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে যাই। সেখানে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আবু ছালেহর সঙ্গে। যিনি পরে ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগে মনোনীত এমএনএ (Member of National Assamble) পদে নির্বাচন করে (সাতকানিয়া-চকরিয়া) বিজয় লাভ করেছিলেন।

তিনি আমাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয়-দফা, ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবি সম্পর্কে ধারণা এবং কিছু বই, লিফলেট ও পোস্টার দিয়েছিলেন। বইগুলো নিজে পড়ে অন্যদের কাছে প্রয়োজনে কার্বন কপি করে সরবরাহ করার কথা বলেছিলেন। প্রথম দেখায় তাঁর কথা আমাকে ভীষণভাবে মনোমুগ্ধ করেছিল। এরপর থেকে তাঁর অন্ধভক্ত হয়ে যাই। পাকিস্তান সরকার শুধু পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বার্থ দেখত এবং পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বার্থবিরোধী কাজ করত– এজন্য এই শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মায়। পাকিস্তান সামরিক সরকার বারবার বাঙালিদের স্বার্থবৈষম্যমূলকভাবে চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সর্বস্তরের বাঙালিকে দাবিয়ে রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের চিত্র বোঝালেন তিনি। এরপর থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করি তাঁর সঙ্গে। সেদিন সেখানে যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এখন তাঁদের অনেকেই বেঁচে নেই। জেলা আওয়ামী লীগের নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, অধ্যাপক রুপেন চৌধুরী, মিঞা আবু মোহাম্মদ ফারুকী, শামশুল হক ফারুকী, সোলতান আহমদ কুসুমপুরী, একেএম আব্দুল মন্নান, ছাত্রনেতা এসএম ইউনুছ, ওসমানুল হক, মাওলানা ছরওয়ার কামালসহ আরও অনেকেই

ছিলেন, যাদের নাম মনে নেই। এভাবে আমার রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ করার আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন থেকে ছাত্রলীগের মূলমন্ত্র 'শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতি'র আদর্শ ধারণ করে নিজেকে গড়ে তুলি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদ এবং তা প্রত্যাহারে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও আওয়ামী লীগ কর্তৃক দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ও সভা-মিছিলে অংশগ্রহণ করি। গণ-আন্দোলনে বিব্রত হয়ে সামরিক আদালত বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে পল্টন ময়দানে গণজমায়েতের আয়োজন করে। ওই সংবর্ধনাসভায় ডাকসুর ভিপি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা তোফায়েল আহমেদ সবার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অবশেষে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালির পরবর্তী স্বাধীনতার বাণী 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা করেন। এরপর ভারতের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হাইকমিশনারের অফিস এবং আগরতলায় ১০ এপ্রিল অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে। তখন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে জীবনবাজি রেখে আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। স্বাধীনতাকামী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করে।

একদিন (দিন-তারিখ মনে নেই) আমি ও আমার এক বন্ধু ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রুপ এফএফ কমান্ডার এমএ গফুরের গ্রুপে অংশগ্রহণ করি। তাঁর গ্রুপ নং-১১৭ (সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম)। ওই গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে শ্যামাচরণ দেবনাথ (কলাউজান), মৃত বজেন্দ্র দেবনাথ (কলাউজান), মৃত মনমোহন দেবনাথ (কলাউজান), দীনবন্ধু দেবনাথ (তেওয়ারী খিল), দিলীপ চন্দ্র (রামপুর, সাতকানিয়া), সুধীর চক্রবর্তী (নলুয়া, সাতকানিয়া), অরুণ চৌধুরী (কালিআইশ, সাতকানিয়া), জাহের আহাম্মদ (মীরসরাই), জামাল উদ্দিন (মীরসরাই), নিজাম উদ্দিন (মীরসরাই), ছিদ্দিক আহাম্মদ (চকরিয়া), আব্দুল হাকিম চৌধুরী (পূর্ব কলাউজান, সাতকানিয়া), নিল রতন দাশগুপ্ত (চরতী, সাতকানিয়া), নূরুল আলম (চরতী, সাতকানিয়া), আহাম্মদ ছফা (চরতী, সাতকানিয়া), রণজিৎ (চরতী, সাতকানিয়া), সিরাজুল ইসলাম (রামপুর, সাতকানিয়া), আরও অনেকের নাম মনে নেই।

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে যেসব এলাকায় অপারেশন, অস্ত্র উদ্ধার ও অভিযান চালানো হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সাতকানিয়া চরতী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান বজল আহাম্মদের বাড়ি থেকে ৬টি রাইফেল উদ্ধার। একই এলাকার এনায়েত আলী তালুকদারের বাড়ি থেকে ৫টি রাইফেল উদ্ধার। বাঁশখালী, আনোয়ারা, সাতকানিয়ার চরতী নিকটবর্তী সাঙ্গু নদীতে ৭টি নৌকা আটক করা হয়। সম্ভবত ১১টি অস্ত্রসহ রাজাকার আটক করা হয়। এ অভিযানে ছিলেন আমাদের গ্রুপ কমান্ডার এমএ গফুর এবং বাঁশখালীর গ্রুপ কমান্ডার শাহ ই জাহান চৌধুরী। উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো শাহ ই জাহান চৌধুরী নিরস্ত্র সহযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করেন। পদুয়া, সাতকানিয়া থেকে আলবদর বাহিনীর নেতা মৌলানা মীর কামাল চৌধুরীকে গ্রেফতারে অংশগ্রহণ করি। দোহাজারী সম্মুখযুদ্ধে সাতকানিয়া চরতী শরীষাঘোনা থেকে আমিলাইশ, নলুয়া হয়ে দোহাজারী তৎকালীন ন্যাপ (মোজাফফর) সাতকানিয়া থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দুল আজাদ চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছি গভীর রাতে। আগে থেকেই পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা সাঙ্গু নদীর দক্ষিণাংশের চরে W অক্ষরে তৈরি করা বাঙ্কারে দুইজন করে সশস্ত্র অবস্থায় ঢুকে পড়ি। দুই দিন দুই রাত নদীর অপর তীরে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলি হয়। এরপর ভারতীয় মিত্রবাহিনী আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তখন অভিযানে বিভিন্ন বাঙ্কার থেকে বেশ ক'জন নারীকে ক্ষতবিক্ষত, বস্ত্রহীন অবস্থায় উদ্ধার করি। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় বাইরে থেকে কাপড় এনে ওই মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করি এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ওইসব বাঙ্কার থেকে বিপুল পরিমাণ দেশি-বিদেশি মদ উদ্ধার করি। বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করি। তারপর দোহাজারী অপারেশনে গ্রুপ কমান্ডার এমএ গফুর, গ্রুপ কমান্ডার জলিল বকসু, গ্রুপ কমান্ডার ননী কর্মকার, গ্রুপ কমান্ডার আনসার এম ফজল করিম সাঙ্গু নদীর উত্তর পাশে গ্রুপ কমান্ডার আবু তাহের খান খসরু খাগরিয়া অংশে বিএলএফ কমান্ডার মনির আহাম্মদ মনির, গ্রুপ কমান্ডার তপন দাশের গ্রুপসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর গফুর গ্রুপ দোহাজারী ওয়াপদা রেস্ট হাউসে অবস্থান নেয়। সেখানে কুখ্যাত রাজাকার কমান্ডার চিঙ্গা ফকিরকে কদিখানায় আটক অবস্থায় রাখা হয়। সেখানে অন্য বন্দিদের অগোচরে সে গলায় রশি লাগিয়ে ফ্যানের সঙ্গে আত্মহত্যা করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসর মোনাফ কোম্পানির ছেলে বাহাদুরকে আটক করা হয়েছিল। সেখান থেকে গফুর গ্রুপ লোহাগাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগরের পরিত্যক্ত বাড়িতে ক্যাম্প করা হয়। সপ্তাহখানেক পরে স্থান পরিবর্তন করে পরিত্যক্ত চুনতি পুলিশ বিটে ক্যাম্প করা হয়। অভিযান চালিয়ে চকরিয়া থানার ইলিশিয়া এলাকা থেকে একজন অধ্যাপিকাকে রাজাকার দ্বারা ধরে নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগে মুসলীম লীগ নেতা মকছুদ মিয়ার বাড়ি তল্লাশি করে কাউকে না পেয়ে ১টি রিভলবার ও ১টি কার্তুজ বন্দুক উদ্ধার করা হয়। এরপর সাতকানিয়া হাইস্কুল মাঠে অস্ত্র জমা দেওয়া হয়। তারপর পটিয়া রাহাত আলী হাইস্কুলে গ্রুপের সব সদস্য মিলিত হন। সেখানে উর্ধ্বতন নেতাদের ঘোষণা–কেউ যদি মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগদান করতে চাইলে করতে পারেন। অন্যথায় নিজ নিজ বাড়ি যেতে পারেন। সেখান থেকে আমি বাড়ি ফিরি। তারপর আবারো লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করি। রাজনৈতিকভাবে ছাত্রলীগ, আওয়ামী যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি। বর্তমানে আমি বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির একজন সদস্য। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সাতকানিয়া থানা কমান্ড অবিভক্ত (থানা-লোহাগাড়া-সাতকানিয়া) কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। সংবাদপত্রজগতে দীর্ঘদিন দৈনিক স্বাধীনতা, আজাদী, পূর্বকোণ, দৈনিক বাংলার বাণীর প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলাম। বর্তমানে দৈনিক জনতা/দ্য নিউ নেশন বান্দরবান জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সাবেক সহসভাপতি ও ভাতাপ্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক

মুক্তির সংগ্রাম ও যুদ্ধে

নুরুল ইসলাম

বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। পার্বত্য বান্দরবানের বর্তমান লামা উপজেলাধীন আজিজনগরে (শিল্প এলাকা) সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। আমি কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ এবং নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি। একাধিকবার মিটিং-মিছিলের আয়োজনসহ মানুষের মাঝে চেতনার সৃষ্টি করি। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান আজিজনগরে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কের পাশে। তিনি কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে এ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক অবস্থায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল আমাদের দেখতে পায়। গাড়ি থেকে নেমে তারা আমাদের প্রহার ও গালাগাল করে। একপর্যায়ে আমরা তাদের কবল থেকে বের হয়ে পড়ি এবং তারাও ফিরে যায়।

২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় এমএনএ আবু সালেহর নেতৃত্বে তৎকালীন সাতকানিয়া থানা আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় করে স্বাধীনতাকামী লোকজনদের সংগঠিত করি। মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তৎকালীন সাতকানিয়া থানার অংশ বর্তমান লোহাগাড়া উপজেলা ও আজিজনগরের মানুষ নেমে আসে রাজপথে। এলাকার প্রায় সব দোকানপাট ও সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা।

অপরদিকে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কের সংযোগস্থল কালুরঘাট ব্রিজের কাছে প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করি। দেশে যখন চারদিকে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছিল, তখন চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল ছিল হানাদারমুক্ত। এ অবস্থায় ১৬ এপ্রিল শুক্রবার দুপুরে কালুরঘাটসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের পটিয়া ও লোহাগাড়া বটতলী মোটর স্টেশনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দুটি যুদ্ধবিমান থেকে অসংখ্য গুলি নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় লোহাগাড়া বটতলীতে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। লোকজন প্রাণের ভয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে যায়। তখন অনেকে আহত হন। লোহাগাড়া বটতলী ও সন্নিহিত এলাকায় অনেক দোকানপাট ও বসতি পুড়ে যায়।

নুরুল ইসলাম

বিমান হামলার পর ওই এলাকা পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে চলে যায়। আত্মগোপনে চলে যায় স্বাধীনতাকামী লোকজন। পাকিস্তানি হানাদাররা হিন্দু সম্প্রদায়সহ অনেক বসতি পুড়ে দেয়। ফলে বহু লোক ভারতে চলে যায়। অনেকের সঙ্গে বহু কষ্টে আমিও ভারতের আসামের দেমাগিরি পৌঁছি। সেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ফিরে আসি পার্বত্য এলাকায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি দল পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ঘাঁটি স্থাপন করে পার্বত্য লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের কেজুপাড়ার প্রাইমারি স্কুলে। ওই ঘাঁটিতে আগ্রহী অনেককে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখান থেকে চট্টগ্রামের বর্তমান লোহাগাড়া উপজেলাসহ বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের সৃষ্ট রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়।

পাকিস্তানি হানাদাররা এলাকা দখলে নেওয়ার পর রাজাকার, আলবদর বাহিনী গঠন করে। এ বাহিনী পাকিস্তানি হানাদারদের সহায়তায় লোহাগাড়া বটতলী মোটর স্টেশনসহ ওই এলাকার কয়েক স্থানে ক্যাম্প করে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে একরাতে লোহাগাড়া বটতলী মোটর স্টেশনে রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ করেন মুক্তিযোদ্ধারা। আক্রমণের একপর্যায়ে রাজাকাররা বাঁচাও-বাঁচাও বলে চিৎকার শুরু করে। এ সময় কয়েকজন রাজাকার গুলিতে প্রাণ হারায়। তখন কেউ কেউ ধরা পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে, আবার কেউ আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ফেলে পালায় রাতের আঁধারে। আমরা (মুক্তিযোদ্ধরা) ফিরে যাই আমাদের ঘাঁটিতে। পরে আরও কয়েক স্থানে রাজাকার ঘাঁটিতে আক্রমণ করা হয়। আক্রমণে সফল হই মুক্তিযোদ্ধারা। এরই মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা পার্বত্য লামার কেজুপাড়া থেকে ঘাঁটি স্থানান্তর করে লোহাগাড়া এলাকার পুটিবিলা উচ্চবিদ্যালয়ে। এখান থেকেও বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুক্তিকামী মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অতি-সন্নিকট বুঝতে পেরে আজিজনগরের আজিজ উদ্দিন ইন্ডাস্ট্রির একদল কর্মকর্তা চট্টগ্রাম শহরের দিকে পালানোর সময় লোহাগাড়া এলাকার চুনতিতে জনতার সাহায্যে আটক হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদানের পরপরই হানাদারমুক্ত হয় এলাকা। পুনরায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো শুরু হয় প্রায় সব দোকানপাট ও সরকারি-বেসরকারি অফিসে। এ সময় সবার মুখে স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'। হানাদারমুক্ত হওয়ায় আনন্দ আর উল্লাস প্রকাশ করে সর্বস্তরের জনতা।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক; সভাপতি, লোহাগাড়া প্রেস ক্লাব, চট্টগ্রাম

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ভারতে গেরিলা প্রশিক্ষণ ও রণাঙ্গনের স্মৃতি

গেরিলা লিডার ড. এস এম শফিকুল ইসলাম কানু

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি, মর্যাদা, সাম্য প্রতিষ্ঠা; সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য, শোষণ, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, নির্যাতন, নিপীড়ন ও প্রভুত্বের অবসান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, মৌলিক চাহিদা পূরণ, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তাই ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানের নরপশু ইয়াহিয়া বাহিনী ঘুমন্ত নরনারী, শিশুদের নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে বাংলার ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, মজুর, মজদুর, কুলি, কামার, যুবক–সর্বস্তরের মানুষের বুকে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের লেলিহান শিখা প্রজ্বালিত হয়েছিল।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বহুধাবিভক্ত বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধতা ও দৃঢ়তা বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছিল। দেশের সর্বত্রই আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনার পাশাপাশি উৎকণ্ঠা। আদৌ বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবেন কি না।

১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে লেখাপড়ার জন্য আবারো রংপুর জেলার বদরগঞ্জ কলেজে ফিরে এলাম। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বপ্নে দেখলাম রক্তের স্রোতধারা বইছে। শিহরিত হলাম। কয়েকদিন পর সিদ্ধান্ত নিয়ে রংপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার গোড়ল ইউনিয়নের ভারত সীমান্তবর্তী মালগাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে ফিরে এলাম। গ্রামীণ জনপদের মানুষ বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও আকাশবাণীর খবর শুনছেন। অবশেষে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, স্বাধীনতার ডাক, সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির

আহ্বান। বাংলার সর্বত্রই উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, আন্দোলন, মিটিং, মিছিল, লাঠিমিছিল, মশালমিছিল, স্লোগান, বক্তব্য-বিবৃতি–সেই সঙ্গে সমানতালে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনাপূর্বক সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পৈশাচিক উন্মাদনায় মেতে উঠল। নিরীহ বাঙালি হানাদারদের রুখতে এবং খতম করার জন্য দেশের সর্বত্রই প্রতিরোধের ব্যূহ সৃষ্টি করল।

ড. এস এম শফিকুল ইসলাম কানু

আমার গ্রামের পাশেই লোহাকুচি সীমান্ত ফাঁড়ি। ফাঁড়িতে হাবিলদারসহ ২ জন অবাঙালি ও ১৫ জন বাঙালি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্য। ২ এপ্রিল গভীর রাতে লোহাকুচি সীমান্ত ফাঁড়ির দুইজন অবাঙালিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই অভিযানে আমার আব্বা অলিউদ্দিন আহমেদ কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সার্বিক সহায়তা দিয়েছিলেন। তিনি আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে এবং ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে কয়েক মাস জেলে অন্তরিন ছিলেন।

৭ এপ্রিল গভীর রাতে রংপুর থেকে নির্বাচিত এমএলএ (জাতীয় পরিষদ সদস্য) এবং রংপুর জেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি এমএ আউয়াল মাস্টার আমাদের বাড়িতে আসেন। রাত্রিযাপনের পরদিন ওনাকে ভারতে আমার আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে এলাম। ইতোমধ্যে লোহাকুচি সীমান্তের বিভিন্ন বাড়িতে লালমনিরহাট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন পরিবার-পরিজনসহ আশ্রয় নেওয়া শুরু করেছেন। অনেকেই আবার ভারতে তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন। সীমান্তের পাশেই পৈতৃক নিবাস, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আসার আশঙ্কা নেই, সেই সুবাদে নির্বিঘ্নে বাবা-মা, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বসবাস করতে পারতাম। কিন্তু তা না করে দেশমাতৃকার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাড়িতে মাকে বললাম, আমাকে কিছু টাকা দাও। ভারতের সিতাই থেকে ঘুরে আসি। মা সরলবিশ্বাসে কিছু টাকা দিলেন। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি শার্ট, লুঙ্গি ও গায়ের চাদর নিয়ে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। আগের দিন এমএলএ আউয়াল সাহেবের কাছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সার্টিফিকেট নিয়েছি। ভারতে অবস্থান ও বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করার জন্য একজন এমএলএ, এমপি কিংবা আওয়ামী লীগের থানা কমিটির সভাপতি-সম্পাদকের স্বাক্ষরিত সুপারিশকৃত সার্টিফিকেট আবশ্যক। সকালে বাড়ি থেকে রওয়ানা দিয়ে বিকাল নাগাদ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সিতাই থানা শহরে পৌঁছলাম। সেখানে একটি সাধারণ বাড়িতে আওয়ামী লীগের কালীগঞ্জ থানা অফিস। আব্বার পরিচয় দিয়ে এবং এমএলএ আউয়াল সাহেবের সার্টিফিকেট দেখিয়ে একটি সনদ নিলাম। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য নিজের নাম লেখলাম। সন্ধ্যা নেমে এলো, অপরিচিত জায়গা, আত্মীয়স্বজন নেই বললেই চলে। এক বাড়িতে থাকার জন্য গেলাম। ইতোমধ্যে হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়েছি। আমার সঙ্গে বড়ো ভাইয়ের ক্লাস ফ্রেন্ড আব্দুল মান্নান সরকার ভাই ও হাসান ভাই রয়েছেন। বাড়ির মালিক বললেন, গোয়াল ঘরে একটু খালি জায়গা আছে, খড় বিছিয়ে থাকতে পারেন। অতঃপর খড়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে গাভির প্রস্রাবের ছিটা শরীর ও কাপড়ে পড়ল; কিন্তু উপায় নেই। ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হলো। সিতাই শহরে নাশতা খেয়ে বাসে দিনহাটা হয়ে কোচবিহারে পৌঁছলাম। সেখান থেকে বিকালে কুচবিহার রাজবাড়ীর পাশেই বাংলাদেশি যুবকদের ক্যাম্প 'সুভাষ পল্লীর' পাটগুদামে পৌঁছলাম। সেখানে পরিচয়পত্র দিলাম। এটি ছিল Youth Reception Camp, যা যুব অভ্যর্থনা ক্যাম্প। এই পাটগুদামের মালিক কুচবিহার জেলার কংগ্রেস নেতা গান্ধী দত্ত। এটি জয় বাংলা যুব ক্যাম্প হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত ছিল। সেখানে বাংলাদেশি যুবকরা অবস্থান করছেন ট্রেনিংয়ে যাওয়ার জন্য। ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বললেন, আপনারা দুপুরে খেয়েছেন? না খেয়ে থাকলে ভাত, ডাল ও সবজি খেতে পারেন। আমাদের তিনজনকে ভাত, ডাল ও সবজি খেতে দেওয়া হলো। কিন্তু বিস্বাদ। তাই অল্পকিছু মুখে দিলাম। এই ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা হলো। বদরগঞ্জ কলেজের ছাত্র হওয়ায় উনি আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন। তিনি বললেন, এখানে থাকা-খাওয়ার অসুবিধা, তাই আজ ট্রেনিংয়ের জন্য চলে যান। আমরা ১৬/১৭ জন যুবককে পাঠাচ্ছি। আপনারা এদের সঙ্গে চলে যান। নতুবা পরবর্তী যুবকদের ব্যাচের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমাদের তিনজনকে ওদের সঙ্গে পাঠান। বিকালে যুব অভ্যর্থনা ক্যাম্প থেকে একজন গাইডের নির্দেশনায় ২০ জন যুবক বাসে কোচবিহার শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত তোরসা নদীর তীরে পৌঁছলাম। সেখান থেকে নৌকায় নদী পার হয়ে ওপারে অনতিদূরে বিএসএফ-এর টাপুরহাট ক্যাম্প। পড়ন্ত বিকালে তোরসা নদী পাড়ি দেওয়ার সময় ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া 'তোরসা নদীর পাড়ে পাড়ে, মোর বন্ধুয়া মাছ মারে রে' গানটি মনে পড়ে গেল। সূর্যের শেষ লাল রশ্মি নদীর পানিতে পড়ায় অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর বিএসএফ টাপুরহাট ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে পৌঁছলাম। মেঠোপথ, ধূলিকণা, কোথাও বা কর্দমাক্ত। চারদিকে কাশবন, কাশবন কেটে মাঝে আমাদের জন্য তাঁবু স্থাপন করে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁবুর ভেতরে মাটির বিছানা। সেখানে রাত্রিযাপন। রাত ১২টার পর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, মেঘের গর্জন, চারিদিকে অন্ধকার, লণ্ঠনের আলোয় কিছু দেখার উপায় নেই। এটি ছিল ট্রানজিট ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে ছিল প্রচুর সাপ, জোঁক ও পোকামাকড়। সেখানে সারি সারিভাবে ৮/১০টি তাঁবু। টাপুরহাট ক্যাম্পে আগে থেকেই ২০/২২ জন যুবক অবস্থান করছেন। তাঁরা আমাদেরকে সাপ, জোঁক ও পোকামাকড়ের ভয় দেখালেন। আমি সাপ ও জোঁক প্রত্যক্ষ করছি। ক্যাম্পের ল্যাট্রিনস্বল্পতা ও সুপেয় পানির অভাব ছিল। তাঁবুতে বর্ষায় পানি ঢুকে যাওয়ায় রাত ১টার পর থেকে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। সকাল হয়ে গেল। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছি।

সকাল ৬টায় বিএসএফ-এর একজন হাবিলদার বাঁশি ফুঁ দিয়ে হিন্দিতে বললেন, আপনারা তিন তিন করে অর্থাৎ তিন লাইনে পরপর তিনজন করে দাঁড়ান। প্যারেড ও পিটি করতে হবে। পেটে ক্ষুধা, রাতে ঘুমাতে পারিনি। ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। মাঠে পানি জমেছে। কাশবনের কাটা মোড়া, তৎসহ কর্দমাক্ত স্থানে লেফ-রাইট করতে অনেকেই বিরক্তিবোধ করলাম। আমরা

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে আমাদের সমস্যা তুলে ধরলাম। কিন্তু বিএসএফ হাবিলদার তা শুনতে নারাজ। একপর্যায়ে সবার অনুরোধে হাবিলদারকে বললাম, আমরা বিএসএফ ক্যাম্পের যে কোনো অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। উনি বললেন, কিছু সময় অপেক্ষা করুন। ইতোমধ্যে সকালে আমাদের নাশতার জন্য ড্রামে ভাত রান্না চলছে। আমাদেরকে ড্রাম থেকে ভাত তুলে প্লেটে করে খাওয়ার জন্য দেওয়া হলো। মাড়জাতীয় ভাত, কোনো তরকারি নেই। সামান্য লবণ, উপরে ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করা পাকা মরিচ। ক্ষুধার তাড়নায় সামান্য কিছু খেলাম।

কিছুক্ষণ পর বিএসএফ ক্যাপ্টেন এসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আমরা রাতে বৃষ্টিবাদল, তাঁবুতে কাদা, রাতে ঘুম হয়নি, সকালে নাশতায় তরকারি ছাড়াই মাড়জাতীয় ভাত–সর্বোপরি বিএসএফ হাবিলদার কর্তৃক লেফ-রাইট করার বিষয় তুলে ধরলাম। ক্যাপ্টেন সাহেব হাবিলদারের বুকে দুটি ঘুসি মেরে বললেন, তোমাকে কে হুকুম দিয়েছে কর্দমাক্ত স্থানে এবং বৃষ্টির মাঝে ওনাদেরকে প্যারেড-পিটি করানোর জন্য। হাবিলদার লজ্জিত হলেন। সবার পক্ষে আমি ক্যাপ্টেনকে এখানকার বিরাজমান সমস্যাগুলো পুনরায় তুলে ধরে আমাদেরকে আজই ট্রেনিং সেন্টার অর্থাৎ মুজিব ক্যাম্পে পাঠানোর অনুরোধ করলাম। উনি বললেন, এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলেই আপনাদের অতিসত্বর মুজিব ক্যাম্পে পাঠানো হবে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর আমাদের জানানো হলো আপনারা প্রস্তুতি নিন। আমরা কনভয় (গাড়ি) রেডি করছি। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি চলছে। আমরা দুপুরে ৪০ জন দুটি গাড়িতে করে মুজিব ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা দিলাম। বৃষ্টির দরুন গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে অন্য একটি চালু গাড়িতে পেছনে দড়ি লাগিয়ে জোরে টান দেওয়ায় গাড়ি স্টার্ট নিল। গাড়ি চলতেই থাকল, গাড়ি দুটি পুরোপুরি ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। সবাই গাড়ির ভেতরে বসা, মাঝেমধ্যে পেছনে ত্রিপল বাতাসে ফাঁক হলে শুধু পেছনের সড়ক দেখা যায়। সামনের সিটে একজন বিএসএফ বাঙালি হাবিলদার এবং অপর গাড়িতে একজন অবাঙালি বিএসএফ সদস্য। ওনারা গাড়িতে ওঠার আগে বলেছেন, আপনারা চুপচাপ বসে থাকবেন, উঁকি মারবেন না। গাড়ি কোথাও থামলে আপনারা নামতে পারবেন না। কারণ, আপনাদের চেহারা যেন বাইরের লোক দেখতে না পারে। প্রস্রাব করার জন্য সড়কের ফাঁকা জায়গায় গাড়ি থামানো হবে। অনেকে ট্রাকের ভেতর ঘুমিয়ে পড়লেন। কেউ বা চোখ বুজে থাকলেন। আর সবার মাঝে আবেগ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ট্রেনিং নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, দেশকে শত্রুমুক্ত করবেন। অনেকেই আবার ক্লান্ত, সেই সঙ্গে উদ্‌বিগ্ন। আঁকাবাঁকা, চড়াই-উতরাই পাহাড়ি পথে গাড়ি চলছে তো চলছেই। মাঝে দু-একটি জায়গায় গাড়ি থেমেছিল। ড্রাইভারসহ ওনারা দুজন চা পান করেছেন। যেহেতু আমাদের নিচে নামা নিষেধ, তাই আমাদের চা পান করা হলো না। ভোর ৪টায় আমাদের বহনকারী কনভয় (গাড়ি) মুজিব ক্যাম্প, যা মুক্তি ক্যাম্প হিসেবে পরিচিত, সেখানকার প্রধান গেটে থামল। প্রয়োজনীয় তল্লাশি ও অনুমতির পর আমাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। স্থানটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি ও ভুটানের সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত। মূলত এটি ভারতের একটি বিশাল সেনানিবাস, যা উঁচু পাহাড়ের সমতল ভূমিতে অবস্থিত। সেনানিবাসের পাশে পাহাড়ের উপরে উঁচু-নিচু জমিতে বিশাল চা বাগান। পাশে ঝরনা প্রবাহিত। পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টিপাত হলে এই ঝরনাটি বিশাল নদীর রূপ নেয়। আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ক্যাম্পের এমআই (মেডিকেল ইন্সপ্যাকশন) রুমে নেওয়া হলো। সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেকে রুমের ভেতর, কেউ বা বারান্দায় অবস্থান করলাম। সকাল সাড়ে ৬টায় শুরু হলো মেডিকেল চেকআপ। শার্ট, প্যান্ট খুলতে হলো, পরনে শুধু জাঙিয়া। এক-এক করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে। একপর্যায়ে জাঙিয়া খুলেও দেখাতে হয়। দুজন বাদে সবাই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। মেডিকেল চেকআপে আমাকে ফার্স্ট করা হলো। অতঃপর শুরু ইঞ্জেকশন দেওয়ার পালা। বড়ো সুচ দিয়ে যেন কোনো পশুকে দাঁড়িয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই আঁতকে উঠলেন, কেউ বা কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, কোনো অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে ইঞ্জেকশন নেব না। আমাকে বসে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। মেডিকেল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি। তাই ডাক্তারের নির্দেশে আমাকে চেয়ারে বসে ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো। যারা মেডিকেলে আনফিট, আমাদেরকে নিয়ে আসা গাড়িতে তাঁদেরকে ফেরত পাঠানো হলো। সকালে দেখতে পেলাম পূর্ব ও পশ্চিমে লম্বা বিশাল সেনানিবাস। আমাদেরকে এমআই রুম থেকে ব্যারাকে নেওয়া হলো। মুজিব ক্যাম্প বা মুক্তি ক্যাম্পে বাংলাদেশের জাতীয় নেতাদের নামে উইংয়ের নাম দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ভাসানী উইং, নজরুল উইং, তাজউদ্দীন উইং, মোশতাক উইং। ভারতীয়দের দেওয়া আলফা, ব্রাভো, ডেল্টা ও চার্লি উইং। আমাদেরকে ব্রাভো উইংয়ে নেওয়া হলো, যা ভাসানী উইং হিসেবে পরিচিত। মেঝে পাকা ইটের দেওয়াল, উপরে টিনের ছাউনি। অনেক বড়ো, একসঙ্গে এক–দেড় শ যুবক তিন সারিতে পাশাপাশি ঘুমাতে পারবেন। আমাদের লঙ্গরখানার পাশে আতপ চাল, দুধ ও চিনির তৈরি ফিরনি খেতে দেওয়া হলো। আমরা সমতলের মানুষ, কুয়া কিংবা টিউবওয়েলের পানি খেতে অভ্যস্ত, হঠাৎ করে পাহাড়ি পানি, পাহাড়ি গন্ধ, চালে পাথর ছিল। তাই সম্পূর্ণ ফিরনি খেতে পারিনি। বাধ্য হয়ে কিছু নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিয়েছি। সেনাবাহিনীর গাড়িতে বড়ো মশকে করে পাহাড়ি ঝরনা থেকে পানি তুলে ক্যাম্পের লঙ্গরখানার পাশেই ড্রামে ভর্তি করে রাখা হতো। বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট দিয়ে ড্রামের পানি পানের উপযোগী করা হতো। তবে ঝরনার পানির গন্ধ ও স্বাদ আলাদা। নাশতা শেষে আমরা ভাসানী উইং অর্থাৎ ব্রাভো উইংয়ে চলে এলাম। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ঝরনায় গিয়ে গোসল করে ফিরলাম। সেখানে ইন ফ্রিজ পদ্ধতিতে আমাদের ফলিং করা হলো। আগামীকাল ট্রেনিং শুরু হবে–এই মর্মে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো। প্রত্যেককে সেলাইবিহীন লুঙ্গি, হাফ প্যান্ট, সেন্ডো গেঞ্জি, গামছা, প্লেট, মগসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হলো। প্রদত্ত সামগ্রী নিয়ে ভাসানী উইংয়ে গেলাম। সামনে লঙ্গরখানা। প্লেট, মগ নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভাত, ডাল, সবজি নিলাম। মাঠে বসে খেতে হবে। তবে কোনো উচ্ছিষ্ট অংশ মাঠে ফেলা যাবে না। আধা সিদ্ধ ডাল হাতের আঙুলের সাহায্যে ভেঙে ভাত খেয়ে নিলাম। ড্রামে রক্ষিত পানি মগে ভর্তি করে নিয়ে পান করলাম। ঝরনার পানিতে প্লেট, মগ পরিষ্কার করে নিজের ব্যারাকে ফিরে এলাম। বিশ্রাম, অর্থাৎ কিছুটা ঘুমিয়ে নিলাম। বিকালে কোনো কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। সন্ধ্যার আগে আবারো প্লেট, মগ হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভাত, ডাল ও ছোটো এক টুকরো মাছ নিয়ে মাঠে বসে খেয়ে নিলাম। যথারীতি ঝরনায় প্লেট-মগ পরিষ্কার করে ব্যারাকে ফিরে এলাম। রাতে আবারো ফলিং ও গণনা। সকালের ট্রেনিংয়ের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হলো। আমরা ব্রাভো উইংয়ে ৩টি প্লাটুনে ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী ছিলাম। ব্রাভো উইংয়ের ট্রেনিং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন একজন অবাঙালি সুবেদার মেজর ও দুইজন প্রশিক্ষক। সেখানে ওনাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে ঝরনার ঠান্ডা পানিতে হাত-মুখ পরিষ্কার করলাম। ল্যাট্রিনের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় ঝরনার কিছুটা দূরে অনেকেই প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ব্যারাকে ফিরে এসে বিছানাপত্র ফোল্ডিং করে তার উপর প্লেট ও প্লেটের উপরে মগ। এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন প্রতিটি মগের হাতল একদিকে থাকে। ব্যতিক্রম করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সকাল ৬টায় শুরু হলো গেরিলা প্রশিক্ষণ, ইনথ্রিজ ফোলিং, রোলকল। কেউ অসুস্থ থাকলে তাঁকে এমআই রুমে পাঠাতে প্লাটুনের ৪০ জন প্রস্তুত। সামনে ওস্তাদ কমান্ড দিচ্ছেন, লেফ-রাইট, একটু হালকা শরীরচর্চা।

মুজিব ক্যাম্প থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে অস্ত্রাগার। প্রথমে মার্চ, ডবল মার্চ সর্বশেষে রানিং। অস্ত্রাগারে পৌঁছে দুটি রাইফেল দু-কাঁধে নিয়ে আবারো আগের পদ্ধতি মোতাবেক ব্যারাকে উপস্থিতি। অনেক সময় নতুন অস্ত্রগুলো পরিষ্কার করে কোতখানায় জমা দিতে হতো। ব্যারাকের বারান্দায় সারিবদ্ধভাবে রাইফেল গুছিয়ে রাখা, রাইফেলের ম্যাগাজিন সামনে থাকতে হবে। ব্যতিক্রম করা যাবে না। অতঃপর প্লেট-মগ নিয়ে লঙ্গরখানার দিকে ডবল মার্চ। লুচি, সবজি নিয়ে মাঠে বসে আহারপূর্বক মগ নিয়ে চায়ের জন্য লাইন। মাঝেমধ্যে বাসি ভাত তেলে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করা হতো। আবার সবজির পরিবর্তে সুজির হালুয়া কিংবা ফিরনি দেওয়া হতো। অনেক সময় নাশতার সঙ্গে চা দিয়ে দিতেন। দারজিলিংয়ের পাতার চা, খুবই সুস্বাদু। কেননা গাভির ঘন দুধ, বেশি করে চিনি ও চা পাতা সংমিশ্রণে চা তৈরি হতো। তবে চা ছাঁকার প্রয়োজন হতো না। মগভর্তি চা পান করতে করতে পাতা মগের তলদেশে চলে যেত। আবারো ফোল্ডিং করা বিছানার উপর প্লেট, মগ সজ্জিতকরণ করে ব্যাকের সামনে ফলিং। কোতখানা (অস্ত্রাগার) থেকে নিয়ে আসা রাইফেল নিয়ে সোজা প্রশিক্ষণ মাঠে। সেখানে রাইফেলের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, খোলনা-জোড়না। অর্থাৎ বিভিন্ন অংশ খুলে আবার জোড়া লাগানো। প্রথমদিকে আমরা সাধারণত মার্কফোর ও থ্রি নট থ্রি রাইফেল ব্যবহার করতাম। একইভাবে অন্যান্য অস্ত্র যেমন এসএমজি, এসএলআর, এলএমজিসহ গ্রেনেড ও টু ইঞ্চি মর্টারের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ম্যাগাজিন খোলা, গুলিভর্তি ম্যাগাজিন লাগানো ও গুলি করার পদ্ধতি শেখানো হতো। মূল উদ্দেশ্য হলো অস্ত্রগুলো রুক আউট অর্থাৎ বিকল হলে তা যেন ঠিক করে চালানো যায়। এতদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন।

ইতোমধ্যে একজন সামরিক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে গেরিলার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের তথ্যাবলি অতি গোপনীয় (Top Secret) ফরমে নেওয়া হয়েছে। তথ্যাবলির মধ্যে ছিল: (১) নাম, (২) পিতার নাম, (৩) স্থায়ী ঠিকানা, (৪) বয়স, (৫) শারীরিক বর্ণনা ও শরীরে শনাক্তকরণ চিহ্ন (দৃশ্যমান দাগ), (৬) পারিবারিক পরিচিতি ও সদস্য সংখ্যা, (৭) কর্মক্ষেত্র। প্রশিক্ষণ শেষে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা (৮, ৯, ১০, ১১) ঘর পূরণ করে থাকেন। এতে প্রশিক্ষণের বিবরণ, প্লাটুন নম্বর, কী ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, এর বিবরণ। প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা ও অর্জিত মান এবং মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে থাকেন। আমার ক্ষেত্রে লেখা হয়েছিল বিভিন্ন অস্ত্র চালানো, গেরিলাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা। মন্তব্যের ঘরে লেখা ছিল (Fit to be a Guerrilla Leader)। Guerrilla Warfare-এর অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে আক্রমণ করে শত্রুবাহিনীকে আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত রাখা। আমার প্লাটুন নম্বর ছিল ২৫, বডি নম্বর ২৫/১। ব্রাভো উইংয়ের ২৫ প্লাটুনের লিডার সিলেকশনের সময় আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল আমাকে পেছন থেকে সামনে নিয়ে এসে লিডার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। সেই থেকে আমি ২৫ প্লাটুনের লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। স্লেটে ২৫/১ লেখা দুহাত দিয়ে বুকের উপর ধরে ছবি তোলা হয়েছিল।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল আমাকে পেছন থেকে সামনে নিয়ে এসে লিডার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। সেই থেকে আমি ২৫ প্লাটুনের লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। স্লেটে ২৫/১ লেখা দুহাত দিয়ে বুকের উপর ধরে ছবি তোলা হয়েছিল।

অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কঠিন শারীরিক কসরত, অবস্টাকল জার্নি, ক্রলিং, সেন্ট্রিসাইলেন্স ইত্যাদি চলত। শরীর যতক্ষণ ঘর্মাক্ত অর্থাৎ ঝরঝর করে ঘাম নির্গত না হতো, ততক্ষণ শারীরিক ব্যায়াম ও কসরতসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ চলত। এর মধ্যে কাঁটাতারের অনুচ্চ খাঁচায় ৫/৬ ফুট নিচে ড্রামের পানিতে রক্ষিত পাথরের কুচির উপর ক্রলিং করতে হতো। অনেক কসরত করে নিচে নামতে হতো। উপরে কাঁটাতার রয়েছে। সোজা হয়ে নামার উপায় নেই। প্রশিক্ষক অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কনুই পরীক্ষা করে দেখবেন। প্রশিক্ষণার্থী ছোটো ছোটো কাটা পাথরে ক্রলিং করেছে কি না। যদি তিনি দেখেন যে কনুইয়ের বিভিন্ন স্থানে কাটা পাথর ঢুকেছে তবে তার জন্য দ্বিতীয়বার এ কোর্স করতে হবে না। কুচি ও কাটা পাথরের উপর ক্রলিং না করলে পুনরায় তাঁকে এ কোর্স করতে হবে।

প্রশিক্ষণের সবচেয়ে কষ্টকর ছিল অবস্টাকল জার্নি অর্থাৎ দুরূহ যাত্রা পর্ব। তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট উপরে স্থাপিত কাঠের উপর দিয়ে হাঁটা, দড়ি দিয়ে উপরে ওঠা, আবার দড়ির জাল অতিক্রম করা, দড়ি ধরে নিচের কর্দমাক্ত জলাধার অতিক্রম করা, ঝুলন্ত টায়ারের মধ্যে লাফ দিয়ে অপরপ্রান্তে চলে যাওয়া। সর্বদাই দৌড়ের মধ্যে থাকা। প্রায় ১২টি অবস্টাকল কোর্স সম্পন্ন করাসহ শারীরিক কসরতের দরুন শরীর দিয়ে ঘাম নির্গত হতে থাকে। এমতাবস্থায় ওস্তাদ বলতেন, কেউ গোসল করতে চাও, সময় মাত্র দুই মিনিট। প্রশিক্ষণ মাঠের পাশেই ঝরনা। যাওয়া-আসা করতে দুই মিনিটের বেশি সময় লাগে। বেঁধে দেওয়া সময়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী ঝরনার পানিতে ডুব দিয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। ফলে কেউ গোসল করতে যেতে পারত না।

এই কোর্স শেষে অন্য মাঠে বিস্ফোরক বিষয়ে প্রশিক্ষণ হতো। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী জয়মন বিস্ফোরক ও মাইনের পরিচিতি, নানামুখী ব্যবহার, কার্যকারিতা, মাইন স্থাপন, ব্রিজ, কালভার্ট, সেতু উড়িয়ে দেওয়া, বিস্ফোরক দিয়ে রেলওয়ে লাইন বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রশিক্ষক জয়মন একটি বড়ো টেবিলের উপর উঠে বিস্ফোরক ও বিভিন্ন ধরনের মাইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি হাতেনাতে দেখাতেন কীভাবে বারুদের মধ্যে ডেটোনেটর ঢুকিয়ে পেছনে করটেক্স লাগিয়ে ফিউজি ম্যাচ জ্বালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীরা ঝিমিয়ে পড়লে উনি বলে উঠতেন আপনারা ক্লান্ত হয়ে গেছেন। প্রশিক্ষণে মনোযোগী হচ্ছেন না। কাজেই দুই-তিন শ গজ দূরে একটি গাছ দেখিয়ে বলতেন গাছ স্পর্শ করে চক্কর দিয়ে আবারো এখানে ফিরে আসেন। এভাবে দুবার চক্কর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি দূর হতো। আবার বিস্ফোরক বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলত।

গেরিলা প্রশিক্ষণের অন্যতম দিক হচ্ছে সর্বদাই দৌড়ের মধ্যে থাকতে হবে। প্রস্রাবখানায় যেতে হলে দৌড়ে যাওয়া, খাওয়ার লাইনে শামিল হওয়ার জন্য দৌড়, গোসল করতে গেলে দৌড়। প্রশিক্ষণ মাঠ থেকে ব্যারাকে ফিরতে হলে সেখানেও দৌড়। প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে দৌড়, দৌড়, দৌড়। দুপুরে গোসল ও খাওয়ার জন্য বিরতি। ঝরনায় গোসল সেরে মগ ও প্লেট নিয়ে লঙ্গরখানার দিকে দৌড়। লাইনে দাঁড়িয়ে ভাত-সবজি কিংবা ডাল গ্রহণ। তবে আধা সিদ্ধ ডাল, নিচে পানি। রাতে বড়ো মাছের ছোটো টুকরো, ভেড়া-ছাগলের মাংস, সামান্য তেল, মরিচ, মসলা, পেঁয়াজ দিয়ে রান্না। খাবার অনুপযোগী। বিস্বাদ, তবুও খেতেই

হবে। মাঝেমধ্যে ফলমূল দেওয়া হতো। একদিকে কঠোর গেরিলা প্রশিক্ষণ, অন্যদিকে খাওয়াদাওয়ার সমস্যা। অনেকের শারীরিক অবস্থা ঠিক যাচ্ছিল না। তবুও প্রশিক্ষণ চলছে তো চলছেই।

প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্রের চানমারিতে ফায়ারিং, পাহাড়ের পাদদেশে টিন দিয়ে তৈরি মানুষের আকৃতি খুঁটি দিয়ে লাগানো হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে গুলি করতে হবে। অর্থাৎ মনুষ্য আকৃতির চোখ, বুক, পেট, কপাল–লক্ষ্যস্থল ভেদ করতে হবে। প্রথমার্ধে প্রত্যেকের জন্য পাঁচটি গুলি বরাদ্দ। মাটিতে ষষ্ঠাঙ্গে শুয়ে তাক করে গুলি চালাতে হবে। অনুরূপভাবে এসএমজি, এলএমজিসহ অন্যান্য অস্ত্রের ফায়ারিং হতো। মাঝেমধ্যে এই ফায়ারিংয়ের জন্য চানমারি যেতে হতো। প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লান্তি অনেকটা কমে এসেছে। আবার শুরু হলো দিনরাত ধরে হাইট আউট কেমোফ্লাক্সপূর্বক অ্যাম্বুশ করে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে হবে। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ চলত। একসময় দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। অর্থাৎ যুদ্ধের মহড়া চলত। এতে ফলস রাউন্ড ফাঁকা গুলি ব্যবহৃত হতো। পাহাড়ি বন, জঙ্গল এলাকায় বৃষ্টিপাত হলে খুবই কষ্ট হতো। সর্বোপরি রাতে প্রশিক্ষকের বাঁশির শব্দে কখনো ক্রলিং, কখনো লুকিয়ে থাকা, কখনো বা শুয়ে পড়তে হতো। সাপ, বানরসহ অন্যান্য প্রাণীর এমনকি হাতিরও ভয় ছিল। অনেক সময় চা বাগানের ভেতরে গভীর নালায় চুপ করে বসে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করতে হতো। রাত ১২টা-১টা পর্যন্ত চলত এ প্রশিক্ষণ। অতঃপর ব্যারাকে এসে ঘুম। পরদিন আবারো ভোরে উঠে যথারীতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।

ইতোমধ্যে আমরা গ্রেনেড ও টু-ইনস মর্টার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছি। সকালে প্রশিক্ষণার্থীদের তাজা থার্টিসিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও টুইনস মর্টার ফায়ারিংয়ের জন্য একটি নদীর তীরে চা বাগানে নিয়ে যাওয়া হতো। মুক্তি ক্যাম্প থেকে দূরত্ব প্রায় ২৫/৩০ কিলোমিটার। সকালের নাশতা পুরি, সবজি খেয়ে দুপুরের খাবার হিসেবে পুরি ও আলু ভাজি সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

ব্রাভো উইংয়ের জন্য চারটি কনভয় মুক্তি ক্যাম্প থেকে বের হয়ে পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পথে চলছে। প্রায় এক মাস পর ক্যাম্প থেকে বাইরে এসে প্রশিক্ষণার্থীদের মনে আনন্দ ও উদ্দীপনা, সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষ পর্যায়ে। বাংলাদেশে এসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার দৃঢ় মনোবৃত্তি।

কনভয় চলার একপর্যায়ে সড়কে স্বল্পবিরতি। আমাদের ব্রাভো উইংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সুবেদার মেজর আমাকে বললেন, আপনি পেছনের গাড়িতে উঠেন। আমি সামনের গাড়িতে যাব। ঠিক আছে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সড়কে গাড়ি চলছে। হঠাৎ বেলা ১১টায় ড্রাইভারের বেখেয়ালের দরুন সামনের গাড়িটি সড়কের পাশের একটি পাকা টেলিফোন ভবনের বুথে ঢুকে গেল। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ির সামনে বসা সুবেদার মেজরের স্কলারবোন ভেঙে গেল। ড্রাইভার মারাত্মক আহত হলেন। সেই সঙ্গে গাড়িতে অবস্থানকারী প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ৫/৭ জন গুরুতর আহত হলেন। অনেকের মাথা ফেটে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পাওয়ার দরুন রক্তাক্ত হলেন। দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই মিলিটারি পুলিশ, আর্মি অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, নার্স এসে উপস্থিত। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে তুলে হাসপাতালে নেওয়া হলো। প্রশিক্ষণরত সাথীদের রক্তাক্ত অবস্থায় রেখে আমরা তৎক্ষণাৎ চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। আমরা বললাম, আজ ফায়ারিং রেঞ্জে যাব না। গাড়িতে অবস্থানকারী অপর সুবেদার মেজর বললেন, আপনারা কেন কান্নাকাটি করছেন। কোনো অবস্থাতেই শিডিউল পরিবর্তন করা যাবে না। উনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় আমার পাশের বাঙ্কারে অবস্থানকারী একজন সৈন্য বোমার আঘাতে মারা গেলেন। আমরা সেখান থেকে পালিয়ে যাইনি। গুলি অব্যাহত রেখেছি। একপর্যায়ে গোলাগুলি বন্ধের পর আমরা মৃত সৈনিককে বাঙ্কার থেকে বের করে ক্যাম্পে নিয়ে এসেছি। কাজেই কোনো কথা নেই। ফায়ারিং রেঞ্জের দিকে চলেন।

আমরা অনেকটা বাধ্য হয়েই গাড়িতে উঠলাম। দুপুর নাগাদ চারটি গাড়ি একটি বিশাল চা বাগানে প্রবেশ করল। সেখান থেকে আমরা হেঁটে প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরে গেলাম। সেখানে পাশে বিশাল নদী, গ্রেনেড থ্রো করার জন্য কোমরসমান ৮/১০টি গর্ত। ওই গর্তে নেমে তাজা থার্টিসিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়তে হয়। তবে এই প্রশিক্ষণটি প্রশিক্ষকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে চলে। কেননা তাজা গ্রেনেড থ্রো করতে ভুল করলে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়ে প্রশিক্ষণার্থী মারাত্মক আহত হয়ে প্রাণনাশের আশঙ্কা। তাই তাজা গ্রেনেডের সেফটিপিন দাঁত দিয়ে খুলে, লিভার চেপে ধরে শারীরিক কসরতের মাধ্যমে দ্রুত নদীতে থ্রো করতে হয়। একেক করে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে গ্রেনেড থ্রো করতে হবে। গ্রেনেড থ্রো শেষে টু ইঞ্চি মর্টার শেল (বোম) নিক্ষেপ। টু ইঞ্চি মর্টারে শেল ভর্তি করে ৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মর্টার ধরে ট্রিগার চাপ দিতে হয়। এতে সেলের পেছনে আঘাত লেগে বোম শোঁ শোঁ শব্দে নদীতে পড়ে যায়। বিস্ফোরিত হয়। অতঃপর সন্ধ্যায় ফেরার পালা। ইতোমধ্যে ক্যাম্প থেকে সঙ্গে নেওয়া দুইটি পুরি, আলু ভাজি দিয়ে দুপুরের খাবার শেষ করেছি। রাতে মুক্তি ক্যাম্পে ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়া। আবারো প্রত্যুষে উঠে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

আমাদের ট্রেনিং চলাকালীন ব্রাভো উইং থেকে স্পেশাল উইংয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে মাটির দুই ফুট উপরে কাঠের পাটাতন। কাঠের বেড়া, উপরে টিন। খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় নিরিবিলি পরিবেশ। পাশেই প্রশস্ত ঝরনা। কয়েকদিন পর আমাদের জানানো হলো আজই আপনাদেরকে আবারো ব্রাভো উইংয়ে ফিরে যেতে হবে। কেননা এখানে কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের থাকতে দিতে হবে। এই কমিশনপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালসহ আরও ৬০ জন। এখানে কমিশনপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ একাডেমি চালু করা হয়েছিল। মুক্তি ক্যাম্পের ব্যারাক ও প্রশিক্ষণ মাঠে অনতিদূরে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি বড়ো রিফ্রেশমেন্ট রুম অর্থাৎ ক্লাব ছিল। সেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা বিকালে বিশেষত রোববার বিকালে অনেকেই মিলিত হতেন। সেখানে পরস্পরের মাঝে ভাব বিনিময়, গল্প, আড্ডা, গানবাজনা, তাস খেলাসহ অন্যান্য খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল। ক্লাব ঘরের বারান্দায় ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও টিক্কা খানের মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে। পাশে ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কীভাবে বাংলার মানুষকে বেয়নেট দিয়ে এবং গুলি করে হত্যা করেছে। হানাদাররা কীভাবে নারীর কাপড় খুলে সম্ভ্রমহানি করছে, তারও মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, যা অবলোকন করে প্রশিক্ষণার্থীদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হতো। প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই এই মূর্তিগুলো দেখে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতেন। আবারো প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করতেন। অনেকে আবার ইয়াহিয়া, ভুট্টো, টিক্কা খানের মূর্তির পাশে থুতু নিক্ষেপ কিংবা পায়ের স্যান্ডেল ছুড়ে দিতেন। আমাদের অনুরোধে মাঝেমধ্যে ক্লাবে রোববার হিন্দি সিনেমা দেখানো হতো।

প্রশিক্ষণের প্রায় শেষ পর্যায়ে একদিন বিকালে ক্লাবের সামনের মাঠে প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধাদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখলেন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানী এবং মুক্তি ক্যাম্পে অফিসার্স ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল। তাঁদের তিনজনের বক্তব্য ছিল অনুপ্রেরণামূলক, উৎসাহব্যঞ্জক। প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধারা শপথ নিলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একজন সদস্যও বেঁচে থাকা পর্যন্ত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত রাখবেন। এ সমাবেশে মুজিব ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার বিপিন চন্দ্র জোশী ও অন্য ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে মুজিব ক্যাম্প কিংবা মুক্তি ক্যাম্পে আমাদের প্রশিক্ষণ শেষ পর্যায়ে। এখন কোন প্লাটুন কোন সেক্টরে যাবে। আমাদের ২৫ প্লাটুনকে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের হীমকুমারীতে দেওয়া হলো। ব্রাভো কোম্পানির দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল সাহেবকে অনুরোধ করলাম আমাদের প্লাটুনকে কোচবিহার কিংবা জলপাইগুড়ি জেলার যে কোনো সীমান্তে দেওয়ার জন্য, উনি রাজি হলেন। ব্রাভো কোম্পানির ২৫ প্লাটুনসহ অন্য একটি প্লাটুনকে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলখুচি সীমান্তে দেওয়া হলো।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মুজিব ক্যাম্পে ৪৫ দিন ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র (হালকা মাঝারি) পরিচালনা, সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট, রেলওয়ে লাইন উড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ বিস্ফোরক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়েছি। সেই সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র চালানোসহ গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল আয়ত্ত করেছি। সর্বোপরি আমাদেরকে অ্যান্টি পারসোনাল মাইন, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন, বুবি ট্রাফ স্থাপন ও বিস্ফোরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। মুক্তি ক্যাম্প থেকে সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়ে ত্রিপলে ঢাকা দুটি কনভয়ে অস্ত্র, গোলাবারুদ, অন্যান্য সরঞ্জাম ও রসদপত্রসহ শীতলখুচির দিকে রওয়ানা দিলাম। যথারীতি দীর্ঘযাত্রার পর শীতলখুচিতে পৌঁছলাম। বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে আমাদের জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদসমূহ অস্ত্রাগারে ও লঙ্গরখানায় জমা দিয়ে তাঁবুতে গিয়ে রাত্রিযাপন করলাম। পরদিন থেকে শুরু হলো রাতের আঁধারে সিংগীমারি ও গেন্দুগুড়ি সীমান্ত অতিক্রম করে হাতীবান্ধায় অবস্থিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ। আমাদের আক্রমণের পদ্ধতি ছিল হিট অ্যান্ড রান। প্রতিরাতেই আমরা আক্রমণ পরিচালনা করে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতাম।

সপ্তাহখানেক পর আমাকে নির্দেশনা দেওয়া হলো, পাকিস্তানি হানাদারের বিরুদ্ধে আক্রমণের পাশাপাশি রাতে কিংবা দিনে শরণার্থীশিবিরগুলোর দেখভাল করতে হবে। তাই দিনে কিংবা রাতে ৮/১০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধার দল শরণার্থীশিবিরে পাহারা দিত

বিভিন্ন রণাঙ্গনের স্মৃতি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলখুচির বিএসএফ-এর ক্যাম্পের পাশে স্থাপিত তাঁবুতে অবস্থান করে ২৫ প্লাটুনের মুক্তিযোদ্ধারা দিনরাত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তের অতিনিকটে ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের বিশাল ক্যাম্প। সপ্তাহখানেক পর আমাকে নির্দেশনা দেওয়া হলো, পাকিস্তানি হানাদারের বিরুদ্ধে আক্রমণের পাশাপাশি রাতে কিংবা দিনে শরণার্থীশিবিরগুলোর দেখভাল করতে হবে। তাই দিনে কিংবা রাতে ৮/১০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধার দল শরণার্থীশিবিরে পাহারা দিত। আমি মাঝেমধ্যে তদারকিতে যেতাম। একদিন আমাদের অপারেশনে ব্যস্ততার দরুন রাতে পাহারা দিতে যাওয়া হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত, ভোরে পাকিস্তানি হানাদারদের পাহারায় কয়েকজন রাজাকার শরণার্থীশিবিরের কাছ থেকে প্রাতঃকৃত্যে যাওয়া দুজনকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে পাহারা জোরদার করায় আমাদের অবস্থানকালীন শরণার্থীশিবিরের আর কেউই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়নি।

একদিন ১০/১২ জন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত দল নিয়ে ফজরের আজানের আগে হাতীবান্ধার গেন্দুগুড়িতে আক্রমণ পরিচালনা করি। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ থাকে না। তাই আমরা গেরিলা অভিযানে অধিক গুলি ব্যয় করতে পারতাম না। তাই গুলি চালানো বন্ধ করে সবাই চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ করে মানুষ-সদৃশ একটি ছায়া দেখলাম। ছায়াটি দ্রুত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসায় লক্ষ করলাম ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মস ফোর্সের (ইপিক্যাপ) পোশাক পরা এক ব্যক্তি। আমার এক সহযোদ্ধা বলল, স্যার গুলি চালাব। আমি বললাম, না। ইতোমধ্যে ইপিক্যাপ সদস্য দুহাত উপরে উঠিয়েছে। তাকে ধরে ফেলা হলো। সে বলল, 'আমার বাড়ি নোয়াখালী জেলায়। ইপিআর সদস্য ছিলাম, এখন ইপিক্যাপে আছি। আমাকে হাতীবান্ধা সীমান্তে নিয়োজিত করা হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আমি হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে থেকে বাঙালিকে হত্যা করতে পারি না। তাই সুযোগ খুঁজছিলাম পালিয়ে আসার জন্য। আজ সুযোগ পেয়েছি, তাই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। তাকে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় বিএসএফ কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করলাম।

রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে ৬নং সেক্টর, যা বর্তমান লালমনিরহাট জেলার চির মুক্তাঞ্চল পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী হাশর উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সেক্টর কমান্ডার ছিলেন বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার। পরবর্তী সময়ে তিনি বিমানবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন এবং বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। এই সেক্টরে গৌরবদীপ্ত ইতিহাস রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন এই সেক্টরে পরিদর্শনে এসেছিলেন মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবু হেনা কামরুজ্জামান। উভয়েই সম্মুখ রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙ্কারে বাঙ্কারে গিয়ে তাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন আগস্টে পাকিস্তান রেডিয়ো, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় প্রচার করা হচ্ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে কতিপয় দুষ্কৃতকারী গোলযোগ সৃষ্টি করছে। পাকিস্তান বাহিনী তাদের প্রতিহত করে হটিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তখন মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিহত করে চলছেন। এই সেক্টরে দেশি-বিদেশি অনেক সাংবাদিক এসেছিলেন। তাঁরা পাটগ্রামে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের সংবাদ নিয়েছেন এবং তা প্রচার ও প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্রিটেনের শ্রমিক দলের এমপি ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ তাঁর ক্যামেরায় মুক্তাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ৬নং সেক্টরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের ভিডিয়ো ধারণ করেন। তা ছাড়াও তিনি পাটগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন অফিস-আদালতের ভিডিয়োচিত্র ধারণ করেন। তিনি যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এসব ভিডিয়োচিত্র প্রথমে লন্ডন এবং পরবর্তী সময়ে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলোয় পাঠিয়েছিলেন। পাটগ্রাম থানার বাউরা সাব-সেক্টরের ভিডিয়ো প্রদর্শনের সময় উচ্চারণ করেছিলেন, 'You see this is Patgram. This the Territory of Bangladesh. The Elected Leader have formed their own goverment. On the other hand, the Freedom Fighters are Fighting like anything against the brutal forces of Pakistan. The whole world should support this war of liberation.' এই ভিডিয়োচিত্র প্রদর্শনের পর আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে পাকিস্তানের মিথ্যা

প্রচারণা বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ১১টি সেক্টরের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হলেও শুধু ৬নং সেক্টর সম্পূর্ণ মুক্তাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়েছিল। তাই তো মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্ত লালমনিরহাট জেলার ৬নং সেক্টর। যুদ্ধকালীন বর্তমান লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলা রংপুর সদরের একটি থানা ছিল।

সেক্টরের অন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর নওয়াজেশ, ক্যাপ্টেন দেলওয়ার, ক্যাপ্টেন মতিয়ার, ক্যাপ্টেন ইয়াজদানী। যুদ্ধকালীন একদিন বিকালে মেজর নওয়াজেশের নেতৃত্বে একদল সৈন্য আমাদের শীতলখুচি ক্যাম্পে এসে বলল, সন্ধ্যায় পাকিস্তানিদের শক্ত ঘাঁটি হাতীবান্ধায় আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। মুক্তিযোদ্ধারা সামনে থাকবে আমরা পেছন থেকে সিক্স ইন মর্টার আর্টিলারি সাপোর্ট দেব। সেই সন্ধ্যায় হানাদারদের সঙ্গে উভয়পক্ষের তুমুল লড়াই হয়েছিল। হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। গেরিলাযুদ্ধের কৌশল হচ্ছে আক্রমণ কর, দ্রুত স্থান পরিত্যাগ কর।

৬নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন মুক্তি ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার বিপিন চন্দ্র জোশী (বিসি জোশী)। তিনি আমাদের শীতলখুচি ক্যাম্পে এলেন। তাঁকে অনুরোধ জানালে তিনি আমাদের দায়িত্বে নিয়োজিত ভারতীয় মেজর আরকে বালিকে নির্দেশ দিলেন অতিসত্বর আমাকেসহ কয়েকজনকে বাংলাদেশে পাঠাতে। এলএমজি, এসএলআর, এসএমজি, রাইফেল, গোলাবারুদসহ ভারত থেকে সাতজনকে নিয়ে বাংলাদেশের দই খাওয়া ক্যাম্পে পৌঁছলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল হাতীবান্ধা থানার দই খাওয়া সীমান্ত ফাঁড়ির পাশে একটি পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়িতে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অবস্থান করলাম। সেখান থেকে আক্রমণ পরিচালনা করা হতো। ইতোমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ২৭ প্লাটুন সেকেন্ড ইন কমান্ডার শফিকুল ইসলাম শহিদ হয়েছেন। সম্মুখযুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতে নেওয়া ছিল খুবই কষ্টকর। আহত মুক্তিযোদ্ধার রক্তে বহনকারী মুক্তিযোদ্ধারা রক্তস্নাত হতেন। কেউ বেঁচে থাকতেন। কেউবা চিকিৎসার আগেই মারা যেতেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। তাদেরকে বাংলাদেশের পরিত্যক্ত গোয়াল ঘরে খড় বিছিয়ে রাত্রিযাপন করতে হতো। যে রেশন কিংবা রেশন মানি দেওয়া হতো, তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম। মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ে ভালো বস্ত্র এবং পরনে স্যান্ডেল ছিল না। লুঙ্গি, গামছা, শার্ট, গেঞ্জিই ছিল তাঁদের বস্ত্র। তাঁরা দুর্বিষহ জীবনযাপন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

তৎকালীন রংপুর জেলার সদর মহকুমার কালীগঞ্জ, আদিতমারী, হাতীবান্ধা থানা এবং কুড়িগ্রাম মহকুমার লালমনিরহাট থানায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নির্যাতন, নিপীড়ন করা হয়েছিল। এখানে অনেক গণকবর রয়েছে।

১৯৭১ সালের ১ রমজান হাতীবান্ধা উপজেলার চৌকিশাল গ্রামের ক্যাম্প থেকে কমান্ডার আশরাফুলের নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি দল হাতীবান্ধার ভবানীপুর গ্রামে অভিযান চালায়। সেখানে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে থাকেন। এমতাবস্থায় কালীগঞ্জ উপজেলার মদাতি গ্রামের শহিদ হাবিবুর রহমান ও কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার শহিদ খয়বর রহমান প্রাণ রক্ষার্থে একটি পুকুরে নেমে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছিল। ভবানীপুর গ্রামের স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরের সদস্যরা প্রথমে রাজাকারদের এবং পরে হানাদার বাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধা দুজনের অবস্থান জানায়। সন্ধ্যার একটু আগে পাকিস্তান সৈন্য ও রাজাকাররা দুজনকে অস্ত্রসহ পুকুর থেকে তুলে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে। রশি দিয়ে তাঁদের লাশ গাড়ির পেছনে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নেওয়া হয়। পরের দিন হাতীবান্ধা কলেজ মাঠে এই দুজনের লাশের উপর দিয়ে আর্মির গাড়ি চালিয়ে উল্লাস করেছিল। পরে শহিদ হাবিবুর রহমান ও শহিদ খয়বরের থেঁতলে যাওয়া লাশ ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশের একটি পুরোনো কুয়ায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এখানে শহিদ হাবিবুর রহমান ও খয়বরের মাজার তৈরি হয়।

যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধারা লালমনিরহাট-বুড়িমারী রেললাইনের ভোটমারী ও হাতীবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানের লাইন বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া মাইন স্থাপন ও বিস্ফোরক দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের চলাচলের পথের ব্রিজ, কালভার্ট, সেতু ধ্বংস করেছিল।

বাংলার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ করা ছিল খুবই দুরূহ ব্যাপার। ১৯৭১ সালে ১/ডি কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন নৌবাহিনীর সদস্য মাহাতাব উদ্দিন সরকার (বীরপ্রতীক)। আমি ছিলাম কোম্পানি সেকেন্ড ইন কমান্ড। কোম্পানি কমান্ডারের ভাই জানালেন, নীলফামারী জেলার আলম বিদিতর ইউনিয়নে অবস্থিত ক্যাম্পের কমান্ডারসহ ১১ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করবে। কোম্পানি কমান্ডারের নেতৃত্বে আমরা ক্যাম্প থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ১৫ সদস্যের একটি দল বের হয়ে তিস্তা নদী পাড়ি দিয়ে ভোরের কিছুক্ষণ আগে রাজাকার ক্যাম্পের পাশে পৌঁছলাম। নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি–এমন সময় কোম্পানি কমান্ডারের বড়ো ভাই ওপার থেকে বললেন, তোমরা থাম। আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। উনি বললেন, তোমাদের গভীর রাতে আসতে বলেছি। এখন ভোর হয়েছে। রাজাকারদের সবাই জেগে উঠেছে। কাজেই তোমরা এপারের যে কোনো বাড়িতে আশ্রয় নাও।

আমরা এক বৃদ্ধের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি অতি দ্রুততার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, সন্তান, বউমা, নাতি-নাতনিদের অন্য বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমরা ওনার বাড়ির বিভিন্ন ঘরে, ধানের গোলার নিচে, আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছি। কেননা পাশে রংপুর ও সৈয়দপুর সেনা-নিবাস। সেখানে খবর গেলে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু। কারণ, আমাদের কাছে যে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রয়েছে, তা দিয়ে এক ঘণ্টাও যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। এছাড়া সাপোর্টিং ও কভারিং পার্টি নেই। আমরা সবাই দোয়া পড়ছি, আল্লাহকে স্মরণ করছি। দুপুরবেলা সামান্য মুড়ি ও পানি খেয়েছি। ক্রমেই বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। আমরা সৃষ্টিকর্তার কৃপায় প্রাণে রক্ষা পেতে যাচ্ছি। কেননা সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সন্ধ্যা নেমে এলে বৃদ্ধের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিস্তা নদীর তীরে একটি বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করলাম। রাতে আবারো তিস্তা নদী পাড়ি দিয়ে আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছলাম।

সেই বৃদ্ধ যদি আশ্রয় না দিতেন অথবা কোনো কারণে যদি রাজাকার ক্যাম্পে কিংবা রংপুর সেনানিবাসে সংবাদ দিতেন, তবে আমাদের সবার মৃত্যু নিশ্চিত। মুক্তিযুদ্ধকালীন আমরা স্বাধীনতাকামী মানুষের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি। খাদ্য, আশ্রয় ও পথের নির্দেশনা পেয়েছি।

দেশ হানাদারমুক্ত হওয়ার পর আবারো কলেজে ফিরে গেছি। অবশেষে দেশমাতৃকার সেবার জন্য সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে আমি দৈনিক ইত্তেফাক, নিউনেশন ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে লালমনিরহাট জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। আমার সম্পাদনায় ২৯ বছর ধরে লালমনিরহাট বার্তা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখক: গেরিলা লিডার; সম্পাদক, লালমনিরহাট বার্তা

একতার রিপোর্টার হিসেবে

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

কাভার করতে গিয়েছিলাম

— খন্দকার মুনীরুজ্জামান

মুক্তিযোদ্ধা মুনীরুজ্জামান। ছিলেন দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। মহামারি করোনায় সদ্যপ্রয়াত। মৃত্যুর দুমাস আগে এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধদিনের স্মৃতি বলতে গিয়ে নিজের কথা বলার চেয়ে বঙ্গবন্ধুর কথাই বলেছেন বেশি। খুব সংক্ষিপ্ত আকারেই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন আরেক দিন বিস্তারিত বলবেন। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা, সেই সুযোগটি আর হয়ে ওঠেনি। নিরীক্ষা'র পাঠকদের জন্য এই সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন– **বনশ্রী ডলি**

প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধের সময়টায় উত্তাল রাজনৈতিক যুগে আপনি রাজনীতি করেছেন, পাশাপাশি সাংবাদিকতাও। মুক্তিযুদ্ধে গেছেন–সেই দিনগুলোর কথা জানতে চাই...

মুনীরুজ্জামানঃ সে বছর (১৯৭১) আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের এমএ শেষ বর্ষের ছাত্র। তখন সাপ্তাহিক একতা পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে কাজ করি। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলাম। একটু আগের কথা বলি–আমাদের তারুণ্য ও যুবক বয়সের পুরোটা সময়ই বিভিন্ন অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে। বিশেষ করে এর শুরুটা হয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যদিও তখন ছোটো ছিলাম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাঙালির মোহভঙ্গ হতে থাকে। আমার শৈশবে অনেককে বলতে শুনেছি, মুসলমান বাঙালির জন্য এ কেমন পাকিস্তান আনলাম, কেন্দ্র সরকার তো পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মানুষই মনে করে না। এই বোধোদয় একটু একটু করে বাঙালিকে দেশ নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে। তাই মাস, বছর আর দশকজুড়ে বাঙালি ছাত্ররা

নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের যুক্ত করেছে। গড়ে উঠেছে ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, সরকার গঠন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ছেষট্টিতে লাহোর সম্মেলন, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা, এরপর ১১ দফার দাবিতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন। এই দুই দশকেই আমাদের প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে উত্তাল ও অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। এই দীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চল ছিল রাজনৈতিকভাবে অস্থির আর হিসাবনিকাশের রাজনীতি। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্ররাও রাজনীতিতে জড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের সময়গুলোতেও ছিল আমার জীবন গুরুত্বপূর্ণ ও স্মৃতিময়।

খন্দকার মুনীরুজ্জামান

প্রশ্নঃ ৭ মার্চে সেসময়ের রমনা রেসকোর্স ময়দানে সাংবাদিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কখন যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন? আপনার যুদ্ধদিনের স্মৃতি...

মুনীরুজ্জামানঃ তখন সাপ্তাহিক একতার রিপোর্টার হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রোগ্রাম কাভার করতে গিয়েছিলাম। যে স্মৃতি অনন্য ও ঐতিহাসিক। ৭ মার্চ বেলা ২টা বাজার বেশ আগেই রেসকোর্সে মাঠের এক কোনায় দাঁড়ালাম, কাছেই ছিলেন সাংবাদিক বন্ধু মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জু, মুজিবর মিজান। সেদিনের ঢাকা ছিল উত্তাল, রাস্তায় নেমে এসেছেন সব পেশার মানুষ। রেসকোর্স মাঠের অবস্থা বর্ণনা করা কঠিন। সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের কয়েকটা ডায়ালগ মনে পড়ছে, 'মানু আসতিছে বানের লাহান, ('বান' মানে বন্যা) মানু আসতে আছে গিরাম থিকা...মানু আসতে আছে অমুক জিলা থিকা...।' এই যে বর্ণনা, চারদিক থেকে মানুষ আসছে। সেটা যদি কেউ চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটা ভাবে, তাহলে বুঝতে পারবে সেদিন কেমন জনসমাগম হয়েছিল। রিকশাওয়ালা, ছাত্র-শ্রমিক এসেছে, লগি-বৈঠা নিয়ে মানুষ, সিভিল ড্রেসে পুলিশও এসেছে; ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, কালো কোট পরে উকিল, প্রশাসনের কর্মকর্তারাও এসেছে, তাদের অনেককে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। ৭ মার্চের ভাষণ শুনতে সব পেশার মানুষ, নারী-পুরুষ এমনই বানের মতো মানুষ সবদিক থেকে এসে জড়ো হয়েছে রেসকোর্স মাঠে এবং আশপাশে। একদিকে রাজনৈতিক কর্মী, অন্যদিকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে সেদিন মাঠে ছিলাম। বঙ্গবন্ধু কিছুটা দেরিতে এলেন, প্রায় ২৩ মিনিটের ভাষণ দিলেন। ভাষণের প্রতিটি লাইন নিয়ে ১০ পৃষ্ঠা করে লেখা যায়। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা দিয়েছেন। এটা যদি কেউ উপলব্ধি করতে না পারে, তাহলে সে বাংলাদেশ চেনেনি, বঙ্গবন্ধুকে চিনতে পারেনি, মুক্তিযুদ্ধকে জানেনি–কিছুই জানেনি, কিছুই চেনেনি। বাংলাদেশের মানুষের সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে সংগ্রাম সম্পর্কেও জানে না। কারণ ৭ মার্চের ভাষণে বাংলাদেশ কেমন, ভবিষ্যতে কীভাবে পরিচালিত হবে–এর সম্পূর্ণ রূপকল্প তিনি সেদিন দিয়েছিলেন তাঁর ভাষণে। আমরা যারা রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম, তাঁরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও করণীয় বুঝেছিল সেদিন ভাষণ শুনে। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণটি অনন্য সম্পদ, যা আজ ইতিহাস ও বাঙালির অহংকার। এই ভাষণের আরেকটি বড়ো দিক হলো, ভাষণের আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'এই বাংলায় বাঙালি, নন-বাঙালি, হিন্দু-মুসলিম সবাই আমাদের ভাই।' তার মানে–এই বাংলা হবে একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। বাংলাদেশ, এখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদ থাকবে না। সুতরাং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কেমন হবে, তা তিনি পরিষ্কার বলে গেছেন এবং সেইভাবে দেশ পরিচালিত হবে, তা তিনি স্পষ্ট করেছেন সবার কাছে। একটা ভাষণে গোটা জাতির অতীত ইতিহাস, বর্তমান করণীয়, ভবিষ্যৎ রূপরেখার চিত্র পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাঁর ভাষণে রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য-ব্যবসা, সংস্কৃতি, দর্শন, আকাঙ্ক্ষা–সবই আছে। এসব যদি ব্যাখ্যা করা না যায়, তাহলে বোঝা যাবে না তিনি কী চেয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষা ও দূরদৃষ্টি কতটা বিস্তৃত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চের ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভাবতে পারিনি তিনি এমন ভাষণ দেবেন। তবে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দেখে বুঝতে পারছিলাম একটা যুদ্ধ হয়তো হবে। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য গোপনে আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিল আমাদের। একজন রাজনৈতিক কর্মী হওয়ায় মানসিকভাবে তৈরিও হচ্ছিলাম। ২৫ মার্চ পাকিস্তান আর্মি পূর্ব বাংলাকে আক্রমণ করে, গণহত্যা চালায়। ২৬ মার্চ থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে কার্যত গ্রহণ করতে শুরু করলাম সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে। এর আগে ৩ মার্চ থেকেই একরকম বঙ্গবন্ধুর শাসনে দেশ চলছিল বলা যায়। কারণ তিনি তো নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হওয়া দলের প্রধান নেতা, তিনি ক্ষমতা পেয়েছেন জনগণের রায়ে। পাকিস্তান সরকার যদি সেদিন স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষমতা হস্তান্তর করত, তাহলে তো বঙ্গবন্ধুর শাসনই বহাল থাকত।

১৯৭০ সালেই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। সেই বাহিনীতে আমিও ছিলাম। এপ্রিলে ঢাকা ছেড়ে আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধা ট্রানজিট ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিই। আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পটি ছিল আগরতলার বরদেয়ালি স্কুলে। মুক্তিযুদ্ধের ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের অধীনে যুদ্ধ করেছি। আমার সহযোদ্ধাদের কয়েকজনের কথা মনে পড়ছে, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, তখনকার ডাকসু ভিপি মাহবুব জামান, আরও ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম (কমরেড)। যুদ্ধদিনের অসংখ্য স্মৃতি, অনেক লম্বা, বলতে গেলে বহু সময় দরকার। কত মানুষ যে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কত ঘটনা আছে–কোনটা বলব। একদিনের ঘটনা বলি, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগরতলা থেকে কয়েকবারই আমি দেশে এসেছি। একবার ফিরে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে ছিলেন চার যুবক। তারা যুদ্ধে যাবেন, বয়সে তখন তরুণ যুবক; তারা হলেন–জামিল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক), এমএম আকাশ ও মফিদুল হকের ছোটো ভাই মঞ্জুরুল হক (আমেরিকা প্রবাসী)। ওদের নিয়ে কুমিল্লা হয়ে আগরতলা সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামের পথে হাঁটছি। একটু দূরেই নদী, পার হয়ে আগরতলায় পৌঁছব। যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটছি, হঠাৎ দেখি কিছুটা দূরে মধ্য বয়সি এক কৃষক লালগামছা উড়িয়ে আমাদের থামার জন্য বলছেন। কাছে এসে যা বললেন তার অর্থ হলো, 'আপনারা আর সামনে যাবেন না, সামনের সড়ক দিয়ে এখনই পাকিস্তানি মিলিটারির গাড়ি যাবে। প্রতিদিনই এমন করে কয়েকবার এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করে। ওদের আসার সময় হয়েছে। দেখলেই কিছু না বলে গুলি করে মেরে ফেলবে। আপনারা আমার বাড়ি চলেন।' আমাদের বেশভূষা আর বয়স সবকিছু মিলিয়ে চিনতে পেরেছিলেন তিনি, তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন আমাদের।

আমরা কিছুটা চিন্তিতও হলাম, ধরিয়ে দেবে না তো? না গিয়েও উপায় নেই! কিছুটা সময় বিশ্রাম নিলাম, মুড়ি ও পানি দিয়েছে খেতে। এমন সময় শোনা গেল অদূরেই রাস্তা দিয়ে গড়গড় করে পাকিস্তানি আর্মির গাড়ির শব্দ। পুরো গ্রামে তখন কোনো সাড়াশব্দ নেই। নিস্তব্ধ কিছুটা সময় কাটল আমাদের। ওদের গাড়ি এলাকাটা পার হওয়ামাত্রই কৃষক ভাইটি আমাদের এগিয়ে দিলেন, পথের নিশানা দিয়ে বললেন, 'কোনোদিকে তাকাবেন না, ওদের গাড়ি ফিরে আসার আগেই নদী পার হয়ে চলে যান।'

আরেকদিনের ঘটনা, আগরতলা ক্যাম্পে এক স্কুলপড়ুয়া ছাত্র আসে। সে মুক্তিযুদ্ধ করবে, ট্রেনিং নেবে। কিন্তু বয়স কম বলে তাকে তো অস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া যাবে না। তিনদিন ধরে কেঁদেছিল সে, কেন তাকে নেওয়া হবে না। সাধারণ মানুষের এমনই ছিল দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকুতি। তাছাড়া আমার চেনাজানা অনেক নারী বঙ্গবন্ধুর জন্য রোজা রাখতেন আর নামাজ পড়ে কাঁদতেন যেন তিনি বেঁচে থাকেন, ফিরে আসেন সুস্থভাবে। মুক্তিযোদ্ধারা যেন নিরাপদে চলাচল করতে পারে, শত্রুদের পরাস্ত করতে পারে, জয়ী হয়, কতভাবে, বিচিত্র উপায়ে আমাদের সহায় হয়েছে আর প্রেরণা দিয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের আগেই অক্টোবরে দেশে ফিরেছি। তখনও যুদ্ধ চলছে, আরও তুমুলভাবে তবে কৌশলে।

প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়টি কীভাবে দেখেন...

মুনীরুজ্জামান: এককথায় বললে, বাঙালি জাতির স্বপ্নের যোগফল হলো 'বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সমার্থক সব অর্থেই। তিনি এমন একজন রাজনৈতিক ও মানবিক স্বপ্নদ্রষ্টা বাঙালি নেতা, যিনি পুরো জাতিকে মানসিকভাবে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যা পৃথিবীর আর কেউ পারেননি। তাঁর আগে অনেক নেতাই এসেছেন এবং ছিলেন, তাঁরা বাঙালিকে জাতিরাষ্ট্র গঠনে স্বপ্ন দেখাতে পারেননি। তিনি সারাজীবন একজন দূরদর্শী অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করেছেন। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে জেলজুলুম সহ্য করেছেন। আওয়ামী লীগের কর্মী, নেতা ও পরে বঙ্গবন্ধু হিসেবে মানুষের আস্থা ও ভরসার প্রতীক হলেন। একের পর এক রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে ধাপে ধাপে গোটা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে নিয়ে গেছেন। অন্য কোনো নেতা যা পারেননি। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করতে ঘর ছেড়েছিলাম, তাঁদের কাছে সেসময় 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানটাই ছিল মূলমন্ত্র। মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি ও প্রেরণা ছিল 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান। এই স্লোগানটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের রণ-হুংকার। 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' হুংকারে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। বঙ্গবন্ধুর নামেই তো মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। নয় মাস তিনি ছিলেন না, তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁর এই অবস্থান হঠাৎ করে তৈরি হয়নি বাঙালির কাছে, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন বঙ্গবন্ধু নিজে। তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন অনেক আগে থেকেই। দুই বাংলা আলাদা হওয়ার পর প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন পাকিস্তান শাসনে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের কখনো সুখ-সমৃদ্ধি আর মর্যাদা অর্জন হবে না, ন্যায্য অধিকার পাবে না। তাই তিনি বলেছিলেন, 'ওদের সাথে ঘর করা যাবে না।'

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এটা ঐতিহাসিকভাবেই বিভিন্ন বইয়ে লেখা আছে, তা-ও বলা দরকার। মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আগের আন্দোলন বিষয়ে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক কারণে তখনকার বামপন্থি নেতাদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ ও আলোচনা করেছেন। বামপন্থি দলের নেতাদের সঙ্গে একাধিকবার গোপনে বৈঠক করেছেন। একটা বৈঠকের কথা বলতে পারি, প্রয়াত বজলুর রহমান (সাংবাদিক) ভাইয়ের কাছে শুনেছি। বজলু ভাই সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, কমরেড মনি সিংহের সঙ্গে সেই গোপন বৈঠকে করণীয় ও কৌশল নিয়ে আলোচনার পর বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের অর্থ ছিল এমন, 'দাদা সব মানি; কিন্তু আমার এককথা–বাঙালির স্বাধীনতা ছাড়া হবে না।'

আর এই স্বাধীনতার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রসঙ্গ ছেষট্টির ছয়-দফা ও ৭ মার্চের ভাষণ। এই ছয়-দফার মধ্যে বাঙালির রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক এবং ভবিষ্যৎ সোনার বাংলার পরিকল্পিত দিকনির্দেশনা আছে। এই দাবিতে তিনি ছিলেন অটল, অনড়। তাই তিনি এই ছয়-দফা দাবির মূল বিষয় সহজ ভাষায় বোঝানোর জন্য ঝড়বাদল, অসুস্থতা. জেল-জুলুম উপেক্ষা করে সারাদেশে সভা ও বক্তৃতা করেছেন। সভা করার জন্য এক জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে গ্রেফতার হতেন আবার কিছুদিন পর জেল থেকে বের হয়ে আরেক অঞ্চলে গিয়ে বক্তৃতা করতেন। ছয়-দফায়, অর্থনীতি, মুদ্রানীতি, বৈদেশিক নীতি, স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র–এই কঠিন কথাগুলো সাধারণ কৃষকের পক্ষে বোঝা কঠিন। বঙ্গবন্ধু গ্রাম্যভাষা বা জনসাধারণের ভাষায় কথা বলতেন, 'ওই মিয়া ভাইরা আইয়ুব খানের সঙ্গে তো আমার কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়াবিবাদ নাই, আমি তো তার ছেলের সাথে আমার মেয়ে বিয়া দিব না, উনিও তো আমার ছেলের সাথে তার মেয়ে বিয়া দিবে না, তাহলে ঝগড়াটা কী নিয়া? ঝগড়াটা হইলো আপনারা যে পাট, ধান ফলান, এত কষ্ট করেন, এসব বিদেশে বিক্রি করে টাকাপয়সা আসে, তা যায় কোথায়? এসব যায় সব লাহোরে, রাওয়ালপিন্ডিতে। দেখেন গিয়া সেইখানে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা সবই আছে, আপনাদের এইখানে আছে? নাই।' এভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে কৃষককে সহজ ভাষায় বোঝাতেন, কীভাবে তাদের উৎপাদিত ধান ও পাটের অর্থ এই বাংলায় খরচ না করে পাকিস্তান সরকার লাহোর নিয়ে বিলাসিতা করছে। কৃষকের কাছে জনগণের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর ছয়-দফা দাবির সমর্থনে জনমত গড়েছেন এবং তা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করেছেন পূর্ব বাংলার মানুষকে। স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন।

নয় মাস বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগারে ছিলেন, এখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে দুটি স্লোগান বা রণ-হুংকার উচ্চারণ করে, 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'–এই যে বিষয়গুলো এসব নিয়েই তো বঙ্গবন্ধু।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ কেমন আছে?

মুনীরুজ্জামান: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের তৎপরতা এখনো রয়েছে। তবে বর্তমান বামপন্থিদের রাজনীতি, কর্মসূচি কিছুই নেই এখন। জোটবদ্ধও হতে পারে না। অন্তত একটা কর্মসূচিতে লড়াই করতে পারে, তা হলো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। যেভাবে এসব ডানা মেলছে এর বিরুদ্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বা যে কোনোভাবে প্রতিরোধ ও লড়াই দুটোই চালাতে হবে। তা সরকার, প্রশাসন, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক মুক্তিযুদ্ধের দল বলে নিজেদের দাবি করে তাদের বিষয়টিকে বুঝে উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশে এখন একটাই সমস্যা, তা হলো সাম্প্রদায়িকতা। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের এই প্রতিজ্ঞা ও কর্মসূচি হওয়া উচিত যে বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন, শ্রদ্ধা ও সম্মান, অনুসরণ, অনুকরণ এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিতে হবে, সংবিধানের চার মূলনীতির আলোকে বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যা যা করা দরকার তার উদ্যোগ নিয়ে এই প্রজন্মকে তাতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হলে আগামী প্রজন্মকে রাজনীতিবিদদের নিয়ে রাজনীতি করতে হবে। রাজনীতির বাইরের কোনো শক্তি বা প্রতিষ্ঠান দিয়ে রাজনীতি বা দেশ পরিচালনায় সুফল বয়ে আনবে না। এই সত্যিটা এ প্রজন্মকে বুঝতে হবে, তাহলে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ চিরজীবী হবে, তার শতবর্ষ উদ্‌যাপন সার্থক হবে।